খৃষ্টবাদী সার্বীয় নরপশুদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার
বসনিয়ার একজন মুসলিম সাংবাদিকের বন্দী জীবনের
হৃদয়বিদারক কাহিনী ও নির্ভীক মহিলা মুজাহিদ
খাওলা বেগোভিচের দুঃসাহসী জেহাদী
জীবনের ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আগুনের কারাগার

আব্দুর রাজ্জাক হেকনোভিক

আগুনের কারাগার

মূল

আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক
খাওলা বেগোভিচ

অনুবাদ

শেখ নাঈম রেজওয়ান

আল খালেদ প্রকাশন
কড়াইল টিএণ্ডটি কলোনী, বনানী, গুলশান
ঢাকা।

আগুনের কারাগার

মূল ঃ আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক
খাওলা বেগোভিচ
অনুবাদ ঃ শেখ নাঈম রেজওয়ান

প্রকাশক ঃ
আবু খালেদ
স্বত্বাধিকারী
আল খালেদ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ঃ
শাবান ১৪২১ হিজরী
নভেম্বর ২০০০ ঈসায়ী

চতুর্থ মুদ্রণ ঃ
নভেম্বর ২০০২ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতাজ
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

কাগজ ৭০ গ্রাম বসুন্ধরা

মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

Aguner Karagar
By : Abdur Razzak Heknovik
Khawla Begovich
Translated by : Shaikh Naeem Rezwan
Price Tk. 120. U.S. $ 7.00 only

উৎসর্গ

বসনিয়ার সেই সকল মা-বোন ও শহীদদের উদ্দেশ্যে,

যাদের ইজ্জত-আবরুর কুরবানী ও

কলজে ছেঁচা খুনে রচিত হয়েছে

স্বাধীন মুসলিম বসনিয়ার

ইতিহাস।

—অনুবাদক

আগুনের কারাগার

— আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক

ঈমানদীপ্ত জিহাদী দাস্তান

— খাওলা বেগোভিচ

জীবন্ত
পাহাড়ের
সন্তান

পরিবেশনায় ঃ

- মাকতাবাতুল আশরাফ ঃ ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- দারুল মাআরিফ ঃ ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী ঃ ৭৩, সাতমসজিদ সুপার মার্কেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
- আহসান পাবলিকেশন ঃ মগবাজার ওয়ারলেস রেল গেইট, ঢাকা-১২১৭।
- তাসনিয়া বই বিতান ঃ মগবাজার ওয়ারলেস রেল গেইট, ঢাকা-১২১৭।
- প্রফেসর'স বুক কর্ণার ঃ ১৯১, ওয়ারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।

অনুবাদকের কথা

কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কিছুটা অবকাশ পেলেই ছুটে চলতাম লাইব্রেরী ও বুক ষ্টলে। বিশেষ করে 'ওয়েলকাম বুক ডিপো' ছিল আমার ছুটির দিনের সময় কাটানোর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। কারণ, এটা ছিল করাচীর সবচেয়ে বৃহৎ বই বিতান। যখনই কোন নতুন বই বাজারে আসতো, সর্বপ্রথম এখানেই সেই বইটা পাওয়া যেত। এখানে ছিলো ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে শুরু করে নোভেল, কবিতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভ্রমণ কাহিনী, গবেষণামূলক গ্রন্থ, বিজ্ঞানতত্ত্ব, ঐতিহাসিক, সামাজিক গ্রন্থাদি, গোয়েন্দা কাহিনী ইত্যাদি সর্বপ্রকার বইয়ের বিশাল সম্ভার।

যাহোক, ওয়েলকাম বুক ডিপো ছিল আমার অবকাশকালীন সময় কাটানোর একটা বিচরণ ক্ষেত্র। ১৯৯৯ সনের অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ ওয়েলকাম বুক ডিপোতে শুরু হলো পক্ষকালব্যাপী বার্ষিক বই মেলা। তখন করাচীতে শীতের একটু একটু আমেজ বইতে শুরু করেছে। আমি ছুটির দিনে রুটিন মত বুক ডিপোতে উপস্থিত হলাম। তখন সেখানে বইমেলার কারণে জ্ঞানী-গুণীজনদের ভীড় দেখতে পেলাম। আমি একদিক থেকে বই দেখা শুরু করলাম। যে বই চয়েস হচ্ছিল সেটা হাতে নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম। লাইব্রেরীর ঠিক মাঝামাঝিতে এসে হঠাৎ একটি বইয়ের প্রতি নজর পড়লে আমি কিছুটা থমকে দাঁড়ালাম। বইটির উর্দু নাম 'জাহান্নাম কী দছবী গেহরায়ী' (অর্থাৎ, জাহান্নামের দশম গহ্বর)। আমি ভাবতে লাগলাম, দোযখের দশম গহবর আবার কি জিনিস! বইখানা হাতে নিলাম। বই থেকে কিছুটা পড়লাম, তেমন বুঝলাম না, মনে হল এটা কোন আত্মকাহিনী। এরপর ভূমিকা পড়লাম, পরে বুঝতে পারলাম যে, এটা বসনিয়ার একজন মুসলিম সাংবাদিকের আত্মকাহিনী, যাকে সার্ব সেনারা তার ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায়। বইটি হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলাম যে, বর্তমানে কি এই বইখানার গুরুত্ব রয়েছে? কারণ, বসনিয়ার যুদ্ধ তো শেষ হয়েছে প্রায় ছয় বছর হতে চলল, এখন তো আর সেখানে যুদ্ধ চলছে না। এই ভেবে বইটা যেখান থেকে নিয়েছিলাম ঠিক সেখানে রেখে দিলাম।

অতঃপর আরও সামনে অগ্রসর হয়ে আরও বেশ কিছু বই চয়েস করে কাউন্টারে টাকা পরিশোধ করে চলে এলাম, কিন্তু বসনিয়া সম্পর্কে

সেই বইখানা আমি নিলাম না গুরুত্বহীন মনে করে। তবে রাতের বেলা আবার সেই বইখানার ব্যাপারে ভাবতে লাগলাম। কেমন যেন ধীরে ধীরে আমার কাছে সেই বইখানার গুরুত্ব বেড়েই চলল। সে সময়ে সার্বিয়ান খৃষ্টান কম্যুনিষ্ট পাষণ্ডরা বলকান অঞ্চলেরই আরেকটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল কসোভোর উপর সামরিক আগ্রাসন শুরু করে দিয়েছিল। প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলোতে আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত কসোভোর মুসলমানদের উপর সার্বদের নির্মম বর্বরতার কথা বড় বড় হেড লাইনে প্রকাশিত হচ্ছিল। এতগুলো মুসলমান রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও তারা কসোভোর মুসলমানদেরকে সামরিক সাহায্য করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হচ্ছিল। কসোভোর মুসলমানদের উপর নৃশংসতার যে নারকীয় তাণ্ডব বয়ে যাচ্ছিল তাতে মনটা সবসময় ভারাক্রান্ত থাকতো যে, আজ বিশ্বে সোয়াশ' কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছি, শিকার হচ্ছি অন্যায় আচরণের !

আমার মানসপটে ভেসে উঠল সে সময়কার ঘটনাবলী যখন বসনিয়ার উপর সার্বদের আগ্রাসন শুরু হয়নি। তখন বসনিয়াতে চলছিল মুসলমানদের স্বাধিকারের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণভোটের প্রস্তুতি। মুসলমানদের মধ্যে বিরাজ করছিল একটা চরম উৎসাহ-উদ্দীপনা। তাদের মধ্যে একটা দৃঢ়তা ও দৃপ্ত শপথ কাজ করে যাচ্ছিল। আত্মবিসর্জন দেওয়ার মত মানসিকতা প্রতিটি লোকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, তারা অনেক যুগ ধরে খৃষ্টান সাম্প্রদায়িক শক্তির গোলামী করে আসছিল। এখানে তাদের জান, মাল, ইজ্জত, আবরু ও ধর্মীয় কাজ করার কোন স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ছিল না। তাই তাদের মনটা গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করার জন্য উদগ্রীব ছিল। তারা সকলেই তাদের মহান নেতা আলীজাহ্ ইজ্জত বেগোভিচ্-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। আলীজাহ্ ইজ্জত বেগোভিচ্ সহ সেখানকার মুসলিম নেতৃবৃন্দ বুঝতে সক্ষম হচ্ছিলেন যে, বসনিয়ার মুসলমানদের স্বাধিকার লাভের তৎপরতায় সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টান সম্প্রদায় খুবই ক্ষুব্ধ এবং তারা মুসলমানদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলীজাহ্ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ ও মুসলিম উম্মাহ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন জানালেন যে, "বসনিয়ার

মুসলমানদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত পূর্বেই ব্যবস্থা নেওয়া। নতুবা ইউরোপের সভ্য জগতে এমন কিছু ঘটে যাবে, যার দরুন তাদের সভ্য জাতি হওয়ার দাবী বাতুলতা বলে প্রমাণিত হবে।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্ব তার কথায় কর্ণপাত করল না। বরং তাদের গোপন পরিকল্পনা ছিল যেন ইউরোপে কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় না ঘটে। ফ্রান্স ও বৃটেন সহ ইউরোপের বেশ কিছু রাষ্ট্র কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলল যে, ইউরোপের মাটিতে কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কোনক্রমেই বরদাশত করা হবে না। তখন সবেমাত্র বসনিয়াতে গণভোট সম্পন্ন হলো। বসনিয়ার মুসলমানগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার পক্ষে ও আলীজাহ্ ইজ্জত বেগোভিচ্–এর পক্ষে ভোট প্রদান করল। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথেই অসভ্য সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টান নরপশুরা নিরীহ নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলমানদের উপর চলল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বর্বরতা। যার সামনে হালাকু, চেঙ্গিস খান ও হিটলারের নাৎসী সেনাবাহিনীর বর্বরতাও ম্লান হয়ে পড়ল। খৃষ্টান নরপাষণ্ডরা মা–বাবার সামনে তাদের সন্তানকে জবাই করে সেই গোশতের কাবাব তৈরী করে তাদেরকে খেতে বাধ্য করছিলো। সন্তানের রক্ত গ্লাস ভরে মা–বাবাকে পান করাচ্ছিল। গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে দেখছিল যে, পেটের সন্তানটি ছেলে না মেয়ে। বাপের সামনে তার মেয়ের সাথে, ছেলের সামনে তার মার সাথে, স্বামীর সামনে তার স্ত্রীর সাথে, ভাইয়ের সামনে তার বোনের সাথে সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টানরা ইজ্জত লুণ্ঠন করছিল। অতঃপর তাদের সবাইকে নির্দয়ভাবে জবাই করছিল। ছয় বছরের বালিকা থেকে নিয়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউই তাদের পাশবিক নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। একজন মুসলমান পুরুষকে অন্য মুসলমান পুরুষের পুরুষাঙ্গ দাঁত দিয়ে কামড়ে কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছিল।

আমার মানসপটে ভেসে উঠল দু' বছরের সেই নিষ্পাপ শিশুর অশ্রুতে প্লাবিত ক্রন্দনরত মুখটি, যে তার মা–বাবা, আত্মীয়–স্বজনের জবাইকৃত লাশের স্তূপের সামনে বসে আম্মী, আম্মী, আব্বু আব্বু বলে

কাঁদছিল কিন্তু তার কথার উত্তর দেওয়ার মত কেউ তখন দুনিয়াতে বেঁচে ছিলো না।

আমার কর্ণকুহরে বেজে উঠল সেসব সতী সাধ্বী মুসলমান যুবতী মেয়েদের আর্তনাদ, যাদেরকে সার্বরা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং পরিকল্পিতভাবে গণধর্ষণ করে। এই অপকর্মের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যেন ঐ সকল মুসলিম রমণী সার্ব খৃষ্টান সন্তান জন্ম দেয়। বসনিয়ার সেই সব মুসলিম মহিলা আর্তনাদ করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের নিকট আবেদন করছিল যে, "হে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা! আমাদেরকে রক্ষা করো আমরা খাদ্য চাই না, আমাদের জন্য গর্ভ নষ্ট করে দেওয়ার বড়ি পাঠিয়ে দাও, আমরা খৃষ্টানের সন্তান জন্ম দিতে চাই না।"

মোটকথা, সার্বরা বসনিয়ার মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য সব ধরনের উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করছিল।

আমার সে কথাটিও মনে পড়ল, যখন বসনিয়ার নিরস্ত্র লোকদের উপর বিশ্বের চতুর্থতম বড় সামরিক শক্তি, সার্ব খৃষ্টানরা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক তখন শয়তান ও কুফরীর মহাসভা জাতিসংঘ (United Nation) বসনিয়ার উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল যেন মুসলমানদেরকে কেউ সামরিক সাহায্য করতে না পারে এবং সার্ব খৃষ্টবাদীরা নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

আমার সে কথাটিও মনে পড়ল যে, বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে যখন বসনিয়ার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বিশ্বের মুসলমানরা বসনিয়ার ব্যাপারে কিছুটা সোচ্চার হচ্ছিল এবং বিভিন্ন দেশের মুসলিম তৌহিদী জনতা বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিবাদ সভা করে নিজ নিজ দেশের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করছিল যেন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানগণ বসনিয়ার মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য কিছু একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঠিক তখনই মধ্যপ্রাচ্যে কুয়েত–ইরাক সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটিয়ে মুসলিম বিদ্বেষী আমেরিকা মুসলমানদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। মুসলিম বিশ্বও আমেরিকার চাল না বুঝে তার গোপন ফাঁদে পা দেয়। তখন মুসলিম বিশ্ব এক নতুন বিপাকে

পড়ে। তারা কি বসনিয়ার সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, নাকি ইরাক–কুয়েত সংঘাত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে? আমেরিকার পরিকল্পনা সফল হল। সেও চাচ্ছিল না যে, ইউরোপের মাটিতে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটুক। সে জন্যই সে ইরাক–কুয়েত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল। উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন মুসলমানদের দৃষ্টি বসনিয়া থেকে সরে গিয়ে এই নতুন সমস্যার দিকে নিবদ্ধ হয় এবং এই সুযোগে তার দ্বীনী ভাই সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টানরা বসনিয়ার মুসলমানদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে, ইরাক–কুয়েত দ্বন্দ্ব মার্কিনী ইহুদী ও খৃষ্টানদেরই মহাষড়যন্ত্রের একটা অংশ। এই সমস্যা সৃষ্টি করার পিছনে তাদের অনেকগুলো উদ্দেশ্য কাজ করছিল। তবে বসনিয়ার হত্যাকাণ্ডের মুহূর্তে এ সমস্যা সৃষ্টি করার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। যাহোক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত চেষ্টা তদবীর সত্ত্বেও সার্বরা বসনিয়ার মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারল না। মুসলমানরা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গেল। এক সময় দেখা গেল যে, তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র। তাদের হাতে ভারী অস্ত্রও রয়েছে এবং হালকা অস্ত্রও। তবে এই অস্ত্র তাদেরকে কেউ সাহায্য হিসেবে দেয়নি। এগুলো সবই সার্বদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র। তবে এজন্য তাদেরকে অনেক কোরবানী দিতে হয়েছে, তাদেরকে জান, মাল, ইজ্জত, আবরু সবই বিসর্জন দিতে হয়েছে।

বসনিয়ার মুসলমানরা সামরিক ও নৈতিক বিজয় লাভ করল। ইউরোপীয় খৃষ্টান ও আন্তর্জাতিক কুফরবাদের ইমাম ও নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হল। মূলতঃপক্ষে সার্ব–বসনিয়ার যুদ্ধটি ছিল বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শেষ ক্রুসেড ও আল–হেলালের যুদ্ধ। যে যুদ্ধে সার্বদের সাহায্যে ছিল সমস্ত খৃষ্টান ও কুফরী শক্তিবর্গ, পক্ষান্তরে বসনিয়ার মুসলমানরা এককভাবে যুদ্ধ করেছে, কোন মুসলমান রাষ্ট্রও তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। আবার প্রমাণিত হল যে, মুসলমানগণ যদি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে দাঁড়ায় তাহলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করেন। বসনিয়ার মহামান্য

প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলীজাহ ইজ্জত বেগোভিচ একাধিকবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে, "আমরা কুরআনুল কারীমের জেহাদ ও কেতাল শব্দ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছি। বিশেষ করে আফগান জেহাদ থেকে আমরা পেয়েছি মহাপ্রেরণা যে, কিভাবে নিরস্ত্র সরল আফগান জাতি এই জেহাদের বদৌলতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মত বিশাল শক্তিকে অপমানজনকভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হলো এবং আফগান মুসলমানদের ঈমানী শক্তির কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ড–বিখণ্ড হয়ে সেখানে জন্ম নিলো অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র এবং অভ্যুদয় ঘটলো অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের।

যাহোক রাতে আমার তেমন একটা ঘুম হলো না এসব চিন্তাভাবনায়। আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ঐ বইখানা খরিদ করে পড়ে দেখব। আমি পড়লাম। আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক–এর আত্মকাহিনী বইটি। তার বর্ণনা পড়ে আমি কয়েকবার কেঁদে ফেললাম। এর পূর্বেও বসনিয়া সম্পর্কে একটা আত্মকাহিনী করাচীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ডাইজেষ্ট 'ছারগুযাস্ত'–এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কাহিনীটি হচ্ছে, বসনিয়ার মুফতীয়ে আযম হযরত ইসমত বেগোভিচ (রহঃ)এর বংশের একটি মেয়ে খাওলা বিনতে ফারাসাত বেগোভিচ–এর জেহাদী জীবনের কাহিনী। যেই কোমল হাতে ফুল নিয়ে করবে খেলা সেই হাতে অস্ত্র নিয়ে কেন সেই মুসলিম বীরাঙ্গনা গর্জে উঠেছিল। তার সেই ঈমান জাগানো কাহিনীটি পড়েও আমি চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারিনি। এই কাহিনীটি আমি পড়েছিলাম বসনিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে। 'ছারগুযাস্ত' ডাইজেষ্টের সেই সংখ্যাটি হেফাযত করে রেখে দিয়েছিলাম।

যখন আমি দেশে ফিরলাম তখন মনস্থ করলাম যে, কাহিনী দুটোর বঙ্গানুবাদ হওয়া দরকার। বাংলার মুসলমানদের জানা দরকার যে, তাদের বসনিয়ান মুসলমান ভাইদের উপর দিয়ে কত বড় জুলুমের তুফান বয়ে গেছে। তাই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে অনুবাদ শুরু করে দিলাম। কোন কোন সময় সামান্য একটু অনুবাদ করতে আমার অনেক সময় লেগে যেত, কারণ কাহিনী এত করুণ লাগত যে, আমার কলম আর সামনে অগ্রসর হতো না, হাত কাঁপতো, শরীর শিহরিত হয়ে উঠতো, চোখ বেয়ে দর দর করে পানি পড়তে থাকতো। আমি

অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম। যাহোক অনুবাদ শেষ করলাম।

আমার জীবন সঙ্গীনী উম্মে খালেদ আমাকে এ ক্ষেত্রে অনেক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যতটুকু অনুবাদ করতাম তাকে দিয়ে সেটা পড়াতাম। তাকে বলতাম ঃ বলো তো দেখি, কেমন লাগল। সে বলতো, হাঁ, কাহিনীগুলো তো খুবই চমৎকার এবং হৃদয়বিদারক, তাড়াতাড়ি অনুবাদ শেষ করে ছাপাতে দিন। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে যারা সহযোগিতা ও সদুপদেশ দান করেছেন, তাদের অনেক অনেক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। হৃদয়ের গভীর থেকে তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক-এর মূল বইখানা হচ্ছে বসনিয়ান ভাষায়। বিশ্বের অনেক ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়েছে। আমরা তার বইখানা ও খাওলা বেগোভিচের আত্মকাহিনী 'আগুনের কারাগার' নামে প্রকাশ করছি। কারণ সার্বীয় নরপশুদের নির্মম অত্যাচার মূলতঃ বসনিয়াকে আগুনের কারাগারে পরিণত করেছিলো। বই প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পাঠক ভাইয়েরা যদি বইখানা পড়ে উপকৃত হন এবং তাদের মনে কিছুটা রেখাপাত করতেও সক্ষম হয় তাহলে মনে করবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আল্লাহ ইসলামকে ও বিশ্বের সমগ্র মুসলমানকে রক্ষা করুন। আমীন।

ওয়াস্ সালাম।

শেখ নাঈম রিজওয়ান

১২-১০-২০০০ইং

সূচীপত্র

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী
এস. এম. যফরের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়
জাহান্নামের প্রথম গহ্বর

দ্বিতীয় অধ্যায়
জাহান্নামের দ্বিতীয় গহ্বর

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়
জাহান্নামের তৃতীয় গহ্বর

চতুর্থ অধ্যায়
জাহান্নামের চতুর্থ গহ্বর

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়
জাহান্নামের পঞ্চম গহ্বর

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাহান্নামের ষষ্ঠ গহ্বর

সপ্তম অধ্যায়
জাহান্নামের সপ্তম গহ্বর

অষ্টম অধ্যায়
জাহান্নামের অষ্টম গহ্বর

নবম অধ্যায়
জাহান্নামের নবম গহ্বর

দশম অধ্যায়

জাহান্নামের দশম গহ্বর

ঈমানদীপ্ত জিহাদী দাস্তান

॥ ॥ ॥

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী এস. এম. যফরের ভূমিকা

১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাস। আমি হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ সাহেবকে বললাম, এই বইটির অনুবাদ হওয়া খুবই দরকার। হাকীম সাহেব বললেন, কোন বইটির? আমি বললাম ঃ আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক ওরফে জিমু যিনি বসনিয়ার একজন সাংবাদিক। তিনি সার্বদের তৈরী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে তার 'ভয়াবহ বন্দী জীবন' সম্পর্কে একটা বই লিখেছেন। আমি হাকীম সাহেবকে বইটি প্রদান করলাম। তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে বইটি গ্রহণ করলেন। অধ্যয়ন করার পর বললেন, "যফর সাহেব, বইটি চমৎকার। মনকে আন্দোলিত করে, চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করে, শিরায় শিরায় চেতনার আগুন প্রবাহিত করে। এর অবশ্যই অনুবাদ হওয়া দরকার। উপমহাদেশের মুসলমানদের, বিশেষ করে যেসব লোকদের মাঝে মনুষত্ব, মানবতাবোধ ও বিবেক রয়েছে তাদের এ বইটি অবশ্যই পড়ার প্রয়োজন রয়েছে।"

এভাবেই যাত্রা শুরু হল। আমার এবং হাকিম সাহেবের প্রচেষ্টা ছিল, বসনিয়ার মুসলমানদের উপর তথাকথিত সভ্যতার দাবীদাররা যেভাবে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে তা উপমহাদেশের মুসলমানদের অবগত করা। পশ্চিমা বিশ্ব, যারা নিজেদেরকে সভ্য জাতি বলে দাবী করে এবং জোর গলায় মানবাধিকারের শ্লোগান দেয়, তাদের মানবাধিকারের রূপটা কি? মুসলমানদের বেলায় এক নীতি, আর স্বজাতি বা অমুসলিমদের বেলায় অন্য নীতি। এ দ্বিমুখী নীতি ও ঘৃণ্য পলিসির মুখোশ উন্মোচন করাও আমাদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপের পাকিস্তান

আমার বিশ্লেষণের নির্যাস, বসনিয়া হচ্ছে ইউরোপের পাকিস্তান। এই উপমহাদেশে ১৯৪৭ সনে প্রায় অর্ধকোটি মুসলমানের প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটেছিল, ঠিক তদ্রূপ বলকান অঞ্চলেও লক্ষ লক্ষ মুসলমান পুরুষ ও নারীর শাহাদাতের রক্ত পিচ্ছল পথ পেরিয়ে জন্মলাভ করেছে 'মুসলিম বসনিয়া হার্জেগোভিনা'। বসনিয়া যেরূপ বৈরী শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ঠিক তদ্রূপ পাকিস্তানের সাথেও লেগে রয়েছে একটি বৈরী

দেশ। যে দেশ সর্বদাই এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত, কীভাবে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও মুসলিম স্বকীয়তাকে ধ্বংস করে তার অস্তিত্ব বিপন্ন করা যায়। মুসলিম বসনিয়ার সাথেও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর একই পরিকল্পনা। একই ষড়যন্ত্র। এ সাদৃশ্যতার কারণেই বইটি অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যাপারে আমি বেশী অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী হয়েছি।

ঈমান যখন জাগলো

এখানে একটি চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। বসনিয়ার মুসলমানদের উপর পাশবিক নির্যাতনের হৃদয় বিদারক দৃশ্যাবলী দেখে এক বিশিষ্ট আমেরিকান নাগরিক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন এর প্রপৌত্র জর্জ আশকুন। আমেরিকার সাংবাদিকরা তাকে ভাল করেই চিনে। কারণ, তিনি একজন পেশাদার শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক। উপমহাদেশের খুব কম লোকই তাকে চিনে। জর্জ আশকুন বৈরুত, সুদান ও আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের যেসব ধ্বংসাত্মক ও দুঃখ–দুর্দশার করুণ দৃশ্যাবলীর ছবি নিজের ক্যামেরায় তুলেছেন, সেগুলো আমেরিকার পত্র–পত্রিকায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়ে বিস্তর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সাংবাদিক হিসেবে তিনি বসনিয়াতেও গমন করেন। বসনিয়ার মুসলমানদের উপর নির্যাতন, উৎপীড়ন ও বর্বরতার দৃশ্যাবলী এবং তাদের দুঃখ–দুর্দশা স্বচক্ষে দেখেন। নির্মম পাশবিকতা সত্ত্বেও বসনিয়ার মুসলমানদের ধর্মের প্রতি ভালবাসা, একনিষ্ঠতা ও আকর্ষণ দেখে সত্যিই তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। নিজের মাঝে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। বসনিয়াতে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে মানবতার খাতিরে যতটুকু সম্ভব অসহায় মুসলমানদের সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি একটি পরিবারকে আমেরিকা পাঠাতে সক্ষম হন। বসনিয়ায় দায়িত্ব পালনের সময় তিনি সেই পরিবারটির কুশলাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকেন। সেই পরিবারের অভিভাবক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি চিঠিতে বিশেষভাবে তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইতেন। তার কাছে খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল যে, তিনি

ক্যান্সারে অচল হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার মত স্বাধীন পরিবেশে থেকে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন না।

ঘটনাক্রমে জর্জ আশকুন যেদিন তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করে বসনিয়া হতে আমেরিকা প্রত্যাবর্তন করেন, ঠিক তারপরের দিন বসনিয়ার এই মুসলিম পরিবারের অভিভাবকটি পরলোকগমন করেন। পরবর্তী ঘটনা জর্জ আশকুনের মুখ থেকেই শ্রবণ করুন—

"আমি দ্রুত সেখানে পৌঁছলাম, দেখলাম আমার আগেই ঐ শহরের মুসলমানদের একটা বড় অংশ তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য সেখানে পৌঁছে গেছে। তাদের মাঝে রয়েছে পাকিস্তান, ভারত, সউদী আরব, কুয়েত সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে আগত মুসলমান সম্প্রদায়। তারা সকলে এমনভাবে জানাযায় শরীক হল যেন এটা তাদেরই পরিবারের কোন একজন সদস্যের জানাযা। এত আপনত্ব এত নিবিড় সম্পর্ক ! এত গভীর ভালবাসা ! আমার কাছে সম্পূর্ণ এক অভিনব ব্যাপার। যখন আমার মরহুম বসনিয়ান দোস্ত ওসমানকে গোসল দেয়া হচ্ছিল, ঠিক সে মুহূর্তে আমি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে সকলের সামনে ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করলাম।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'জাহান্নামের দশম গহবর (আগুনের কারাগার)' বইটি পাঠ করে বিবেকবান মুসলমান ভাইগণ উপমহাদেশে একটি শক্তিশালী মুসলিম অবস্থানের প্রয়োজনীয়তাকে তীব্রভাবে অনুভব করতে সক্ষম হবেন। অন্যথায় এ অঞ্চলে মুসলমানদের যে বৈরী শক্তি রয়েছে তাদের দ্বারা যে কোন মুহূর্তে তৌহিদী জনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

বসনিয়া হার্জেগোভিনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওসমানী মুজাহিদীনরা বসনিয়ার উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। তখন এ জনপদটির নাম রাখা হয় 'বসনিয়া পাশালোক'।

তখন থেকেই বসনিয়াতে ইসলামী সভ্যতার সূচনা হয় এবং বসনিয়াতেই বিশ্বের সবচেয়ে মনোরম মসজিদ নির্মিত হয়। এর মাঝে সারায়েভোতে অবস্থিত 'গাজীবেগ মসজিদ' খুবই প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত

বিস্ময়কর। এ মসজিদ আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। এসব মসজিদ ও ইসলামী স্থাপত্যকে দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে পরিব্রাজকরা আগমন করতো।

তুরস্কের ওসমানী খেলাফতের পতন শুরু হলে ইউরোপের কুফরী শক্তি বসনিয়াকে পুনর্বার দখল করার জন্য নীল নকশা তৈরী করে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে ইউরোপের সামরিক অফিসারদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, অষ্ট্রিয়া সরকারকে বসনিয়ার অঞ্চলটি তার সাম্রাজ্যভুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। ফলে ১৯০৬ সালে বসনিয়া অষ্ট্রিয়ার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে ১৯৩৩ সনে 'যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশন' গঠিত হয়।

১৯৪৫ সনে বসনিয়া হার্জেগোভিনা অষ্ট্রিয়া থেকে আলাদা হয়ে যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশনের মেম্বার হয়। এ অবস্থা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বহাল থাকে।

বসনিয়ার মুসলমানদের বেশীর ভাগ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী। তারা অত্যন্ত ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত। মার্শাল টিটোর সামরিক শক্তি সার্ব বংশোদ্ভূত লোকদের উপর নির্ভর করতো।

১৯৯০ সালের সূচনালগ্নে যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সর্বপ্রথম সালভানিয়া ও ক্রোশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরপর ১৯৯২ সনের ৬ই মার্চ একটি গণভোটের মাধ্যমে বসনিয়া-হার্জেগোভিনাও পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘোষণা করে।

৬ই এপ্রিল, ১৯৯২ সনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বসনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়। কিন্তু তার দু'দিন পূর্বে সার্ব ফৌজরা আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বসনিয়ার উপর চড়াও হয়। তারা মুসলমান তৌহিদী জনতার উপর সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করে। সার্ব হায়েনারা একে 'শুদ্ধি অভিযান' বলে আখ্যায়িত করে। উল্লেখযোগ্য যে, বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে ১৯৯২ সনের ১৮ই এপ্রিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তারপর জাতিসংঘও একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

করে। সে হিসাবে জাতিসংঘে শামিল সমস্ত শক্তিবর্গ বসনিয়াকে সময়মত সাহায্য প্রদান ও তার উপর বাইরের আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য দায়বদ্ধ ছিল।

বসনিয়ার মুসলিম ডেমোক্রেটিক পার্টির (SDA) নেতা আলীজাহ ইজ্জত বেগোভিচ্ বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ঘোষণা করলেন, এ দেশের প্রেসিডেন্ট পদটি পালাক্রমে মুসলমান, ক্রোট ও সার্বদের মাঝে বদল হতে থাকবে। উদ্দেশ্য, হয়ত এভাবে এ তিন সম্প্রদায়কে একই সূত্রে গেঁথে রাখা সম্ভব হবে। এজন্য তিনি সবাইকে সমান অধিকার দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

একটি প্রশ্নের উত্তর

আরেকটি প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন, তাহলো, সার্ব সেনারা বসনিয়াতে কেন আগ্রাসন চালালো? এর উত্তর হলো, বসনিয়ার কিছু অংশে সার্ব বংশোদ্ভূত লোকেরা বসবাস করে। তাই সার্বিয়ার সরকারের মতলব ছিল বেশী বেশী ভূমি দখল করে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। তাই তারা 'বিশাল সার্ব প্রজাতন্ত্রের' শ্লোগান দিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব জায়গায় সার্ব ফৌজদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতো সেখানে যেন কোন মুসলমান জীবিত না থাকে তারও প্রচেষ্টা চলতো। বিশাল সার্ব সাম্রাজ্যকে মুসলমান থেকে পাক–পবিত্র দেখার খাহেশ তাদের মাথায় চেপে বসেছিল। সে কৌশল হিসেবে তারা মুসলিম নিধনকে পবিত্রকরণ বা শুদ্ধি অভিযান বলে আখ্যায়িত করতো।

মরার উপর খাড়ার ঘা

যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশন ভেঙ্গে গেলে বেলগ্রেডে মজুত যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজ–সরঞ্জাম সার্বিয়ার সেনারা দখল করে নেয়। কিন্তু তার পরপরই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সার্বিয়ার প্রতিনিধির আবেদনে সাড়া দিয়ে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার বিবাদমান দেশের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল যেন বসনিয়ার মুসলমানরা অন্য কোথাও থেকে অস্ত্র সাহায্য না পায়। স্বয়ং জাতিসংঘও সার্বদের এই দূরভিসন্ধিতে যোগদান করে। এই নিষেধাজ্ঞার

ফলে বসনিয়ার নিরস্ত্র মুসলমানরা সার্বদের সুস্পষ্ট আগ্রাসনের শিকার হয়। 'গ্রেটার সার্বিয়া' এর শ্লোগানদানকারী হিংস্র সার্ব পাষণ্ডরা ট্যাংকের বহরে আরোহণ করে অস্ত্রবিহীন বসনিয়ার মুসলিম অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। এ সময় সার্বদের সর্বাধিনায়ক রাতকো মিলাভিচ সদম্ভে ঘোষণা করে— "যেখানে যেখানে সার্ব সম্প্রদায় রয়েছে, সেসব জায়গা সার্বিয়ারই অংশ। সেসব এলাকায় একজন মুসলমানকেও জীবিত থাকতে দেয়া হবে না। এরা 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান', 'আল্লাহ বড়' বলে চিৎকার দিয়ে থাকে, আমরা এদেরকে সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছেই পৌঁছিয়ে দেব।"

বক্তৃতার শেষে সেই নরাধম পাপিষ্ঠ বলল—"মুসলমানদের নারীরা অনেক সন্তান জন্মায়, এখন থেকে তারা সার্ব বাচ্চা প্রসব করবে।"

এমন চরম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বসনিয়ার তৌহিদী জনতা নিজেদের এই সদ্য স্বাধীন দেশটিকে খৃষ্টান হায়েনাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাদের এই সিদ্ধান্তই তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি পেতে হল সমস্ত নাগরিককে। বৃদ্ধ–যুবক, শিশু–কিশোর, নারী–পুরুষ, প্রফেসর–কৃষক, চাকুরীজীবী–ব্যবসায়ী মোটকথা সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে।

আমাকে ১৯৯৮ সালের মে মাসে জার্মানীর একটি সংস্থার পক্ষ থেকে এক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কনফারেন্সের বিষয়বস্তু ছিল 'আন্তর্জাতিক নির্যাতন রোধকল্পে একটি স্থায়ী ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট গঠন'।

বসনিয়া ও রুয়াণ্ডাতে যেসকল লোক অসহায় সাধারণ নাগরিকদের উপর মানবতা বিধ্বংসী অত্যাচার চালিয়েছে তাদের শাস্তির জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটা অস্থায়ী আদালত গঠন করেছে। কিন্তু জাতিসংঘের এই পদক্ষেপ লোক দেখানো বৈ আর কিছুই নয়। বিশেষ করে মুসলমানদের বেলায় তো এই আদালত কিছুই করবে না এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। আমি এই কনফারেন্স থেকে রিপাবলিক অব বসনিয়া হার্জেগোভিনার সেই আবেদনপত্রটির মূলকপি সংগ্রহ করতে সক্ষম হলাম, যে আবেদনটি ২০শে মার্চ, ১৯৯৩ ইং সনে বসনিয়া সরকার কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাষ্টিসে প্রফেসর ফ্রান্সেস এ বোয়েল

(Francis A Boyle) দাখিল করেছিলেন। তিনি সেই দরখাস্তে ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যুদ্ধাপরাধীদের জন্য যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার অধীনে সার্বিয়ার সরকার, তার সামরিক অফিসারবৃন্দ ও অন্যান্য সার্ব অপরাধী, যারা বসনিয়াকে একটা জাহান্নামে রূপান্তরিত করে ফেলেছিল তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর আবেদন করেছিলেন।

এই আবেদনপত্রে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহ উল্লেখ রয়েছে যেগুলো শুনে কোন মানুষই বরদাশ্ত করতে পারবে না। স্থির থাকতে পারবে না। আমি নাৎসী জার্মানীদের নির্যাতনের উপর অনেক কিছু পড়েছি। ইহুদী লেখক ও অনেক পশ্চিমা বিশ্লেষকরা ইহুদীদের উপর কথিত নির্যাতনকে অনেক জোরেশোরে প্রচার করে থাকে। কিন্তু বসনিয়ার উপর যে ধরনের নির্যাতন ও বর্বরতা চালানো হয়েছে, অতীতে তার কোন নজীর পাওয়া যাবে না। এখানকার মুসলমানদের উপর এক অভিনব পদ্ধতিতে পাশবিকতার ষ্টীমরোলার চালানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নাৎসী জার্মানীরা কোন ইহুদীকে এমন নির্দেশ দেয়নি যে, সে নিজের ইহুদী সঙ্গীর ‘পুরুষাঙ্গ’কে নিজের দাঁত দিয়ে কেটে কচ্ কচ্ করে চিবিয়ে খেয়ে প্রমাণ করুক যে, সে ইহুদী নয়, তবেই তার প্রাণরক্ষা পেতে পারে.... কিন্তু সার্ব সেনারা বসনিয়ান মুসলমানদের সাথে অহরহ এই জঘন্য খেলাটি খেলেছে। যেসব হতভাগ্য মুসলমানের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হত তাদের অধিকাংশকেই সার্বরা ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে যাদেরকে তাদের সঙ্গী মুসলমানদের পুরুষাঙ্গ দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে খেতে বাধ্য করা হয়েছিল, সার্বরা তাদেরকে জীবিত রাখতো না। তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে তাদের বড়র কাছে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দিত।

বসনিয়া সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদালতে যে আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল তাতে ১৩৮টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। সেখান থেকে মাত্র কয়েকটি ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সামনে পেশ করছি—

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ এই অনুচ্ছেদে এমন হাজার হাজার মসজিদ ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে যেগুলোকে সার্ব সেনারা বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে শহীদ

করেছে। এর মধ্যে ঐসকল মসজিদও রয়েছে যে সকল মসজিদ পনের ও ষোল শ' শতাব্দীতে নির্মাণ করা হয়েছিল। যথা—'গাজী বেগ মসজিদ', 'আলী পাশা মসজিদ' ইত্যাদি। মসজিদগুলোকে ডিনামাইট ও বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ (সি) ৩৩ ঃ এই অনুচ্ছেদে একজন ৬৫ বছর বয়সের মহিলার ঘটনার বর্ণিত রয়েছে। তার সাথে সার্বরা বলাৎকার করে পরে তারা তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে।

অনুচ্ছেদ (জি) ৪৪ ঃ এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি নির্মম ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে এ ঘটনাটিও রয়েছে যে, সার্ব সেনারা বসনিয়ার একটি উপশহরের সমস্ত মুসলমানকে মাটিতে শুইয়ে মাল বোঝাই একটি ভারী সামরিক ট্রাক তাদের উপর চালিয়ে দেয়। এতে দু' একজন ছাড়া সবাই মারা যায়। যারা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়, তারা চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ (জে) ৪৪ ঃ এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, একজন সার্ব সৈন্য আস্ফালন করে বলছে, সে তার শিকারী চাকু দিয়ে শত শত মুসলমানের গর্দান কাটতে খুবই নৈপুণ্য দেখিয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, ইউরোপীয় কাউন্সিল নিজেদের প্রচেষ্টায় যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তার আলোকে তারা নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সার্বরা যেসব মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করেছে সেটা মূলতঃ রাজনৈতিক হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার জন্য করেছে।

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ এই অনুচ্ছেদে সেই দেড়শ' মুসলমান গর্ভবতী মহিলার কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদেরকে সার্বরা নিজেদের ক্যাম্পে এনে ধর্ষণ করে এবং পেটের ঐ বাচ্চাকে বিনষ্ট করতে চাইলেও তা অসম্ভব হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে আটকে রাখে।

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত জঘন্য কাহিনী হলো, বার বছরের মেয়ের সামনে ৩৩ বছরের একজন মুসলিম রমণীকে সার্বরা এই বলে ধর্ষণ করতে থাকে যে,'তুমিও এ কাজটি শিখে নাও'। অতঃপর সেই বার বছরের মেয়েটিকেও তারা বারবার পালাক্রমে ধর্ষণ করতে থাকে।

অনুচ্ছেদ (এফ) ৬৮ ঃ এই অনুচ্ছেদে মেরিনা নামক সতের বছরের সেই মুসলমান যুবতীর হৃদয়বিদারক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যে, কিভাবে প্রতিদিন দশজন করে সার্ব পাষণ্ড তার উপর যৌন নির্যাতন চালাতো। আবেদনের অন্যান্য অনুচ্ছেদে বহুসংখ্যক নির্যাতন শিবিরের লোমহর্ষক ও নির্মম কাহিনী দলীল প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে বিশদভাবে বর্ণনা করা উহয়েছে।

'আগুনের কারাগার' বইটি হচ্ছে বসনিয়ার মুসলিম সাংবাদিক আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক ওরফে জিমুর জীবনের সেই সময়ের তিক্ত ও অন্ধকার অধ্যায়ের বিবরণ যখন তিনি সার্বদের বন্দীশালায় মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। তিনি নিজের চোখে এমন সব বর্ণনাতীত বর্বরতা অবলোকন করেন যা সার্ব হায়েনারা বসনিয়ার মুসলমান নর-নারীর উপর সর্বক্ষণ চালাতো। এ বইটি নিঃসন্দেহে সার্বদের বর্বরতার একটি ঐতিহাসিক দলীল ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।

এই বইয়ের বিষয়বস্তু

৩০শে মে, ১৯৯২ সনে আবদুর রাজ্জাক সহ অনেক লোককে সার্বরা বসনিয়ার একটি শহর থেকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা এখানকার অন্যান্য মুসলমানদের মত 'স্বাধীন মুসলিম বসনিয়া'র সমর্থক এবং তারা 'গ্রেটার সার্বিয়া'-কে স্বীকৃতি প্রদান করেন না। তাদেরকে এই অপরাধে নির্যাতন শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্যাতন শিবিরে হাজার হাজার মুসলমান মৃত্যুবরণ করে কিংবা তাদেরকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আবদুর রাজ্জাক ছিলেন শক্তপ্রাণ মানুষ। তিনি কারাগারের এই কঠিন নির্যাতন সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে সক্ষম হন।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সহযোগিতায় মুক্তি পেয়ে তিনি নরওয়ে গিয়ে পৌছেন। সেখানে তার মৃতপ্রায় শরীর যখন সুস্থতা লাভ করে তখন তিনি তার বন্দী জীবনের সেই বিভীষিকাময় ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

আগুনের কারাগারের অবমূল্যায়ন

যদি বইখানা কোন ইহুদী, খৃষ্টান কিংবা কোন পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ লিখতো তাহলে অবশ্যই এটা আন্তর্জাতিকভাবে অনেক সমাদৃত হত।

আমি অ্যান্যার ডায়েরী (Ann's Diary) পড়েছি, যা অ্যান্যা নামের এক ইহুদী মেয়ে হল্যাণ্ডে নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসনের প্রাক্কালে তারা ইহুদীদের উপর যেসব নৃশংসতা চালায়, তারই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছিল। এ ডায়েরীটি অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত বাজারের অন্যতম সেরা বই (Best seller) রূপে বিক্রয় হচ্ছে।

ঠিক তদ্রূপ, জেল্টার ডায়েরী (Zelta's Diary)-ও অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে। এই খৃষ্টান মেয়েটি সারায়েভো শহর সার্ব সেনা কর্তৃক অবরোধের প্রাক্কালে সেখানেই ছিল। সে সারায়েভো শহরের লোকদের দুঃখ-দুর্দশা, ভয় ও আতঙ্কের কথা এই ডায়েরীতে উল্লেখ করেছে। কিছুদিন পরেই সে আমেরিকা চলে যেতে সক্ষম হয়। আমেরিকার টিভি নেটওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তার সাক্ষাৎকারও প্রচার করে। আবদুর রাজ্জাকের ডায়েরীটি বিবরণের দিক থেকে নিঃসন্দেহে পূর্বের দু'টি ডায়েরী থেকে অনেক গুণ উন্নত।

আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক জাহান্নামের এক গহ্বর থেকে অন্য গহবরে স্থানান্তরিত হতে থাকেন। তিনি সার্বদের তৈরী নরকের অতল গভীরে স্বয়ং নিজে অবস্থান করে দেখেছেন যে, মানুষ কত নির্দয় নির্মম হয়। তিনি অনেক ধরনের দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন মুহূর্তে মুহূর্তে সহ্য করতে থাকেন। ভয় ও আতঙ্ককে নিজের শরীর ও আত্মার অতি কাছে দেখতে পান। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু ছিল একান্ত সঙ্গী। আত্মচেতনাবোধ সমস্ত কয়েদীদের থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এক অজানা ভয়-ভীতি সবসময় বিরাজ করতো। হেকনোভিক একজন কবি ও সাংবাদিক। তাই তার লিখনীর মাঝে সেই স্বাদ ও মর্মবেদনা অনুভূত হবে যা অন্যের লেখায় পাওয়া দুস্কর।

বসনিয়ার মুসলমানদের আত্মমনোবল, দৃঢ়তা ও বীরত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু লেখার প্রয়োজন রয়েছে। তারা কেমন পরিস্থিতির মাঝে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিকে ন্যাটো জোটের কমাণ্ডার ইন চীফ সদম্ভে ঘোষণা করলো, "ইউরোপের মাটিতে কোন মুসলিম রাষ্ট্র আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না।" আরেকদিকে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী (প্রাক্তন) জন মেজর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বললো, "মুসলিম বসনিয়া কোনক্রমেই বরদাশ্‌ত করা হবে না।"

হায় জাতিসংঘ

অন্যদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা বসনিয়ার মুসলমানদেরকে হাত পা বেঁধে সার্বিয়ার খৃষ্টান কসাইদের হাতে তুলে দেবার জন্য অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করলো। যেন বসনিয়ার মুসলমানদেরকে কেউ অস্ত্র সাহায্য করতে না পারে। সার্বদেরতো পূর্ব থেকেই গুদাম ভরা অস্ত্র ছিল। এরপর রাশিয়া সহ ইউরোপের বিভিন্ন খৃষ্টান সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হতে নিয়মিত সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাচ্ছিল। এ চরম পরিস্থিতির মধ্যে বসনিয়ার তৌহিদী জনতা একমাত্র ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে প্রতিরোধ ব্যুহ রচনা করলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহ ছাড়া এ জগতে তাদের আর কোন বন্ধু নেই। একমাত্র তারই উপর ভরসা করে তারা স্বাধীনতার জিহাদ চালিয়ে গেলেন। এক পর্যায়ে দেখা গেল, তাদের হাতেও অস্ত্র এসেছে। কিন্তু এ অস্ত্র কেউ তাদেরকে সাহায্য করেনি। এগুলো তারা তাদের শত্রুদের হাত থেকে অনেক কোরবানীর বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সেজন্য তাদেরকে সবধরনের কুরবানী দিতে হয়েছে। একসময় তারা সত্যিই সার্ব ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে সক্ষম হলেন। তারা অনেক রণক্ষেত্রে শত্রুদেরকে পরাস্তও করলেন। অবশেষে পাশ্চাত্যের মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান সম্প্রদায় অবনত মস্তকে, অনেক লজ্জার গ্লানি নিয়ে বসনিয়ার মুসলমানদের বিজয়কে মেনে নিল। মেনে নিল তাদের স্বাধীনতাকে। কিন্তু ভাববার বিষয় হচ্ছে, বসনিয়ার সমাজটা কতো রক্তাক্ত হয়েছে, কতো ক্ষত-বিক্ষত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। পুরো বিষয়টি শুধুমাত্র একটি ঘটনা থেকেই পরিস্কার হয়ে যাবে। ঘটনাটি হচ্ছে—

বসনিয়ার সুপ্রিম কোর্টের একজন মহিলা বিচারপতির। এই উচ্চ শিক্ষিতা, আইনবিদ ভদ্র মহিলাকে গ্রেফতার করে সার্ব পশুরা তাদের বানানো জাহান্নামে নিয়ে যায়। সেখানে অপরাপর মহিলাদের সাথে যে ধরনের ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার সাথেও তাই করা হয়। প্রতিদিন তার উপর চলে সার্বদের পাশবিক নির্যাতন। প্রতি মুহূর্তে লুণ্ঠন করা হয় তার ইজ্জত ও মান-সম্মান। অবশেষে তিনি সার্বদের জাহান্নামের পাতালপুরী থেকে শরণার্থী শিবির পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন। তিনি

সেখানে পৌঁছলে পাশ্চাত্যের বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা, মিডিয়া ও টিভি নেটওয়ার্ক এর প্রতিনিধি ও বিশ্লেষকরা তার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য তার চারদিকে ভীড় জমায়। তিনি দু'-চারটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর দুঃখ ও বেদনায় কাঁদতে লাগলেন। চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। বাকী কাহিনী তার মুখ থেকেই শ্রবণ করুন। তিনি বললেন—

"আমার ব্যক্তিত্ব এত বেশী বিকৃত হয়ে গেছে যে, তোমরা আমাকে প্রশ্ন করছো এবং সত্য জানার জন্য আমার চতুর্দিকে জড় হয়েছো। আমি ভিতরে ভিতরে ভাবছি, তোমরা তো আমাকে একটি কানাকড়িও দাওনি, অথচ আমাকে প্রশ্ন করছো? এখন সত্য বলার আমার কোন আকর্ষণ নেই। আগ্রহ নেই। আমি সত্য চাই না। আমি ভিক্ষা চাই, ভিক্ষা....।"

যাদের ইদানিং ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, তারা অবশ্যই ইউরোপের বড় বড় শহরগুলোতে বসনিয়ার মুসলমান মহিলা ও বাচ্চাদেরকে ভিক্ষা করতে দেখেছেন। এরা কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ভিক্ষুক নয়। তাদেরকে তো ভিক্ষুক বানানো হয়েছে। মুসলিম বসনিয়ার ভাবমূর্তিকে বিকৃত করাই তার আসল উদ্দেশ্য।

বসনিয়ার আকুতি

আমি বসনিয়া হার্জেগোভিনার সেই মোকাদ্দমার দিকে ফিরে যেতে চাই, যা আন্তর্জাতিক আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। যার বিশদ বিবরণ আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। এই মুকাদ্দমায় এমন একটি প্রশ্নও উত্থাপন করা হয়েছিল যার উত্তর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বসনিয়া হার্জেগোভিনার মহামান্য প্রেসিডেন্ট আলীজাহ্ ইজ্জত বেগোভিচ নিজের আবেদনপত্রে জাতিসংঘের চার্টারের অনুচ্ছেদ নম্বর ৫১-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন যে, উক্ত অনুচ্ছেদের আলোকে কোন দেশ যদি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তার নগর ও নাগরিক নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে তখন সেই দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের এবং সমস্ত নাগরিকের এককভাবে হোক, কিংবা সমষ্টিগতভাবে তাদের সকলের আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর যেহেতু বসনিয়াকে এখন একটি স্বাধীন ও পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘ স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং রীতিমত জাতিসংঘের একটি সদস্য দেশ হয়ে

গেছে এমতাবস্থায় যখন তার উপর নগ্ন আগ্রাসন চালানো হয়েছে, তখন তাকে নিজের আত্মরক্ষার জন্য বাইরের রাষ্ট্র হতে অস্ত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে কেন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল?

আজ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আলীজাহ ইজ্জত বেগোভিচ-এর এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয়া হয়নি।

ঠিক একই ধরনের প্রশ্ন প্রফেসর ফ্রান্সিস এ বোয়েল বসনিয়া হার্জেগোভিনার এটর্নি হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাষ্টিসে পহেলা এপ্রিল, ১৯৯৬ সনের বৈঠকে একটি নতুন উদ্ধৃতি দিয়ে উত্থাপন করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে যে ঐতিহাসিক কনভেনশন হয়, সে কনভেনশনের গৃহীত প্রস্তাবের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে সে সব দেশকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন যারা সেই কনভেনশনের গৃহীত প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি বলেন—

"যেসব দেশ সেই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের সকলেরই উচিত ছিল বসনিয়ার মজলুম মুসলমানদের সব ধরনের সাহায্য প্রদান করা। কারণ, তারা নগ্ন আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। আর এই আগ্রাসনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মুসলিম নিধন বা মানব নিধন। এখন আপনারা এ প্রশ্নের উত্তর দিন, কেন আপনারা বসনিয়ার আত্মরক্ষার জন্য সীমিত অস্ত্রও তাকে প্রদান করলেন না। যা দ্বারা সে নিজের জনগণকে আগ্রাসী বর্বরতাদের থেকে রক্ষা করতে পারতো। উপরন্তু আপনারা তার উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন?"

আদালতের পুরো কার্যক্রমের ভিতর কেউই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন না। তাই আজও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্কন্ধে এ প্রশ্নটির উত্তর রয়ে গেছে।

ডঃ চন্দ্র মুজাফফর হচ্ছেন মালয়েশিয়ার একজন প্রসিদ্ধ আইনবিদ এবং জাষ্ট ওয়ার্ল্ড ট্রাষ্ট-এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি বসনিয়ার ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাষ্টিসের পক্ষ থেকে যে রায় ঘোষণা করা হয়েছে, সে বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের ভূমিকায় একটা তিক্ত সত্য কথা লিখেছেন। তিনি বলেন—

"বসনিয়াতে যেভাবে মুসলমানদেরকে সার্ব হিংস্র পাষণ্ডদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং জালেম ও মজলুমের এই যুদ্ধে পাশ্চাত্য সমাজ যেভাবে দ্বিমুখী পলিসি গ্রহণ করেছে এবং অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কে একই নজরে দেখেছে, এতে করে মুসলিম উম্মাহ পাশ্চাত্যের তথাকথিত প্রগতিবাদী সভ্য সমাজ থেকে (যারা উঁচু গলায় ন্যায়, ইনসাফ ও মানবাধিকারের কথা বলে বেড়ায়) সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়েছে এবং চিরদিনের জন্য তাদের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। বসনিয়ার আত্মার উপর যে গভীর ঘা সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামী জগত যুগ যুগ ধরে তার ব্যথা অনুভব করতে থাকবে।"

প্রফেসর ফ্রান্সিস এ বোয়েল অত্যন্ত আবেগ ও জযবা সহ বসনিয়া হার্জেগোভিনার মোকদ্দমা লড়েছিলেন। তিনি উক্ত বইটির দু' জায়গায় নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। বইটির শুরুতে এক পৃষ্ঠা ও কয়েক লাইনের ভিতর তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে, "বৃহৎশক্তিবর্গ বসনিয়াকে ধ্বংসের কালীদেবী (Machi Avellain God)-এর সামনে একটি কোরবানী হিসেবে পেশ করেছে এবং তারা নিজেরা বসে বসে তামাশা দেখেছে.... এখন ইউরোপে শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের কথা বলা একেবারেই অর্থহীন।"

বইটির উপসংহারে প্রফেসর ফ্রান্সিস এ বোয়েল কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়ার পর লিখেন, "বসনিয়া হার্জেগোভিনার বাহাদুর তৌহিদী জনতার ভবিষ্যত একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের হাতে ..... তিনিই সেই মহান আল্লাহ যিনি এখন পর্যন্ত এমন মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন.... সেই মহান আল্লাহ আগামীতেও তাদেরকে রক্ষা করবেন নিঃসন্দেহে।"

বসনিয়া জিন্দাবাদ.... মুসলিম বিশ্ব জিন্দাবাদ।

এস. এম. যফর

প্রথম অধ্যায়
জাহান্নামের প্রথম গহ্বর

৩০শে মে। ১৯৯২ সাল। রোজ শনিবার। প্রভাতের স্নিগ্ধকোমল সোনামাখা সূর্যের কিরণ চারদিকে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক ওরফে জিমুর চোখ খুলে গেল। স্বাভাবিকভাবে নয়। বাইরের একটানা গোলাগুলির শব্দেই সে জাগ্রত হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে প্রেজডোর এরিয়াতে ব্যাপক গোলা বর্ষণ শুরু হয়েছে। জিমু নিরাপত্তার ভয়ে নিজ গৃহে কয়েকদিন ধরে রাত্রিযাপন ছেড়ে দিয়েছে। তার বিরাট বাড়িটির একটি দরজা বাজারের দিকে এবং অন্য দরজাটি সূর্যের আলোর বিপরীত দিকে। এদিকে বাবলা গাছের ঘন জঙ্গল। এ অংশটি শহরের কেন্দ্রস্থলে হলেও মনে হয় একটি গভীর জঙ্গল। গতরাতে জঙ্গলের ঐ প্রান্তে অবস্থিত পেকানী এলাকা থেকে বারবার ফায়ারিং এর শব্দ ভেসে আসছিল। তা কমেনি। ক্রমেই বেড়ে চলছে। চারিদিকে ছিল আতঙ্ক আর উত্তেজনা। তাই জিমুর অনেক দেরীতে ঘুম ধরেছিল। জিমু জানতো, নববর্ষের সময়ও যুবকরা আনন্দ উল্লাসে বিভোর হয়ে এ ধরনের ফাঁকা গোলাগুলি করে থাকে। অন্যান্য উৎসব আয়োজনেও তাই হয়। কিন্তু ভোর থেকেই পিকানী এলাকা থেকে প্রবল গোলাগুলির যে শব্দ ভেসে আসছিল তাতে মনে হচ্ছিল, সেখানে সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। বরং রীতিমত যুদ্ধ হচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্রের গোলার ঝিলিকে ও বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজে প্রেজডোরের আকাশ বাতাস অশান্ত হয়ে উঠেছে। চারদিকে চাপা উত্তেজনা। ভয় ভয় ভাব। লক্ষণ শুভ মনে হচ্ছিল না।

শান্তির নীড়ে অশান্তির হাওয়া

বিছানা ছেড়েই জিমু দেখল, জানালার ঠিক মাঝে গুলির আঘাতে একটি ছিদ্র হয়েছে। জানালাটি বাবলা গাছের জঙ্গলের দিকে খোলে। গুলিটি বাড়ির বাইরের দরজার কপাট বিদীর্ণ করে কাঁচের তৈরী ডবল গ্লাসের জানালার পাল্লা ভেদ করে তার বিছানার সামান্য উপরে এক

জায়গায় গেঁথে আছে। সেখান থেকে তার বড় আয়নাটির দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি। জিমুর দৃঢ় বিশ্বাস, এ গুলিটি তাকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়নি। এটি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে এখানে এসে পড়েছে। কারণ আজ পর্যন্ত সে কাউকে কোন ধরনের ক্ষতি করেনি। রাজনীতির সাথে সামান্যতম সম্পর্কও তার নেই। বিশেষ করে নিজেদের চারপাশের খৃষ্টান সার্ব ও বসনিয়ান মুসলমানদের যে রাজনৈতিক কলহ বিবাদ চলছে, যা এখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে করে অবস্থা, এ সব থেকে সে অনেক দূরে। এসব সংঘাতকে সে অহেতুক ও হাস্যকর মনে করে। প্রেজডোরে ক্রোট বংশোদ্ভূত খৃষ্টানরাও থাকে, তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। জিমু মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোন ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে জড়িত নয়। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেজডোরকে একটা শান্ত এলাকা বলে মনে করা হয়। মুসলমান ও খৃষ্টান সার্বদের মধ্যে সম্প্রীতি ভাব বজায় ছিল এবং আছে। তবে সানা নদের পারে গরম মৌসুমে যে ফুটবল ম্যাচ হতো শুধুমাত্র সে সময়ই মুসলমান ও সার্বরা চিত্ত বিনোদনের লক্ষ্যে দু' গ্রুপ হতো। এ সব খেলার আয়োজন সব সময়ই আমোদ–প্রমোদের ব্যবস্থাপক 'ইকো' নামক এক সার্ব করে থাকতো। তার একমাত্র কাজ, ক্লাবে ও কমিউনিটি সেন্টারে লোকদেরকে উল্লাসে মাতিয়ে তোলা, নাচ–গান ও হৈহুল্লোড় করে সময় কাটানো। ফুটবল ম্যাচে কখনো মুসলমানরা বিজয়ী হত, আবার কখনো সার্বরা। কিন্তু খেলার পরিসমাপ্তি ঘটলে ইকো একটি মনোরম ভোজের আয়োজন করতো। তবে ভোজের খরচটা যে দল হেরে যেত তাদেরকেই বহন করতে হতো। ভোজের পর শুরু হতো ড্রিংক এর পালা। যার যা রুচি সে তাই নিতো। কেউ কোক, সেভেনআপ, পেপসি পান করতো, আবার কেউ মদপান করতো। তবে অধিকাংশ মুসলমান মদ থেকে বিরত থাকতো। খৃষ্টানরা বেশীর ভাগই মদপান করতো। তারপর সকলে মিলে হেলে–দুলে, নেচে গেয়ে আমোদ ফুর্তি করে সময় কাটিয়ে নিজ নিজ গৃহের দিকে পা বাড়াতো। কিন্তু সে সময় আর বর্তমান সময়ের মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য। অদৃশ্য এক কালো হাতের ইশারায় রাতারাতি সার্ব খৃষ্টানরা প্রেজডোরের ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়, তারপর থেকে তাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে

যায়। সে সম্প্রীতির ভাব আর তাদের মাঝে লক্ষ্য করা যায় না। এখন তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য হিংস্র হয়ে উঠছে। বিভিন্ন জায়গায় বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে দিয়েছে। সার্ব জনসাধারণও আর্মির উর্দি পরে মহল্লায় মহল্লায় টহল দিতে শুরু করেছে। তারা শহরমুখী সবগুলো সড়কে ব্যারিকেড তৈরী করেছে। তারা এ কাজকে 'লাকড়ীর প্রতিবন্ধক বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করছে। এক প্রভাতে দেখা গেল, সার্বিয়ার পতাকা শহরের সমস্ত ইমারত, দালান কোঠা, টাউন হল, পুলিশ স্টেশন এবং প্রেজডোর হোটেলের উপর স্থাপন করা হয়েছে। বসনিয়ার দীর্ঘ ইতিহাসে প্রেজডোর শহরে আর কখনো এমন আজব অবস্থা ও মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। শহরের অধিকাংশ নাগরিকই মুসলমান। এ অবস্থাতে তারা অত্যন্ত পেরেশান ও ভীষণ আতংকগ্রস্ত। একদিন সার্বরা প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ করে মুসলমানদের বুঝিয়ে দিল যে, তারা প্রেজডোর অধিকার করে নিয়েছে। তাদের এ দখলদারীর পর প্রায় একমাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই শহরের সমস্ত মুসলমান ও ক্রোট সংখ্যালঘু খৃষ্টানদেরকে চাকুরী থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে।

হিংসা-বিদ্বেষের প্রসার

সার্বরা টেলিভিশন ও রেডিও স্টেশন দখল করে নিজেদের পরিকল্পিত পছন্দসই প্রোগ্রাম সম্প্রচার আরম্ভ করে দিয়েছে। সার্ব ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিংবা খুবই সীমিত আকারে তা প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মনে হয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর উপর কড়া প্রহরা নিযুক্ত করা হয়েছে। জিমুর ধারণা, এসব হচ্ছে ক্ষমতার লড়াই। এতে আমার কি আসে যায়, আমার কাজ চললেই হল।

এ যাবত কুদরত তার উপর যথেষ্টই মেহেরবান ছিল। ভাল বেতন পায়। দু' সন্তানের বাপও বটে। তার এক ছেলের বয়স ষোল, আরেক ছেলে বারোতম বছরে পদার্পন করেছে। তার দাম্পত্য জীবন তেমন সুখের ছিল না। কারণ, যৌবনের উন্মাদনায় সন্ধ্যা হলেই নাইট ক্লাবে গিয়ে মদ, কাবাব ও যুবতীদের নিয়ে আত্মহারা হয়ে থাকতো। এখন

তার ছেলেরা যুবক হচ্ছে এবং তার বয়সও বেড়ে চলছে। তবুও সে তার সেই কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেনি। তার স্ত্রী ইলমা এ অবস্থাতে খুবই পেরেশান। তবুও সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতো যে, তার স্বামী তার বাচ্চাদের ভবিষ্যত চিন্তা করে অতি শীঘ্র ভাল হয়ে যাবে এবং ভাল মানুষের মত চলাফেরা করবে। জিমু পুরো গত সপ্তাহ ধরেই নিজের গৃহে অবস্থান করছে। সার্বরা তিন চারদিন পূর্বে প্রেজডোর হতে আনুমানিক দশ মাইল দূরে অবস্থিত হীমাবারায়েন গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ করেছিল। জিমু এই পুরো সময়টাই টেলিভিশনে ফিল্ম দেখে কিংবা পাড়া প্রতিবেশী বা নিজের পরিবারের সাথে দাবা খেলে কাটিয়েছে। পাড়া প্রতিবেশী, আর নিজের আত্মীয়দের কাছে এত বেশী আসা–যাওয়া আর কখনো হয়নি। ঘরে বসে সময় কাটছিল না তাই বাড়ীর আশে পাশের প্রতিবেশী ও আত্মীয়–স্বজনদের বাড়ীতে আনাগোনা করছিলো এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন কথাবার্তা ও মতবিনিময়ে সময় কাটাচ্ছিলো। সে রাতে জিমু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার চাচাতো ভাই ফাযেলের সাথে দাবা খেলে তার বাড়ীতে পরিবার সহ ঘুমিয়েছিল। ফাযেলের বাড়ীটি জিমুর বাড়ীর একেবারেই সামনে গলির অপর পাশে অবস্থিত। তাই সেখান থেকে নিজের ঘরের পুরো অবস্থাটা ভালভাবেই অবলোকন করা যায়। সেদিন প্রভাতে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ীর অবস্থাটাই গভীরভাবে দেখছিল। হঠাৎ তার চাচাতো ভাই ফাযেল তার বেডরুমে করাঘাত করল এবং তাকে একটা নতুন সংবাদ শুনালো, "স্থানীয় রেডিও স্টেশন থেকে এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, প্রেজডোরের উপর মুসলমান চরমপন্থীরা আক্রমণ করে বসেছে।" এ খবরটি বারবার সম্প্রচার করা হচ্ছিল এবং প্রতি দশ মিনিট পরপর এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল যে, "জনগণের কাছে আবেদন, তারা যেন নিরাপত্তার খাতিরে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করেন এবং ঘর থেকে মোটেও বের না হন।"

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা

বসন্তের প্রভাতটি ছিল খুবই চমৎকার। সকালে সূর্যের ঝলমলে আলো বসনিয়ার আকাশ বাতাসকে করছিল উদ্ভাসিত। কিন্তু পরিবেশটা

বেশ থমথমে মনে হচ্ছিল। সবদিকেই একটি ভীতি ও আতংকের ভাব। প্রচার মাধ্যমগুলো যেভাবে একতরফা সুপরিকল্পিত ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে তাতে প্রেজডোরের মুসলিম জনতাই বেশী উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, যার কল্পনা করতেও আত্মা কেঁপে ওঠে। একে অপরকে প্রবোধ দিচ্ছিল, আমরা যতটুকু আশঙ্কাবোধ করছি, পরিস্থিতি ততটা আশঙ্কাজনক নয়। কিন্তু একে অপরকে সান্ত্বনা দিলেও তারা নিজেদের কথার প্রতি নিজেরাই আস্থা রাখতে পারছিল না। সকলেই অবগত ছিল যে, সামান্য কিছু দূরে অবস্থিত বসনিয়া হার্জেগোভিনার রাজধানী সারাজেভোতে রীতিমত মুসলমান ও সার্ব সৈন্যদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হচ্ছে। এবং সেখানে নিরস্ত্র মুসলমানদের পাইকারী হারে জবাই করছে সার্ব হায়েনারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা একে অপরকে অভয় দিয়ে বলছিল যে, "সংঘর্ষের এলাকা আমাদের থেকে অনেক দূরে, এখানে কিছুই ঘটবে না। এটা কোযাকার পার্বত্য অঞ্চল। আমরা এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা যুগ যুগ ধরে মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করে আসছি।"

কিন্তু দেখতে দেখতে শহরের অলিগলি অপরিচিত লোকে ভরে গেল। এদের সবাই বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত। তাদের উর্দীতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন। এরা সবাই সার্বিয়ান। তাদের প্রতিটি ব্যক্তি, এমনকি আট ন' বছরের বালক পর্যন্ত অস্ত্রে সজ্জিত। বিশেষ ধরনের আর্মি উর্দি পরিহিত। একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, দু' বাহুতে সংরক্ষিত গুলির দু' দুটি পেটী, চামড়ার কভারে একটি বড় খঞ্জরের মত ধারালো ছুরি এবং কিছু হাতবোমা, এসব হচ্ছে একজন বিশ্বস্ত সার্বসেনার বিশেষ আলামত। যার কাছে মুসলমানদের হত্যার মারণাস্ত্র রয়েছে, সেই একজন সত্যিকার সার্ব। জঙ্গীবাজ সার্বদের মতে যে সব সার্ব মুসলমানদের নিধন কাজে শরীক হচ্ছে না এবং যাদের হাতে অস্ত্র নেই তারা সার্ব হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, বরং এ ধরনের মানবতাবাদী লোকদেরকে সার্ব হায়েনারা তাদের তথাকথিত 'সার্বপ্রজাতন্ত্রের' গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করে থাকে। তাদের দলীল, যারা সার্ব তাদেরকে অবশ্যই অন্য সম্প্রদায় বিশেষ করে

মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার মারণাস্ত্র সাথে রাখতে হবে। পক্ষান্তরে যারা অস্ত্র রাখে না, যারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতিভাব রাখতে চায়, তারা নিঃসন্দেহে গ্রেটার সার্ব নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী, তাই এরা গাদ্দার বৈ কিছুই নয়। এসব হচ্ছে মানবতা বিরোধী সার্ব হায়েনাদের একটি মনগড়া থিওরী।

সার্বরা জানতো, বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং তার সীমারেখাকেও মেনে নিয়েছে। এমন অবস্থায় বসনিয়ার সীমানার ভিতরেই সার্বপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা এবং তার পত্তন, এক অবাস্তব খাহেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সার্বরা এ অবাস্তব থিওরী প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। নতুন প্রশাসন এসেই এমন কিছু পদক্ষেপ নিল, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সার্ব ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু ক্রোট বংশোদ্ভূত খৃষ্টানদেরকে সম্পূর্ণ অনুগত দাস হতে বাধ্য করা। এ নতুন প্রশাসনের মেইন শক্তি হল, মাতাল উচ্ছৃঙ্খল, গুণ্ডা প্রকৃতির সার্ব যুবকদের দিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক ফোর্সেস, যারা পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে প্রশাসনের নীতি ও তার হীন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে যাচ্ছে। আর এভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে উক্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে উঠেছিল তা ক্রমেই বুদবুদের ন্যায় হাওয়ায় মিলে গেছে। তারা হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করছে যার লক্ষ্য হচ্ছে, এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যে, সেখানে সার্ব ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের জীবন ধারণ তো দূরের কথা, শ্বাস-নিঃশ্বাস নেওয়ারও কোন অবকাশ থাকবে না। বালক থেকে শুরু করে যুবক, যুবতী, অর্ধবয়সী,বৃদ্ধ এমনকি মহিলারা পর্যন্ত, মোটকথা সার্বিয়ান সকলেই বর্বর, কসাই ও হিংস্র হায়েনাতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে, মানবতাকে নিপিষ্ট নিষ্পেষিত করে এবং চরম নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করাই সার্বদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। দর্শক মাত্র হতবাক ও হতভম্ব, যুগ যুগ ধরে যারা বন্ধু ছিল, আপন ছিল, তারা আজ কীভাবে রক্তচোষার ন্যায় নিজেদের রং বদল করে এক চরম শত্রুর রূপ ধারণ করেছে। কাল যাদের সাথে হেসে খেলে জীবন কাটিয়েছে আজ তারা শুধু

মুসলমান হওয়ার অপরাধে কীভাবে তাদের চরম ঘৃণার পাত্র হলো! আজ তাদের পুরাতন বন্ধুরা, সেই পুরাতন প্রতিবেশীরা তাদেরই রক্তপানের জন্য উন্মাদ হয়ে পড়েছে। প্রেজডোরের নয়া প্রশাসনের জুলুম–নির্যাতনের ধারক বাহক এরাই। সার্ব জুলুমবাজ জনগণের কাছে বসনিয়া–হার্জেগোভিনা 'একটি প্রত্যাখ্যাত প্রজাতন্ত্র' ছিল। তাদের প্রচার মাধ্যমগুলো বারবার এ পরিভাষাটির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এসব মিথ্যা, বানোয়াট অপপ্রচার তৈরীর ফ্যাক্টরী ছিল বানজালুকা ও পেল টিভি এবং তার সাথে সাথে দৈনিক পত্রিকা 'বানজালুকা ডেইলী ভয়েস' যার নাম পরিবর্তন করে পরে 'সার্ব ভয়েস' রাখা হয়েছে।

জিমু জানতো যে, এসব জাতিগত ধর্মভিত্তিক যুদ্ধে সবচেয়ে প্রথমে সত্যবাদী লোকদেরই লাশ হতে হয়। আত্মোৎসর্গ করতে হয়। অবশ্য শেষ পর্যায়ে দাঙ্গাবাজদেরও পরাজয়বরণ করে নিতে হয়, কিন্তু ততক্ষণে তারা তাদের জুলুমের হাত নিষ্পাপ সত্যবাদীদের খুনে রঙিন করে নিতে সক্ষম হয়। প্রেজডোরের স্থানীয় পত্রিকা 'কোযারা হেরাল্ড' ও অন্যান্য মিডিয়ার মত সার্ব সাম্প্রদায়িকতার রঙে রঙিন হয়ে পড়েছে। প্রতি শুক্রবার পত্রিকার স্টলগুলো বিভিন্ন ধরনের বানোয়াট অপপ্রচার, মিথ্যা, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সংবাদে পূর্ণ বিভিন্ন পত্রিকা দিয়ে ভরে থাকতো। কোযারা হেরাল্ডের সম্পাদক মায়েল মিউটিক, যে এখন এ পত্রিকার মালিকও বটে। সে নিজের ধর্মীয় ভাই ও সাম্প্রদায়িকতায় উন্মাদ সহযোগী 'কোযোকো, আয়কম এবং রেড মিউটিক প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে তিন শিফটে ডাহা মিথ্যা সংবাদ তৈরী করে সার্বজনগণের ভিতর উত্তেজনা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক যে ব্যাপারটি, তা হলো, তারা সাংবাদিকতার মত পবিত্র পেশার ছদ্মাবরণে একটি ভয়ংকর দাঙ্গার আগুন উস্‌কে দিচ্ছে। মিউটিক শুধু নীতিহীন, কুটিল ও বেঈমান সাংবাদিকই নয়, মানুষ হিসেবেও তার সুখ্যাতি কোন কালেও ছিল না। সে পূর্বে যুগোশ্লাভিয়া সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিল। এ ছাড়াও অজানা আরো কি কি করতো। সে দিনরাত মুসলমান ও ক্রোটদেরকে হুমকি দিয়ে বলতো "যদি মঙ্গল চাস তাহলে অস্ত্র ফেলে দে, যদি অস্ত্র জমা না দিস, তাহলে অতি শীঘ্র তোদের খবর নিবো,

কারণ, সার্ব ছাড়া আর কারো হাতে অস্ত্র রাখার কোন অধিকার নেই।”

তার এ সুর এখন প্রতিটি সার্ব চরমপন্থীদের প্রাণের দাবীতে রূপ নিয়েছে। এ নরপাষণ্ড (মিউটিক) কবি হওয়ারও দাবী করতো। অথচ তার লিখনীতে কবিতার ‘ক’ও পাওয়া যায় না। সে অন্যকে কষ্ট দিয়েই শান্তিবোধ করে। মানবাধিকার লংঘন, মুসলমানদের অপমান করা ও সতী সাধ্বী নারীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তার নেশা। মিউটিক আসলে কোযারা পার্বত্য অঞ্চলের সে সব লোকদের মুখপাত্র যাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানবতাবোধ ও নৈতিক অবক্ষয় চরমভাবে কলংকিত। এ শহরটি ধ্বংসের মূল হোতাদের মধ্যে তার নাম যদি অগ্রে রাখা হয় তবে তা অবাস্তব হবে না। সার্বদের সামনে যেনতেন ইতিহাস সে তার লিখনীর মাধ্যমে তুলে ধরছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ও ক্রোটদের সমূলে বিনাশ বা দেশান্তরিত করা। তার এ তথাকথিত কাল্পনিক ও হাস্যকর থিওরী বর্তমানে বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। প্রেজডোরের নয়া প্রশাসন এ মতবাদকে সফল করার জন্য সমস্ত সরকারী কলকব্জাকে ব্যবহার করছে। নামে মাত্র কবিতা লিখে সে সার্বদের মধ্যে নীতিবর্জিত উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তুলছে। ‘নৈতিকতা ও সাংবাদিকতার মূল্যবোধ’ তার কাছে ছিল একেবারেই অপরিচিত। সংবাদপত্র ও রেডিও–এর ব্যাপার নিয়ে জিমু ও মিউটিকের সম্পর্ক কোন সময়ই ভাল ছিল না। সে মিউটিককে তার দীর্ঘ ভারী দেহ, দাড়ি বিশিষ্ট চেহারা, সিগারেটের পাইপ মুখে চেপে একটি চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে কয়েকবার আসতে যেতে দেখেছে। আজ সকালে জিমু মিউটিকের ভারী ও কর্কশ আওয়াজ রেডিওতে শুনেই চিনতে পারল। সে বার বার রেডিও শ্রোতাদের সম্বোধন করে বলছিল, “প্রেজডোরের উপর মুসলমান চরমপন্থীরা আক্রমণ করে বসেছে।” শহরের নাগরিকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে সে বলল, “কেউ যেন নিজের ঘর থেকে বাইরে বের না হয়।”

বিশেষ জরুরী কমিটির পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা প্রদান করে বলল, “যে কেউ তাদের নির্দেশ মাফিক কাজ করবে, তার জানমাল রক্ষার জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হবে।” আরো বলল, “সমস্ত অফাদার, বিশ্বস্ত

নাগরিকদের বলা হচ্ছে, যেন তারা নিজ নিজ গৃহের ছাদে সাদা পতাকা ভালভাবে উড্ডীন করে রাখে।”

সাদা পতাকা রহস্য

ছোট্ট বালকরা পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম ছিল যে, সাদা পতাকার আসল রহস্য হল সার্ব ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের শনাক্ত করা। জিমু তার অভ্যাস অনুযায়ী এক কাপ কফি পান করল। অতঃপর একটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। মাঝে মধ্যে খিড়কী দিয়ে নিজের গৃহের দিকও নজর বুলাচ্ছিলো। তখনও সেখানে অস্বাভাবিক কোন কিছু দেখতে পায়নি। অন্য একটি খিড়কী দিয়ে তার নিজের ঘর থেকে চল্লিশ গজ দূরে অবস্থিত সামনের বিল্ডিংয়ের দিকে তাকালো। সেই বিল্ডিংয়ের ছাদে দু'জন সশস্ত্র আর্মি দেখতে পেল। তারা একটু পরপর সামনের একটি আবাসিক এলাকা 'ছাকিনা'–এর দিকে লক্ষ্য করে ফায়ার করে যাচ্ছে।

“এসব লোকদের উপর মোটেও বিশ্বাস করা যায় না” জিমু খিড়কীর কাছে রাখা যে টুলের উপর বসে কফি পান করছিল তা খানিকটা সরিয়ে বিড় বিড় করে বলল।

ইলমা নাস্তা তৈরী করার জন্য নিজ গৃহে গিয়েছিল। সে এসেই নাস্তা টেবিলে রাখল। ফাযেলের স্ত্রীও কিছুক্ষণ রান্নাঘরে নাস্তা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিল। এখন সবাই টেবিলের চারপাশে নাস্তা করতে বসে গেল।

গ্রেফতারীর ঘটনা

শহরটি এখনো বারবার স্বয়ংক্রীয় অস্ত্রের গুলিবর্ষণের আওয়াজে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ জিমুর ঘরের উপর ফাযেলের দৃষ্টি পড়ল, সে আঁতকে উঠে বলল ঃ “তোমাদের ঘরের কাছে কিছু আর্মি জোয়ান ঘোরাফেরা করছে।” জিমু জানালার পর্দাটা সামান্য সরিয়ে দেখল, দু'জন সশস্ত্র মুখোশধারী খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের গৃহের প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে মাথা সামান্য নিচু করে পজিশন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ঠিক তখনই ফাযেলের গৃহের দরজায় করাঘাতের প্রচণ্ড শব্দ হলো। দরজা খুলে জিমু দেখতে পেল, সে তার বাড়ীর সামনে যে ধরনের মুখোশধারী দু'জন সশস্ত্র যুবককে দেখেছিল তাদেরই মত একজন মুখোশধারী আর্মি দরজার সামনে

দণ্ডায়মান। সে তার স্বয়ংক্রীয় রাইফেলটি তাদেরকে লক্ষ্য করে তাক করে রেখেছে।

"তোমাদের ঘরে কি কোন অস্ত্র আছে?"

অত্যন্ত কর্কশ তার ভাষা।

কিছুক্ষণের জন্য যেন ফাযেল ও জিমু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

"তোমরা কি বধির? কানে শুনছো না? আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, তোমাদের কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা?"

"নেই ভাই, আমাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই" ফাযেল বলল।

"না আমি তোমাদের ভাই নই। কখনো হতেও পারি না। এসব ভাল কথা নিজেদের জন্যই রেখে দাও।"

"আর হাঁ তুমি কি বলছো!" জিমুর দিকে তাকিয়ে সে বলল।

"আমার কাছেও কোন হাতিয়ার নেই, না কখনো ছিল".... জিমু বলল।

সার্ব সৈন্যটি বলল, "তোমরা মুসলমানরা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নও। ভিতরে গিয়ে তল্লাশী চালিয়ে দেখতে হবে।" এ বলে সে আড়চোখে দেখে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্যও সে তাক করা রাইফেলটি নিচে নামাল না এবং ঘরের সবখানে গভীরভাবে নজর ফিরিয়ে টেবিলের সামনে এসে সবাইকে রাইফেলের আওতায় নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "তোমাদেরকে এখ্খুনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।" সে নির্দেশের সুরে সবাইকে বলল।

"সবদিকেই ফায়ারিং হচ্ছে, তা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে নিরাপদ স্থানে হেফাযতে রাখতে চাই।"

সে মারাত্মভাবে নিজের স্বয়ংক্রীয় রাইফেলটি জিমু ও ফাযেলের দিকে তাক করে তাদেরকে বের হয়ে পড়ার জন্য বলল।

ফাযেল প্রথমে উঠে দাঁড়াল এবং নিজের বাহু দু'টো মাথার উপর তুলে কামরা থেকে থেকে বেরিয়ে পড়ল। সৈন্যটি এখন জিমুর দিকে রাইফেল তাক করে ফাযেলের অনুসরণ করার নির্দেশ দিল। বাচ্চারা ভয়ে আতঙ্কিত হয় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

জিমুও হাত দু'টো মাথার পিছনে রেখে অতি সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল এবং স্লোমোশনের ভঙ্গিতে দরজার দিকে পা বাড়াল। সে জানতো, এ মুহূর্তে সামান্য উত্তেজিত কিংবা অসতর্ক হলে খুবই ভয়ানক পরিস্থিতির

সম্মুখীন হতে হবে। যখন সে আর্মি জোয়ানটির সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন চোখের কোণ দিয়ে মুখোশে লুকানো চেহারাটি চেনার চেষ্টা করল। না, সে কোন পরিচিত মুখ মনে হল না।

"ঘাবড়াবে না জিমু! তোমার কিছুই হবে না" সৈনিকটি বলল।

জিমু অনুভব করল যে, সে আশ্বাস প্রদানের লক্ষ্যে তার কাঁধে মৃদু হাতের স্পর্শও করল।

জিমু পুনর্বার গভীরভাবে তাকে দেখল। কিন্তু কালো মুখোশের পিছনে লুকানো চেহারাটি চিনতে পারল না এবং সৈনিকটির কণ্ঠও কোন পরিচিত ব্যক্তির মনে হল না।

সে কয়েক কদম হেঁটে ঘরের আঙ্গিনায় এসে পৌঁছল। ওখানে আরেকজন গাঢ় রঙের উর্দি পরিহিত সৈনিক প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। সে জিমু ও ফায়েলকে গৃহের প্রবেশ দ্বার পানে যেতে বলল, যা বাবলা গাছের ঝোপের দিকে অবস্থিত। আনুমানিক একশ' গজের এ দূরত্বটা অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। ফায়েল জিমুর আগে আগে চলছিল, রাইফেলের নলটা জিমুর কোমরে এমনভাবে লাগানো ছিল, যেন সে নিজেই এই ভারী বোঝাটা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। বাতাসের মধ্যে বারুদ ও বিভিন্ন বস্তু পোড়ার তামাটে গন্ধ ছড়িয়ে আছে। জিমু দেখতে পেল, ধোঁয়ার কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা প্রেজডোরের পুরো আকাশটাকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পুরাতন টাউন সার্বদের লাগানো আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। জিমু পিছনে ফিরে একনজর নিজের গৃহের পানে তাকাতে চাইল, উদ্দেশ্য, তার পরিবারবর্গের কী পরিণতি ঘটল তা দেখা। কিন্তু সে সাহস পেলনা। তার ভয় হচ্ছে যেন তার এদৃষ্টি জীবনের শেষ দৃষ্টি নাহয়।

ভূগর্ভস্থ জিন্দানখানা

তারা চলতে চলতে একটি ইমারতের দরজার কাছে এসে উপনীত হল। তাদের পিছনে পিছনে যে সৈনিকটি আসল, সে পিছনেই রয়ে গেল। দরজার কাছে দাঁড়ানো আরেকজন সৈনিক তাদেরকে ইমারতের ভিতরে প্রবেশের নির্দেশ দিল। তারা ইমারতের একটি ভূগর্ভস্থ কামরায় নেমে এলো। যেখানে তারা আরো অনেক প্রতিবেশী ও পরিচিত লোকদেরকে দেখতে পেল। যাদের সবাই মুসলমান। দরজার কাছেই

তাদের অনেক সার্ব প্রতিবেশী রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে এদিক–সেদিক আসা যাওয়া করছে। পেরু এই বিল্ডিংয়েই থাকেন। সকলকেই চিনতেন। বললেন, "এ ভূগর্ভস্থ কক্ষটি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী নিরাপদ, পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। দাঙ্গা–হাঙ্গামা শেষ হওয়া পর্যন্তই শুধু আমরা তোমাদেরকে এখানে আটকে রাখবো।"

অতঃপর তিনি সবাইকে নিজের ঘরের তৈরী আলু বুখারার ব্রাণ্ডী খেতে দিলেন। দশ মিনিট পর সার্ব সেনারা আরও তিনজন প্রতিবেশীকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো। তারাও মুসলমান। এরপর আরো দু'জন এলো। তারপর জিমুর আরেক চাচাতো ভাই নুদু, তার ছেলে আলীজান এবং তাদের সাথেই জিমুর ছেলে এরিও এলো। এরির বয়স ষোল হবে। ভয় ও আতঙ্কে এরিকে বয়সের চেয়েও বড় মনে হচ্ছে। এরি অনবরত কেঁদে চলছে।

"বেটা আমার, কেঁদো না। এসব কিছু অতি তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে। কেঁদোনা, মাশাআল্লাহ, এখন তো তুমি জোয়ান হয়ে গেছো। জোয়ান মানুষের পক্ষে ক্রন্দন করাটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। এখন তুমি বড় হয়ে গেছো, সাবাস....।" জিমু এরির পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

"আব্বু! এগুলো আমার একেবারেই সহ্য হচ্ছে না।" এরি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, "তারা ওকে মেরে ফেলেছে.....।"

এ কথা শুনে জিমুর মনে হল যেন শরীরের শিরায় শিরায় তার রক্তগুলো হঠাৎ করে জমে নিশ্চল হয়ে গেছে। সর্বপ্রথম তার আশংকা হলো তার ছোট্ট ছেলে ডেনীর ব্যাপারে, অতঃপর তার স্ত্রীর ব্যাপারে। তবে কি ওরা তাদেরকে মেরেই ফেলেছে। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ইচ্ছে হল, দৌড়ে এখনই ঘরে পৌছতে, কিন্তু তা কি আর সম্ভব!

"কাকে ....? কাকে ওরা মেরেছে?"

জিমু অনেক কষ্টে ছেলের কাছে জিজ্ঞেস করল।

এরি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওর আব্বার দিকে তাকালো, অতঃপর তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলল ঃ ওরা লীণ্ডুকে মেরে ফেলেছে, গুলির একটি পুরা রাউণ্ড ওর শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

জিমু আরেকটি সিগারেট ধরালো এবং একটি লম্বা টান নিয়ে তার ধুঁয়াটা উপরের দিকে ছুঁড়ে মারল।

"ভয়ও মানুষকে কেমন যেন দুশ্চিন্ততায় নিক্ষেপ করে।" জিমু নিজেই বিড় বিড় করে কথাটা বলল।

লীণ্ডু জিমুর পরিবারের সবার নিকটে অত্যন্ত প্রিয়। মিসমিসে কালো শরীর। লম্বা লম্বা পশম। দেখতে সুন্দর একটি কুকুর। সে কুকুরের বয়স মাত্র আঠার মাস হয়েছে। এরি অধিকাংশ সময় ওকে সাথে করে পার্কে কিংবা গার্ডেনে যেত। খেলাধুলা করত। অনেক সময় নিজের বন্ধু–বান্ধবদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য লিণ্ডুকে সাথে নিয়ে ঘুরতো। এরি কুকুরটাকে খেলার বিভিন্ন কলা–কৌশল শিখিয়েছিল। যেমন, দূরে নিক্ষিপ্ত কোন বল বা লাকড়ির টুকরা মুখে করে তা আবার ওর কাছে নিয়ে আসা। পানিতে সাতার কাটার জন্য একই সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দেয়া। এরি লিণ্ডুকে খালের উপরে একটি খুবই সংকীর্ণ পুলের উপর চলতেও শিখিয়েছিল। এছাড়া এরির ইশারায় লিণ্ডু পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের দু'টি পা এরির বুকে রেখে জিহ্বা দিয়ে ওর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতো।

জিমুর কাছে কুকুরটি খুবই প্রিয় ছিল। লিণ্ডুর মৃত্যুতে জিমু যথেষ্ট ব্যথিত। সে তার ক্রন্দনরত ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে ওয়াদা করল যে, সে লিণ্ডুর মত আরেকটি খুবসুরত কুকুর এনে দেবে। কিন্তু কেমন যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে বুঝিয়ে দিলো যে, তার সে অঙ্গিকার পালন করতে হয়ত অ–নেক দিন লেগে যাবে।

সিঁড়ির নিচে আনুমানিক বিশজন লোক জমায়েত হয়েছে। তবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাদের সকলকে জোরপূর্বক ধরে আনা হয়েছে। পেরু তাদের সবার একটি তালিকা তৈরী করল এবং তাদেরকে বলল, "যার কাছে টাকা কিংবা দামী কোন বস্তু রয়েছে সে যেন নিরাপত্তার খাতিরে তার কাছে সোপর্দ করে।"

সে ওয়াদা করল, "এসব আমানত গোলযোগ শেষ হলেই তার প্রাপককে ফিরিয়ে দেয়া হবে।" প্রতিবেশীরা তার কথামত তাই করল। কারণ তার প্রতি সবারই আস্থা ছিল।

নির্যাতনের কালো মেঘ

আনুমানিক এক ঘন্টা পর পেরু জিমুকে বাইরে আসার জন্য বলল। কারণ, বাটুকোভাকোক নামের একজন পুলিশ, যে জিমুকে ভালভাবেই

চেনে, সে জিমুকে তলব করেছে। বাইরে এসেই জিমু হতবাক। নিজেকে তার দিকে তাক করা একটি অটোমেটিক রাইফেলের সামনে পেল। বাটু জিমুকে তার হাত দুটো মাথার উপর উঠাতে নির্দেশ দিল। এরপর তাকে ধাক্কা মারতে মারতে বিল্ডিংয়ের অন্যপ্রান্তে দাঁড়ানো একটি সাধারণ মালবাহী ভ্যানের কাছে নিয়ে এলো। রাস্তায় জিমু দেখতে পেলো, ইমারতের প্রতিটি দরজার কাছে বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র হাতে নিয়ে সার্ব জোয়ানরা সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত। বাটু তাকে বস্তার মত ধরে ভ্যানের পিছনের অংশে জোরে ছুঁড়ে মারল এবং বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল। ওমরী, রেডবো, মুজো সহ আরও কয়েকজন জিমুর প্রতিবেশী সেখানে আগে থেকেই ছিল। এই পার্সেল ভ্যানের কোন জানালা ছিল না। তাই আন্দাজ করা যাচ্ছিল না যে, তারা কোন্ দিকে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট চলার পর গাড়ীটি হঠাৎ থেমে গেল। পিছনের দরজা খোলা হলে তারা দেখতে পেল যে, গাড়ীটি থানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চতুর্দিকে অনেক সার্ব যুবক অত্যাধুনিক রাইফেল নিয়ে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। তারা সবাই মুখোশ ও আর্মি উর্দি পরিহিত। পেট্রোল পুড়ার দুর্গন্ধ সবখানেই ছড়িয়ে আছে। এরপরই জেনারেটর চলার শব্দ ভেসে এলো। জিমুদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন তারা নিজ নিজ হাত উপরে উঠিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। অতঃপর একজন পুলিস সামনে অগ্রসর হয়ে মা বাপ তুলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে তাদেরকে এমন স্টাইলে তল্লাশী করতে লাগল যেমন ঝাঁনু ও দাগী অপরাধীদেরকে করা হয়। জিমুর এক পকেটে সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার এবং অন্য পকেটে কিছু টাকা পয়সা ও নাগরিকত্ব কার্ড ছিল। পুলিসরা সিগারেট ও লাইটার রেখে টাকা পয়সা ও নাগরিকত্ব কার্ড তাকে ফেরত দিয়ে দিল। আনুমানিক আধাঘন্টা পর্যন্ত তাদেরকে এরূপ অবস্থাতেই দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। এ সময়ে তাদেরকে অনেক অশ্লীল গালিগালাজ শুনতে হল। আবার কোন কোন সার্ব তাদেরকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাতও করতে লাগলো। অন্যদিকে সূর্যের তাপ অসহনীয় হয়ে উঠল। জিমু অনুভব করল এখন আর সে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। হয়তো সে শীঘ্র

ভূমিতে পড়ে যাবে। মাথা প্রচণ্ডভাবে ঘুরছে। মনে হচ্ছে সামনের সবকিছু যেন জ্বলছে আর নিভছে। হঠাৎ তার একটি হাঁটু ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে মোচড় খেয়ে গেল এবং মাথায় চক্কর খেয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। একজন সেপাই এগিয়ে এসে তার বাহুমূলের নিম্নদেশে হাত দিয়ে তাকে উঠিয়ে দাঁড় করালো এবং হাতে বিয়ারের একটি ডিব্বা ধরিয়ে দিয়ে বলল ঃ "এটা পান করে নাও, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

জিমু জলদি করে বড় বড় ঢোকে সেকেণ্ডের মধ্যেই ডিব্বাটা খালি করে ফেলল। সত্যি সত্যিই তার শরীর কিছুটা সবল হয়ে গেল। সে বিয়ারের কৌটাটা দেয়ালের পাশে রেখে অনুগ্রহকারী সেপাইটির দিকে না দেখেই তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। ইচ্ছা সত্ত্বেও তার মধ্যে এতটুকু সাহস হল না যে, ঘাড় ফিরিয়ে দয়াবান সৈনিকটির চেহারা একনজর দেখে নেয়।

অন্যায়ের শাস্তি

অতঃপর সার্ব সেপাইরা আটক মুসলমানদের দু'জন দু'জন করে উপরে নিয়ে যেতে লাগল। যারা নিচে ছিলো তারা উপরে পৌঁছা লোকদের করুণ আর্তনাদ, চিৎকার ধ্বনি ও বেদম মারপিট ও গালি–গালাজের শব্দ শুনছিল। মারাত্মক ধরনের নির্যাতন–নিপীড়নের আওয়াজে বার বার তাদের শরীর শিউরে উঠছিল। এবার জিমু ও তার আরেক সাথীর পালা এলো। তারা ভয় ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উপরের কামরায় গেল।

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পা রাখতেই একজন হ্যাংলা পাতলা ও বড় দাড়িওয়ালা যুবককে দেখতে পেল। যুবকটির আনুমানিক এক গজ দূরে বেশ কিছু সংখ্যক আর্মি দাঁড়ানো। তাদের কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল ঝুলছে। প্রত্যেকের হাতে কাঠ, রাবার বা প্লাষ্টিকের তৈরী ডাণ্ডা। তবে কেউই সেগুলো জিমুর উপর ব্যবহার করল না।

জিমু ও তার সঙ্গী কেন্টিনের দিকে যাওয়ার দরজার কাছে পৌঁছলে একজন সৈনিক জিমুকে সেখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বলল এবং সে জিমুর সাথীকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। সে কক্ষের দরজাটি আধা খোলা ছিল। জিমু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরের সবকিছুই ভালমত দেখতে পাচ্ছিল। ভিতরে নিয়েই তার সাথীকে সেখানে উপস্থিত সার্ব সেনারা

কিল, ঘুষি, লাথি এবং লাঠি দিয়ে যে যেমনভাবে পারল প্রহার করল। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করল—"আমরা তোমাদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে হেফাযত করছি, আর তোমরা তোমাদের বাড়ীর ছাদে ব্যাংকার বানিয়ে আমাদের উপর ফায়ারিং করছো?"

এ ধরনের অবাস্তব ও মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁরা তার উপর নির্যাতন ও জুলুমের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। প্রহারে জর্জরিত লোকটি কতো ধরনের কসম ও দোহাই দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু না, তার কাকুতি মিনতি ও কসমের প্রতি কেউ কর্ণপাত করল না। বরং রীতিমত নির্দয়ভাবে লাঠি ডাণ্ডা দিয়ে প্রচণ্ড রকম প্রহার করতে লাগল। তার ডান চোখেও একটা আঘাত লাগল। চোখ থেকে রক্তের একটা চিকন স্রোতধারা তৈরী হয়ে অবিরাম গতিতে খুন গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে আধমরা হয়ে গেল। সিপাহীরা ধাক্কা দিয়ে তাকে দরজার বাইরে ছুঁড়ে মারল, যেখানে জিমু পেরেশান ও নির্বাক হয়ে দাঁড়ানো ছিল। সিঁড়ির কাছেই দণ্ডায়মান উর্দি পরিহিত কয়েকজন লোক এই হতভাগা মুসলমানটিকে ধরে আরো প্রহার করতে লাগল এবং তাকে ধাক্কা দিতে দিতে সিঁড়ির নিচে নিয়ে গেল।

হিংস্র হায়েনার খপ্পরে

এখন জিমুর পালা। একজন সেপাই তাকে ভিতরে প্রবেশ করার জন্য ইঙ্গিত করল। সে ভিতরে দু–তিন কদম এগুতেই ক্রোধে ক্রোধে আগুন সার্ব বর্বরদের চেহারায় হিংস্রতা ও কঠোরতার ছাপ ফুটে উঠলো। জিমু ভাবল, এখন আর রক্ষা নেই। মানসিকভাবেও সম্ভাব্য নির্যাতন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু তার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন তাকে অত্যন্ত নরম ও কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ "জিমু! দেখো, আমাদেরকে হামলার ব্যাপারে সাফ সাফ বলে দাও, যখন মুসলমানরা আক্রমণ করে তখন তুমি কোথায় ছিলে?"

জিমু চিন্তায় পড়ে গেল। সে এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? যদি বলে, এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না, সে হামলার ব্যাপারে শুধু রেডিও থেকে প্রচারিত খবরই শুনেছে, তার চেয়ে বেশী কিছুই জানে না, তাহলে তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সে এটাও বুঝলো, তার কাছে ভাববার জন্য বেশী সময় নেই। তাই থেমে থেমে বলতে শুরু করল ঃ "যখন থেকে

হেবেরীনে গুলাগুলি হচ্ছিল তখন থেকে আমি পুরো সময়টাই নিজগৃহে নিজ পরিবারের সাথে কাটিয়েছি। এখানে গ্রেফতার করে আনার পূর্বে আমি বিশেষ জরুরী কমিটি কর্তৃক রেডিও থেকে সম্প্রচারিত নির্দেশের উপর যথাযথ আমল করেছি।”

জিমু এসব কথা এক নিঃশ্বাসেই বলে ফেলল। তারপর সে নিজের মস্তকটি কাঁধের দিকে অবনত করে তাঁদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় রইল। তার শরীরটা একটা অদৃশ্য ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপছিল। এমন ভয় ইতিপূর্বে জীবনে সে কখ্খনো অনুভব করেনি।

“জিমু সত্য কথাই বলছে, আমি ওকে ভাল করে চিনি। ও রেডিও অফিসে চাকুরী করে।”

জিমুর পিছন দিক থেকে কেউ বলে উঠল। তারপরেই প্রাণসঞ্চারকারী ও অভয়দানকারী কণ্ঠের মালিক তার সামনে এসে হাজির হল। তার মুখটি অচেনাই লাগল। তবে তার উর্দিতে যে চিহ্ন ও পদবী ব্যাজ লাগানো ছিল তাতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে, সে এখানকার সবচেয়ে বড় অফিসার ও হর্তাকর্তা।

“জিমু! তুমি কি অবগত আছো, তোমার পাড়া–প্রতিবেশীদের মধ্যে কার কার কাছে অস্ত্র রয়েছে?”

“বিশ্বাস করুন স্যার, আমি এ ধরনের কাউকেই জানি না। আমি কখনো এ কথাটিও জানতে চেষ্টা করিনি যে, আমার পাড়া–প্রতিবেশীর কার কাছে কি রয়েছে এবং তারা কি করে, বরং সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাদের অধিকাংশকে ভাল করে চিনিও না।” জিমু সরাসরি সে অফিসারটিকে লক্ষ্য করে জবাব দিল। সে ভালভাবেই অনুভব করতে পারছিল, তার এই বিবৃতি তার সম্ভাব্য পেরেশানী ও দুর্দশা লাঘব করতে পারবে না।

“ওকে নিয়ে যাও” অফিসারটি জানালার কাছে রাখা টেবিলটার উপর বসে একটা ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে নির্দেশ দিল।

বাইরে দাঁড়ানো সশস্ত্র গুণ্ডাদের হাতে যদিও মোটা মোটা শক্ত ডাণ্ডা ছিল, তবুও তারা জিমুর উপর হাত উত্তোলন করল না। মনে হল যেন কোন অদৃশ্য ইশারা তাদেরকে এমন করতে বারণ করেছে।

জিমু সে সময় একেবারেই অনুমান করতে পারেনি যে, সে সার্বদের তৈরী জাহান্নামের প্রথম স্তরে প্রবেশ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জাহান্নামের দ্বিতীয় গহ্বর

সে দিনের তৃতীয় প্রহরের শেষ ভাগ। সকল কয়েদীকে একটি বাসে ভরা হল। বাসটির লুকিং গ্লাসের ষ্ট্যাণ্ডের সাথে খৃষ্টবাদী সার্বদের একটি বড় পতাকা বাঁধা রয়েছে। বাতাসে পতাকাটি আন্দোলিত হচ্ছে এবং পত পত করে উড়ছে। সেনাবাহিনীর তিনজন জোয়ান সামনের সিটে কয়েদীদের দিকে মুখ করে বসে পড়ল। বাসটি ষ্টার্ট দিয়ে রওয়ানা হল। আণ্ডারপাস অতিক্রম করে প্রথমে ডানে অতঃপর বামে মোড় নিয়ে কাগজের কারখানার দিকে চলতে লাগল। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে সড়কের উপর দৌড়তে লাগল। সড়কটি সায়না নদের পাশ দিয়ে দূরে চলে গেছে।

জিমু পুরার্তন শহরের দিকে তাকালো। সবদিকেই আগুন আর আগুন। কৃষ্ণবর্ণের গাঢ় ধোঁয়া মেঘমালায় রূপান্তরিত হয়ে আকাশের দিকে দৌড়াচ্ছে। পুরাতন শহরটিকে সায়না ও বেরেক নদী একটি উপদ্বীপের ন্যায় পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এ সময় শহরটিকে একটি জ্বলন্ত মশালের মত দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। সবদিকেই আগুনের খেলা চলছে।

সামনের ছিটে বসা একজন সার্ব সৈন্য চিৎকার করে বলল ঃ "তোমাদের সবার বাড়ীও এভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।"

জিমু একটা কাপুরুষোচিত নিরবতা পালন করে রাগে দাঁতে দাঁত পিষে কট মট করতে লাগল। নৈরাশ্যে একটা শীতল উহ্ শব্দ তার হৃদয় চিরে বেরিয়ে এলো। অপমানের অসহ্য জ্বালা তার অস্তিত্বকে পদদলিত করতে লাগল। তার মনে হলো, এ পুরাতন নগরীটির ধ্বংসের এ করুণ দৃশ্য সে জীবনে কখনো এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারবে না। শহরটি তার জীবনের অনেক সুন্দর স্বপ্ন ও স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বেরেক নদীর তীরে বসেই সে জীবনে সর্বপ্রথম প্রেম ও ভালবাসার স্বাদ গ্রহণ করেছিল। এখানেই সে সর্বপ্রথম সিগারেট পান করেছিল। এই নদীর তীরে গরমের মৌসুমে ওপের ইয়ার থিয়েটারের সেই নৃত্যের কথাও তার মনে থাকবে যা দেখার জন্য শুধু প্রেজডোরের অধিবাসীরাই নয়, বরং দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে সমবেত হতো। আবার রাতের বেলা

সায়না নদে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতার খেলার মজা....। একটার পর একটা স্মৃতি জিমুর মানসপটে ভেসে উঠছিল। তার গলাটা শুকিয়ে কাঠ। মনের ব্যথায় হৃদয় চিরে চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরছে। অসহায়তা ও নিরাশায় শরীরটা তার অবসন্ন হয়ে পড়ল। সে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, সেটা তো থানায় অবস্থানকালেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

দুঃখ–যাতনায় পিষ্ট হতাশাচ্ছন্ন এসব কয়েদীকে নিয়ে বাসটি এক অজানা পথের পানে অগ্রসর হচ্ছে। বন্দীদের কেউ জানে না তাদের এ যাত্রার পরিসমাপ্তি কোথায় ঘটবে। সামনের সিটে বসা সার্ব সৈন্যরা মাঝে মাঝে পথচারী জাতি ভাইদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে তিন আঙ্গুল উচিয়ে সালাম করছে। গুণ গুণ করে মনের আনন্দে অস্পষ্ট ভাষায় গান গাচ্ছে। তার মর্মার্থ বন্দীদের কেউ বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না।

এক সময় বাসটি একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। গ্রামের অনেকগুলো উচ্ছৃঙ্খল যুবক, যারা সার্বিয়ান সেনাবাহিনীর উর্দি ও কাঁদা মাখানো বুট পরিহিত অবস্থায় ছিলো, তারা বাসের ড্রাইভারকে দূর থেকে ইশারায় থামতে বললো। বাসটি তাদের কাছে এসে থামলে তারা বাসে উঠল। সামনের সিটে বসা রক্ষীসেনাদের নিকট দাবী জানালো, এসব মুসলমান বন্দীদেরকে তাদের হাতে অর্পণ করার জন্য।

এসব কথা শুনে কয়েদীদের অন্তর আতঙ্কে দুরু দুরু করতে লাগল। ইয়া আল্লাহ! এ আবার কোন্ মুসীবত!

একজন গোঁয়ার যুবক নিজের ডান হাতটি ছুরির মত বাঁকিয়ে গলার সাথে স্পর্শ করে দেখিয়ে বলল, "এরা তো সেই বিশ্বাসঘাতক যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের পক্ষপাতিত্ব করেছিল। এদেরকে যত দ্রুত সম্ভব, খতম করে দেয়াই সমীচীন।"

চরম ঘৃণার কারণে তার বিকৃত মুখটি অত্যন্ত ভয়ানক দেখাচ্ছিল। সে ও তার মাতাল সঙ্গীরা এসব নিরাপরাধ মুসলিম বন্দীদেরকে কোন প্রকার মামলা মুকাদ্দমা ও আইনানুগ ব্যবস্থা ছাড়াই শেষ করে দিতে চায়। অথচ তাদের কেউই কয়েদীদের কাউকে চিনেও না এবং তাদের সম্পর্কে জানেও না। রক্ষীদের একজন তাদেরকে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কি

যেন বলল। তারপর ড্রাইভারকে বাস ছাড়তে নির্দেশ দিল। ওরা নেমে পড়লে ড্রাইভার তার কথামত বাস ছেড়ে দিল।

জিমু বাসের জানালা দিয়ে কোযারা পর্বতের কোলে বিছানো সুবিস্তৃত শস্য ক্ষেতের দিকে তাকালো। দেখতে পেল, যতই দৃষ্টি যায় শুধু শস্য আর শস্য। ফসলে ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে জমিগুলো। কিন্তু কারা কাটবে এ ফসল? জিমু ভাবতে লাগল। যারা এসব ভূমির মালিক। যারা এসব চাষাবাদ করেছে, সার্বরা তো তাদেরকে খতম করে দিচ্ছে। রাখালহীন গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া ও দুম্বার ছোট ছোট পাল ক্ষেতে বিচরণ করছে। এসব গবাদিপশুর আশেপাশে অগ্নিদগ্ধ গৃহ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা, কালো বর্ণের গাঢ় ধোঁয়া আদিগন্ত ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ঘরের আঙিনায় টানানো রশিতে ধোলাই করা কাপড়গুলো ঝুলছে, কিন্তু কোথাও কোন জন-মানবের চিহ্ন নেই। সবদিকেই মৃত্যুর বিভীষিকা বিরাজ করছে।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা সরল সহজ মুসলমানরা আঁচ করতে পারেনি। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক আইভো এগুরিক-এর কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছেন ঃ "বলকান অঞ্চলে যে কোন সময় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।"

এ পাহাড়ী অঞ্চলের ইতিহাস রক্তে পিচ্ছল ইতিহাস। সব সময় একের পর এক যুদ্ধ, হত্যাযজ্ঞ লেগেই আছে। আর বর্তমানে তো এ অঞ্চলে নৃশংস হত্যালীলা সংঘটিত হচ্ছে। কোযারা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা যেন এসব মারাত্মক পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দুর্যোগের তাণ্ডবলীলা তাদের উপরও আঘাত হানে। তারপর আবার তারা নতুন করে নিজেদের অবস্থা সামলে নেয়। এ ব্যাপারে তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের জানগুলো শক্ত, দুর্দম। এ বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এ অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ী, পাহাড়-পর্বত ও নীল আকাশকে যতটুকু ভালবাসে, অন্য কোন জাতি তা পারবে না।

পূর্বেও বসনিয়ার সীমান্তবর্তী এ অঞ্চলটির অধিবাসীরা তাদের অঞ্চলকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছে।

মুসলিম–খৃষ্টান ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক মনে আত্মোৎসর্গ করেছে। যুদ্ধের ময়দানে তারা অনেক বীরত্বও দেখিয়েছে। কিন্তু এখন .... কে জানে, কি হতে যাচ্ছে....? এ আবার কেমন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল! লোকেরা রণ উন্মাদনায় নিজেদের ক্ষেত–খামার থেকে মুখ ফিরিয়ে, নিজেদের বিয়ারের বোতল ছুঁড়ে মেরে, কামান ও আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। একে অপরের প্রতি গোলা বর্ষণ করছে, একে অন্যকে হত্যা করছে। অথচ চিন্তাও করছে না, কাদেরকে লক্ষ্য করে তারা গুলি চালাচ্ছে, কাদেরকে খতম করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, এলোপাথারী, অবিরাম গতিতে ফায়ারিং করছে।

এই তো কিছুদিন পূর্বের ঘটনা। এসব লোকেরাই তো তখন সম্মিলিতভাবে আত্মবিসর্জন দিয়েছিল। একটা বড় মঙ্গল হাসিলের জন্য উপবাস করেছে। কিন্তু এখন তারা সে কথা ভুলতে বসেছে, সব কিছু জলাঞ্জলী দিয়ে 'জাতীয় ফোজ' নামে সাম্প্রদায়িক, উগ্র ও কট্টরপন্থী লোকদেরকে অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করছে। একসময় এরা সম্মিলিত সেনাবাহিনীতে ছিল, সেখানে কোন জাতীয় ভেদাভেদ ছিল না, কে মুসলমান, কে সার্ব, আর কে ক্রোট, এ ধরনের কোন বিভক্তি ছিল না।

তারকাচিহ্ন বিশিষ্ট যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় ফৌজ। এরা এখন বসনিয়ান মুসলমানদের উপর হামলা করছে। অথচ এ সেনাবাহিনী ছিল সম্মিলিত। এ বাহিনী সম্মিলিত শত্রুর মোকাবেলার জন্য গঠন করা হয়েছিল। এরা এখন নিজেদের পাড়া–প্রতিবেশী ও মহল্লার লোকদেরকে শত্রু ভেবে তাদের নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছে। এই তো কাল পর্যন্ত বসনিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে অত্যন্ত সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় ছিল। তারা প্রেম–ভালবাসা, স্নেহ–মমতা ও সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা প্রদর্শন করে এক সাথেই বসবাস করে আসছিল। চা দোকানের আড্ডায়, কফি হাউসে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ও অন্তেষ্টিক্রিয়ায় সব সম্প্রদায়ের লোকেরাই শরীক হতো। একে অপরের ঘরে আসা–যাওয়া করতো। পরস্পরে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হত। কিন্তু, এখন..... সমস্ত রূপটাই পাল্টে গেছে।

পুরাতন ও ঐতিহাসিক সঙ্গীতের প্রথম পংক্তি ঃ "যেখানে গণ ফৌজ

পদার্পণ করে” জিমু তার পরবর্তী পংক্তি এভাবে বানিয়ে যোগ করলো “সেখানে আর কখনো সবুজ ঘাস অঙ্কুরিত হয় না।”

বর্তমান অবস্থাটা দেখে মুসলমানগণ খুবই হতবাক, হতচকিত। বসনিয়ার পুরো অস্তিত্বটাই ক্ষতবিক্ষত ও নড়বড়ে হয়ে গেছে। যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা বসনিয়া কম্পমান। কিন্তু ভূমিকম্প তো এসে আবার চলে যায়, কিন্তু এ কম্পনের তাণ্ডবলীলার যেন শেষ নেই। ক্রমশই তা মারাত্মক রূপ ধারণ করছে।

জিমুর মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উঁকি মারছে। কয়েদীদের এ বাস সফর আবার কোন্ বড় দুর্যোগ বয়ে আনে? যেসব লোকের উপর সার্বরা নির্যাতন চালাচ্ছে, তাদের কি অপরাধ? তাদের কি কসুর যে, তাদেরকে শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে? আতঙ্কগ্রস্ত এসব নিরপরাধ লোকদেরকে নিয়ে বাসটি এক অজানা পথে চলছে। সার্বিয়ার নতুন সরকারের কাছে এদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোন অভিযোগ নেই। তবে মাথা ব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, বসনিয়া সার্বদের সাথে সাথে মুসলমান ও ক্রোটদেরও মাতৃভূমি। এদেশে মুসলমান ও ক্রোটদের অস্তিত্বই সার্বদের দৃষ্টিতে বড় অপরাধ। সার্বরা মসজিদ ও ক্রোটদের গীর্জা ধ্বংস করার সাথে সাথে মুসলমান ও ক্রোটদের গোরস্থানগুলোও মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে।

এসব অপরাধ অনেক পুরাতন বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ, যা বসনিয়ার জনগণ একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এ অন্যায় ঘৃণা তাদের মনের কোণে দীর্ঘদিন থেকে প্রতিপালিত হচ্ছিল। তাদের রক্তলোভী চোখ দিয়েও তা টপকে পড়ত। প্রকাশ্যে তারা সেটা ব্যক্ত করতো না। তাদের অনেকেই নিরব নিশ্চুপ। কিন্তু তাদের দীর্ঘদিনের এ নিরবতা একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস ছিল। এখন সে ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

বাসটি আমারেস্কার লৌহখনির গেটের বাইরে এসে থামল। খনিটি আমারেস্কা গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। একদিকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে আনা মুসলমান ও ক্রোটদের গবাদি পশুগুলো কিছুটা সমতল ময়দানে চরে বেড়াচ্ছে এবং ঘাস খাচ্ছে, অন্যদিকে খনি উত্তোলনের এলাকা। কিছুদিন পূর্বেও এ এলাকাটি শ্রমিকে পূর্ণ ছিলো। কিন্তু আজ বিরান, জনশূন্য। টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। দূর–দূরান্ত বিস্তৃত অসহ্য রোদ

দেখা যাচ্ছে। খনি এলাকার মাঝে দু'টি বড় ইমারত। এ দু'টি ইমারতের মাঝে বিস্তৃত ও আকর্ষণীয় জমিন, সেখানে দুটি ছোট ঘরও আছে।

এ সকল বন্দীর একমাত্র অপরাধ, তারা মুসলমান কিংবা ক্রোট। বন্দীদের মধ্যে সবধরনের লোকই আছে। বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিস, কৃষক, কারিগর, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ওলামা সম্প্রদায়। এমনকি কয়েদীদের মধ্যে প্রেজডোরের মহামান্য মেয়র মুহাম্মদ কাহাজেকও আছেন। এ এক বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

প্রথম চারদিন তাদেরকে কিছুই খেতে দেয়া হল না। ইমারতের খালি ফ্লোরে তাদেরকে ঘুমাতে দেয়া হলো। জিমু হাডবোর্ডের তৈরী একটি বড় বাক্স পেল। সেটা খুলে পাকা জমিনে বিছিয়ে সে আর তার ছেলে এরি ঘুমালো। সবদিকেই আবদ্ধ থাকার কারণে কামরার ভিতরে বাতাস ঢুকতে পারছে না। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ।

পঞ্চম দিনে খাবারের জন্য লাইন ধরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্যের বাইরে চলে গেছে। কয়েদীরা দরজার কাছে জমা হল। সেখান থেকে প্রতি ত্রিশ জনের একটি করে গ্রুপ বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এরি তৃতীয় গ্রুপে এবং জিমু দশম গ্রুপে ছিল। জিমুর গ্রুপের পালা এলে বলা হল, খানা ফুরিয়ে গেছে। ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে করতে তারা আবার নিজ নিজ স্থানে ফিরে এলো। এরপর থেকে দৈনিক একবেলা খাবার দেয়া হত। সাধারণতঃ বাধাকপির দু-তিনটি পাতা, বুটের ডাল, তার উপর সামান্য তৈলাক্ত গরম পানি ভাসতো। সাথে এক টকুরা রুটি দেয়া হত, মনে হত, রুটিগুলো সাবানের ফেনা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। খাবারের জন্য মাত্র দু'মিনিট সময় দেওয়া হত। কেন্টিনে আসা যাওয়ার সময় বিনা কারণে মারধর করা হত। কেন্টিনে যাওয়ার জন্য একটি পথ অতিক্রম করতে হত, যা সামনে গিয়ে দু'টি গলিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি গলি ডান দিকে সিঁড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। সিঁড়ির উপরে একটি বড় রুম। সেখানে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হত। আরেকটি গলি বাম দিক হয়ে কেন্টিন পর্যন্ত চলে গেছে। পাহারারত সিপাহীরা যাতায়াতের এ পথটিকে পিচ্ছল বানানোর জন্য পানি ও সাবান জাতীয় পিচ্ছল দ্রব্য ছিটিয়ে

রাখতো। যখনই কোন কয়েদী স্লিপ খেয়ে পড়ে যেত,তার আর রক্ষা ছিল না। সার্ব নরপশুরা তার উপর ক্ষুধার্ত হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ত। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে বেদম প্রহার করতে করতে ডানদিকের সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরের কামরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যেতো। সেখানে সে আরো অমানবিক নির্যাতনের সম্মুখীন হত। তদন্তকারী দল প্রেজডোরের পুলিস অফিসার নিয়ে গঠিত। তাদের উপস্থিতিতেই কারারক্ষীরা আর্মি বুট, পিতলের গুর্জা, লোহার ডাণ্ডা ও নির্যাতনের বিভিন্ন যন্ত্র দিয়ে কয়েদীদেরকে নির্মমভাবে পিটিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বের করে ফেলত। এ নির্যাতন ও নিপীড়নের উদ্দেশ্য, জোরপূর্বক তাদের নিকট হতে না করা অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করা। সাধারণতঃ এ তিনটি তথাকথিত অপরাধের স্বীকারোক্তি নেয়া হত ঃ

১. প্রেজডোর আক্রমণে সে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে।

২. তার কাছে গোপন অস্ত্র রয়েছে।

৩. তার কাছে সেসব সার্বদের তালিকা পাওয়া গেছে যাদেরকে মুসলমানরা খতম করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

এসব বানোয়াট অভিযোগ প্রমাণের জন্য এবং কয়েদীদের থেকে স্বীকারোক্তিমূলক দস্তখত নেয়ার জন্য তাদের প্রতি সর্বপ্রকার অমানবিক নির্যাতন চালানো হতো।

এসব নাটকের মূল উদ্দেশ্য, কয়েদীদের মনোবল ভেঙে দেয়া এবং আশা-আকাংখার সামান্য আলোক রশ্মিকেও চিরতরে নিভিয়ে দেয়া।

মিথ্যা অপরাধের স্বীকারোক্তি

কোযারকের একজন যুবক ডাক্তার মনছুর কাছুরান। তাকে এরূপ একটি বিবৃতির উপর দস্তখত করার জন্যে চাপ প্রয়োগ করা হল, যাতে লেখা ছিল, "সে সরকারী হাসপাতাল থেকে ঔষধ চুরি করে এসব ঔষধ তার গৃহের ভূগর্ভস্থ কক্ষে লুকিয়ে রেখেছে এবং পরে এগুলো গোপনে মুসলমানদের কাছে পৌছে দিয়েছে।"

এ অভিযোগটি পাঠ করে ডাক্তার মনছুর একেবারেই হতবাক হয়ে গেলেন। সার্ব তদন্তকারীদেরকে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, এ

অভিযোগের সাথে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, আমি আজ পর্যন্ত নিজের ক্লিনিক থেকেও একটি ঔষধ এদিক-সেদিক করিনি। সার্বদের আশ্বস্ত করার জন্য সে অনেক কসম খেল। কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না। নিজের মৃত্যুর এ পরোয়ানাটির উপর দস্তখত করার পর মনছুরের মনে পড়ল, তার গৃহে তো কোন ভূগর্ভস্থ রুমও নেই। তদন্তকারী অফিসাররা তার এ ব্যাখ্যা হেসে উড়িয়ে দিল এবং রক্ষীদেরকে তাকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল। আমারেস্কা ক্যাম্পে অনেক ডাক্তারকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। তাদের মাঝে একমাত্র ডাক্তার মনছুরই এ মৃত্যুপুরী থেকে বেঁচে যেতে সক্ষম হলো। আর সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো।

অন্ধের গুলি

ঈছা মুহাম্মাদ উজেক প্রেজডোরের একজন সম্মানিত নাগরিক। তার উপর অভিযোগ আনা হল, সে গোপনে সার্বদের উপর ফায়ারিং করেছে। অথচ অভিযোগ উত্থাপনকারীরা এ কথাটি ভেবেও দেখল না যে, ঈছা মুহাম্মাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় শেষ হওয়ার পথে। কোন সাহায্য ছাড়া সে একা চলতেও পারে না। তার এ দুর্বলতা ও বার্ধক্যের কথা শহরের প্রতিটি লোক জানে।

জিমুকে যে কামরায় রাখা হয়েছে, সেখানে প্রায় ছয়শ' কয়েদীকে আটকে রাখা হয়েছে। এ কক্ষটি খনিশ্রমিকদের কাপড় রাখা ও কাপড় বদলী করার জন্য ব্যবহৃত হত।

বালক ও বৃদ্ধ

এ ছয়শ' কয়েদীর মাঝে চৌদ্দ বছরের এক বালকও ছিল। তাকে নিকটবর্তী গ্রাম বাসকানী থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। তার পরিবারের সবাইকে সার্বরা হত্যা করেছে।

কয়েদীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বয়স্ক ছিলেন প্রেজডোরের নিকটবর্তী ছারজেরেক অঞ্চল থেকে গ্রেফতারকৃত চুয়াত্তর বৎসর বয়সের গ্রেলেজ। সবাই তাকে গ্রেলেজ চাচা বলে ডাকত।

ওয়াদা খেলাপী

এ ছয়শ' কয়েদীর কক্ষের পরেই একটি দেয়াল। তার পরে নব্বই বর্গফুট আয়তনের একটি গ্যারেজ। সেই গ্যারেজে মুসলিম অধ্যুষিত 'কিসসে কোযারক' এলাকার ১৬০ জন বন্দীকে আটকে রাখা হয়েছে। প্রেজডোর থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে এ এলাকাটি অবস্থিত। কিসসে কোযারকের মুসলমানগণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত সার্বদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছেন। এটা সার্বদের দৃষ্টিতে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ একশ' ষাট জন মুসলমানকে কোযারা পাহাড়ের বেংকোভিক এলাকার আশ–পাশ থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরা সবাই সশস্ত্র ছিল। কিন্তু তাদের আর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না। তাই অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তবে অস্ত্র সমর্পণের বড় কারণ ছিল, রেডিওর একটি ঘোষণা। তাতে বলা হয়েছিল, যদি তারা অস্ত্র সমর্পণ করে, তাহলে তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। মূলতঃ এ ঘোষণার কারণেই তারা অস্ত্র সমর্পণ করে।

সিমেন্টের খালি ফ্লোরে থাকা, বিছানা–বালিশ ছাড়া ঘুমানো, ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরিধান করা, রাতের অন্ধকারে বন্দীদের বুক ফাটা আর্তনাদ আর সার্বদের বেদম প্রহারের আওয়াজ শ্রবণ করা, এসবই ছিল সার্বদের তথাকথিত নিরাপত্তা বিধান!

বর্তমানে যে মৌসুম চলছে তাতে দিনে প্রচণ্ড গরম পড়ে আর রাতে বাতাস চলাচল বন্ধ থাকে। উপরন্তু কয়েদীদের কামরাগুলো সবদিক দিয়ে বন্ধ, ফলে শ্বাস–প্রশ্বাস গ্রহণ করতেও খুবই কষ্ট হতো।

এক বুক তৃষ্ণা

ক্যাম্পে কয়েদীদের জন্য পিপাসা নিবারণের কোন বন্দোবস্ত নেই। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় কাতর কয়েদীরা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কারারক্ষীদের কাছে কাকুতি মিনতি করে পানি চাইলে তারা ভাঙ্গা জানালা দিয়ে কখনো কখনো পানিভরা প্লাষ্টিকের বোতল ছুঁড়ে মারতো। অন্যের আগে নিজে পানি পান করার আশায় তৃষ্ণায় কাতর কয়েদীরা সেই বোতলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। এবং পানির বোতল নিয়ে পরস্পরে কাড়াকাড়ি

করতো। ফলে যতটুকু পানি তাদের শুষ্ক গলায় পৌছত, তার চেয়েও বেশী মাটিতে পড়তো। অনেকে আবার সেই খালি বোতলটা উপুড় করে নিজের মুখ বরাবর এনে জোরে জোরে ঝাকাতো। হয়তঃ এভাবে কিছু পানির ফোটা তার হিস্সায় আসবে। পানির ব্যাপারটি কয়েদীদের পক্ষে জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

কারারক্ষীরা বিদ্রূপাত্মক হেসে কয়েদীদেরকে আরো পানি দেয়ার জন্য এ শর্তারোপ করতো যে, তারা যদি সার্ব জাতীয়তাবাদীদের অতি প্রিয় বিশেষ সঙ্গীতটি (যাকে চিটানিক সঙ্গীত বলে) গেয়ে তাদেরকে শুনায় তাহলে তাদেরকে আরো পানি দেয়া হবে। কয়েদীরা তখন সেই জঘন্য সঙ্গীতটিই গাইতে বাধ্য হত।

সঙ্গীতটির অর্থ—

"তোমরা বলছো, সার্বিয়া ছোট
তোমরা মিথ্যা বকছো,
সার্বিয়া ছোট নয়,
তিনবার সার্বিয়ার জনগণ যুদ্ধের জন্য
পাটোলা থেকে রাওনা পর্যন্ত গিয়েছিল
আর যেখানেই তোমরা তাকাবে,
সেখানেই বিশ্বস্ত ওফাদার সেনাদের পাবে
আমাদের প্রিয় জেনারেল দ্রাজার বিশ্বস্ত সেনা .....।
ও আলীজাহ্ ...... ! ও আলীজাহ্..... !
যখন আমি তোমার মুখোমুখী হব
তখন সবার পূর্বে আমি তোমাকেই কতল করবো
আমি স্বয়ং তোমার গর্দান কাটবো
তোমা থেকে বিশ্বকে এভাবে মুক্তি দেবো
যেভাবে কোন এক যমানায়
মাইলোস তুর্কীর সুলতান মুরাদকে খতম করেছিল
দেখো, তুর্কীরা মসজিদে সেজদা করছে, দেখো....."
(উপহাস করে)

"আরো জোরে! পানি পেতে চাইলে আরো জোরে আরো উচ্চকণ্ঠে গাও" রক্ষীরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতো। তখন এসব হতভাগা কয়েদী আরো জোরে গাইতে বাধ্য হত।

একদা একজন পাহারাদার কয়েদীদের অসহায়ত্বকে উপভোগ করার জন্য বলল ঃ "যত জোরে গাইবে তত বেশী পানি পাবে।" তখন বদনসীব বন্দীরা ঘন্টাভরে এ জঘন্য ও কষ্টদায়ক সঙ্গীতটি খুব জোরে জোরে গাইতে থাকে। তাদের আশা হয়তঃ এ প্রচণ্ড গরমে অসহ্য তৃষ্ণা থেকে মুক্তির কোন পন্থা বের হয়ে আসবে।

হায় মানবতা !

প্রস্রাব–পায়খানার প্রয়োজন মিটানোর জন্য কয়েদীরা একটি প্লাষ্টিকের টুকরী ব্যবহার করতো। সেই টুকরীটি কর্তৃপক্ষ গ্যারেজের টিনের দরজার নিকটে রেখে দিয়েছিল। যখন কেউ পেশাব করতে চাইতো তখন কয়েদীরা লাইন ধরে হাত পেতে সেই ব্যক্তির চারপাশে দাঁড়িয়ে যেতো। হয়ত এভাবে কিছু পেশাব পাবে যা দিয়ে সে তার শুষ্ক ওষ্ঠগুলো ভিজাবে। এ অমানবিক পন্থায় তারা পেশাব পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতে হত। কারণ, শোয়া কিংবা বসার কোন অবকাশ ছিল না। যে দেয়ালের কাছে থাকত, সে মাথাকে উপর উঠিয়ে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমাতো।

একবার কোন কারণ ছাড়াই নেশায় মাতাল একজন কারারক্ষী গ্যারেজের দরজা লক্ষ্য করে হালকা মেশিন গান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করল। জিমু ও তার সঙ্গীরা কয়েদীদের আর্তনাদ ও বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার ধ্বনি শুনল। কিছুক্ষণ পরেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, 'চারজন কয়েদী গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে এবং একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে।" আহতদেরকে হাসপাতালে কিংবা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হল কিন্তু পরে তাদেরকে আর দেখা যায়নি। হয়তঃ তারা চিরদিনের জন্য এ দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছে।

একবার জিমু তাদের কামরার দরজা খোলা থাকার কারণে গ্যারেজে

আটক দুর্ভাগা কয়েদীদেরকে দেখার অবকাশ পেল। দেখল, দশজন কয়েদীকে পৃথক করে একটি গ্রুপ বানিয়ে আনুমানিক চল্লিশ গজ দূরে নিয়ে গেল। তাদের নির্দেশ দেয়া হল, তারা যেন কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে যায়। কয়েদীরা নির্দেশ পালন করে নিজ নিজ ছেঁড়া ফাটা কাপড় খুলে এক জায়গায় স্তূপ করতে লাগল। পাহারাদারদের দেখে মনে হচ্ছে, তারা সবাই নেশাগ্রস্ত। তারাও নির্দয়ভাবে বন্দীদের কাপড় টেনে খুলে তাদের উলঙ্গ করতে লাগল। কয়েদীরা লজ্জায় হাত দিয়ে মুখ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো। কারারক্ষীরা তাদের এ করুণ অবস্থাকে পরম তৃপ্তির সাথে উপভোগ করতে লাগলো।

পশুর চেয়েও অধম

কিন্তু একজন বলিষ্ঠদেহী কয়েদী, যিনি প্রায় ছয় ফুট লম্বা, কাপড় খুলতে অস্বীকৃতি জানাল। তার লম্বা দাড়ি থেকে বুঝা যাচ্ছে, সে দীর্ঘদিন ধরে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। মস্তক অবনত করে সে মাটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। একজন সৈনিক বন্দুকের নল তার গর্দানের উপর রেখে তাকে কিছু বলল। কিন্তু তাতেও তার কোন ভাবান্তর ঘটলো না, সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সে তার ইচ্ছায় অনড় ও অবিচল রইলো।

"এ হতভাগা তো পোড়া কপাল। এখন তো একে সার্বরা আস্ত রাখবে না।" জিমুর পেছন থেকে একজন লোক ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল।

জিমু পেছন ফিরে লোকটার দিকে তাকালো না এবং তার এই কথায় কোন ধরনের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করল না, বরং সে এক দৃষ্টে দরজার উপরের অংশ দিয়ে কয়েদী ও সার্ব রক্ষীদেরকে দেখতে লাগলো। সার্ব রক্ষীরা এ অসীম সাহসী মুসলমান ও তার অপর নয়জন সাথীর সাথে কি ব্যবহার করে ও তাদের ভাগ্যে কি ঘটে, জিমু সেটাই গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে চাচ্ছে।

কারারক্ষী সেনাটি যখন দেখলো বন্দুকের ভয় দেখানো সত্ত্বেও সে তার নির্দেশ মানছে না, কয়েদী তার নিজ ইচ্ছায় অটল। তখন সে বন্দুকটি উপর দিক করে কয়েকটা ফাঁকা গুলি ছুড়ল। কিন্তু এতে শুধু এতটুকু ফায়দা হ'ল যে, কাছেই একটি বৃক্ষে বসা কতগুলো পাখি আওয়াজ

করতে করতে উড়ে গেল। কিন্তু সেই কয়েদীর দৃঢ়তার মধ্যে কোন ফাটল ধরল না। সে নিজের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইলো। এখন সৈনিকটি বন্দুকের বাট দিয়ে সেই কয়েদীর মাথায় একে পর এক প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগল। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে শেষ পর্যন্ত সে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। সার্ব হায়েনাটি এবার তার বন্দুকটা অন্য একজন সাথীর হাতে দিয়ে নিজের প্যান্টের বেল্টে লাগানো হোলিস্টার থেকে একটা চকচকে লম্বা ধারালো চাকু বের করল। সে নিচু হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়া কয়েদীটিকে চুল ধরে টেনে উঠালো। তার সাথে আরেকজন পাষণ্ড তীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে শরীক হল। তারা উভয়ে মিলে কয়েদীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগল। অন্য দু'জন গার্ড সামান্য পিছনে সরে তাদের বন্দুকগুলো অন্য নয়জন কয়েদীর দিকে তাক করে তাদের গতিবিধি সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। সেই সৈনিক দু'জন চাকু দিয়ে কয়েদীটির কাপড় কাটতে লাগল। এতে তার শরীরের চামড়াও কেটে গেলো এবং সেখান থেকে রক্তের স্রোত বয়ে চললো। তার হৃদয়বিদারক চিৎকারে সমস্ত ক্যাম্পের পরিবেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। ক্যাম্পের লোকেরা তার আর্তনাদ ও আহাজারি শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। জিমু তার জীবনে এমন বিভীষিকাময় দৃশ্য আর কখনো দেখেনি, একজন জীবিত মানুষকে কীভাবে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে! বদনসীব কয়েদীটি ভূমি থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। তার পুরো অস্তিত্বটা রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। লোকটি নিজের চিৎকার থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে, যেন একটি গরুকে জবাই না করেই তার চামড়া ছিলা হচ্ছে। একজন গার্ড কাছেই রাখা একটি পানির পাইপ উঠিয়ে কয়েদীটিকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড বেগে পানি ছেড়ে দিল। যখমের সাথে পানি মিশ্রিত হয়ে অসহ্য জ্বালায় সে ছটফট করতে লাগল এবং পানির স্রোত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তার ভারী শরীরটি একবার উঠছে, আবার আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু কোন ভাবেই সে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। লোকটি পাগলের মত চিৎকার করছে। এরপর জিমু ও সেখানে উপস্থিত লোকেরা যা দেখল, তা জীবনেও ভুলতে পারবে না। দেখল, গার্ডরা ধারালো ছুরি দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলল।

সেখানে থেকে রক্তের একটা প্রচণ্ড স্রোত বয়ে চললো। এরপর তার শরীরের বড় একটা অংশও কেটে ফেলল। এ করুণ ও ভয়ানক দৃশ্যটি কিছু সময়ের জন্য জিমুর হুঁশ ও সম্বিতকে ছিনিয়ে নিল। তারপর কি ঘটল তা সে কিছুই বুঝতে পারে নি। লোকেরা পরে তাকে বলল, কয়েদীটিকে সৈনিকরা খুবই নির্মমভাবে জবাই করে এবং তার লাশকে একটি আবর্জনার ড্রামে ফেলে তার উপর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং অবশিষ্ট নয়জন কয়েদীকে গ্যারেজে পাঠিয়ে দেয়। তদন্তের সূচনা থেকেই গ্যারেজটি ধীরে ধীরে খালি হতে থাকে। ১৬০ জন বন্দীর মধ্য হতে ১১০ জন বন্দীকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নিপীড়নে হত্যা করা হয়, আর বাকী পঞ্চাশ জন বন্দী বেঁচে থাকে। তারা এই গ্যারেজ সদৃশ মৃত্যুপুরীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। নিরব সাক্ষী।

জীবন্ত মমি

একের পর এক আতঙ্ক ও ভয়াবহতা বন্দীদের মন-মগজ ও শিরায় শিরায় ঢুকে পড়ে। ক্ষত-বিক্ষত দেহ ও মন নির্যাতন-নিপীড়ন, অপমান ও লাঞ্ছনাকে সহ্য করতে করতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এখন যেন তারা সব ধরনের অনুভূতি শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দিন যায়, রাত আসে, আবার রাতও চলে যায়, আসে দিন। এভাবে সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এ বন্দী শিবিরে আতংক ও বর্বরতার কোন পরিবর্তন নেই। নির্যাতনের অন্ধকার রজনী আরো দীর্ঘায়িত হচ্ছে। বায়ুহীন গরম রাত ও দিন। বৃষ্টিবিহীন পরিবেশ ও রাক্ষুসে ক্ষুধার কারণে কয়েদীদের শরীর শুকিয়ে কংকালসার হয়ে যাচ্ছে। শরীরের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাদের চেহারা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যে মানসিক অশান্তি, পাশবিক অত্যাচার, বর্বরতা ও লাঞ্ছনার মাঝে তারা দিন কাটাচ্ছে। এখন তারা চিকিৎসা গ্রহণের শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। এই সংকীর্ণ ও বাতাসহীন কামরায় তারা চলাফেরাও করে না। তারা তাদের শক্তিহীন শরীরের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে এই সামান্য শক্তিটুকুও বাঁচিয়ে রাখতে চায়। দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে বিছানাপত্র ছাড়া নিজেদের ছেঁড়া ফাটা জ্যাকেট ও

সুয়েটারের ভিতর জড়সড় হয়ে এমনভাবে পড়ে থাকে, অন্ধকারে মনে হয় যেন তাদের দেহকে মমি বানিয়ে রাখা হয়েছে। সবাই কথাবার্তাও একরকম ছেড়েই দিয়েছে। তাদের ধারণা, হয়তঃ এভাবে কিছুটা শক্তি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। তারা মনে মনে ভাবে, কোন না কোনদিন এ জাহান্নামের পাতালপুরী থেকে অবশ্যই মুক্তি পাবে। তাদের দাড়ি, মোঁচ ও মাথার চুল বেড়ে চলছে। মাথার এলোমেলো চুলগুলো লাল ও সাদা হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে চুলগুলোর যত্ন নেওয়ার অবকাশ কোথায়! এ ব্যাপারে কল্পনারও তো সুযোগ নেই তাদের। তাদের ব্রাশ ও চিরুনীর প্রয়োজন তো অবশ্যই আছে কিন্তু তা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন কিংবা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয় বরং তাদের মাথায় যেসব উকুন তোলপাড় করে চলছে তাদের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। গোসলের তো প্রশ্নই উঠে না, এ কারণেই তাদের মাথায় উকুনের উৎপত্তি হয়েছে, যা কয়েদীদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। প্রথমে তারা এগুলো ধরে অন্যরা যেন না দেখতে পায়, চুপে চুপে নখের ভিতর দাবিয়ে মেরে ফেলতো। কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা গেল, সকলের মাথায়ই ঝাঁকে ঝাঁকে উকুন সৃষ্টি হয়েছে। কারো মাথা নড়ে উঠলেই একসঙ্গে অনেকগুলো উকুন মাথা থেকে পড়ে যায়। কয়েদীরা তখন একজন আরেকজনের উকুন ধরে মারে। কয়েদীরা বলাবলি করে, "প্রথম থেকেই এক শত্রুর নির্যাতনে প্রাণ ওষ্ঠাগত, এখন আবার আরেক দুশমন রণাঙ্গনে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

কিছুদিন পর এসব উকুন তাদের ছেঁড়াফাটা জ্যাকেট ও সুয়েটারের ভিতরে গিয়ে বাসা বানাতে লাগল। রাতের কষ্টটা কয়েদীদের পক্ষে ক্রমশ বেড়ে চললো। মনে হতো, যেন রাত আর পোহাবে না। অসহায়ত্ব ও নৈরাশ্যের বোঝা দিনে দিনে ভারীই হচ্ছে। সব সময়ই তারা নিজেদের বগল, শরীর ও খালি পেট অসহায়ভাবে চুলকাতে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়
জাহান্নামের তৃতীয় গহ্বর

বাইরে থেকে ভেসে আসা গুলীর শব্দ, চিৎকার ও মারপিটের আওয়াজ, ... সন্ধ্যার হাজিরা ইত্যাদির কারণে মনে হতো যেন এ ভয়ানক অবস্থার বাইরে জীবনের আর কোন কল্পনা করা যায় না।

শেষ প্রহরের নির্যাতন

অর্ধরাতের পর সুবহে সাদিকের পূর্বে প্রতিদিন একজন গার্ড কাউকে দেখা ছাড়াই দরজার কাছে শোয়া কিংবা বসা লোকদের উপর মাতালের মত এসে অতর্কিত আক্রমণ করতো। তখন রাতের নিরবতা খান খান হয়ে তার কর্কশ হুংকার শুনা যেত 'সবাই দাঁড়িয়ে যাও"। এ শুনে যে জেগে পড়েছে সে তার সাথের লোককে সতর্ক করে দিতো। আর এমনিভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে সব কয়েদী জেগে উঠতো। কারারক্ষী একজন একজন করে কয়েদীদের নাম ডাকতো। যাদের নাম ডাকা হতো তাদেরকে বাইরে আসার নির্দেশ দেয়া হত। এক-দেড় ঘন্টা পর এদেরকে পুনরায় বালুর বস্তার মত কামরায় ছুঁড়ে মারা হত। এটা সার্বদের নির্যাতনের দৈনন্দিন রুটিন। নিষ্ঠুর নির্যাতনে অনেকের হাত পা ভেঙ্গে যেত। ক্ষতস্থান থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়তে থাকতো। অনেকের শরীরের চামড়া ভেদ করে ভেঙ্গে ফেলা হাঁড় বের হয়ে আসতো। এমন অবস্থায় অন্যান্য কয়েদীরা যে যেভাবে পারতো আহত সাথীদের সেবা শুশ্রূষা করতো। পুরাতন ছেঁড়া ফাঁটা কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিত। ভাঙ্গা হাত পা বাঁধার জন্য পুরাতন সার্ট বা গেঞ্জী ব্যবহার করত। কয়েদীরা দরজার সাথে লাগানো প্লাইবোর্ড উঠিয়ে তার টুকরা দিয়ে হ্যাণ্ডলিং বানিয়েছিল, এটা দিয়ে হাড্ডি জোড়া লাগাতো। রাতের শেষ প্রহরের এ নির্যাতন কয়েদীদের মানসিকতায় এমন গভীর ক্ষত সৃষ্টি করতো যা নিরাময় হওয়া ছিল অসম্ভব। তারা দিন দিন নির্বাক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছিল।

একজন দয়ার্দ্রচিত্ত ডাক্তারের কাহিনী

কিছুদিন পর ডাক্তার ঈসা ছাদেকোভিচ্‌কে এ বন্দী ক্যাম্পে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়। তিনি নাক, কান ও গলার চিকিৎসায় অনেক

প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রেজডোর হাসপাতালের নাক, কান, গলা বিভাগের তিনিই ছিলেন প্রধান। এলাকার লোকেরা তার সুচিকিৎসা ও মার্জিত ব্যবহারের দরুন তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। তিনি জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি সংস্থার বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে কর্মব্যস্ত থাকার পর কয়েক বছর পূর্বে মাতৃভূমির আকর্ষণে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হওয়ার পূর্বে তিনি অধিকাংশ সময় জাতিগত সম্প্রীতি,পরস্পর ভালবাসা,ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহাবস্থানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে রেডিওতে ভাষণ দিতেন। কিন্তু এখন তার সেসব নিখাদ ও নির্ভেজাল বক্তব্য সার্বদের কাছে ভিন্ন অর্থের মনে হচ্ছে, তারা তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। তারা তাকে তার বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে আমারেস্কার এ বন্দী শিবিরে নিয়ে আসে।

কিন্তু এই অকল্পনীয় মুসিবতে পতিত হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার ছাদেকোভিচ্ সব সময়ের মত ক্যাম্পের ভিতরে ও বাইরে প্রত্যেককে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এমনকি গার্ডরা পর্যন্ত তাদের যখমের ব্যাপারে ডাক্তার সাহেবের শরণাপন্ন হত। গার্ডদের নির্বুদ্ধিতা ও চঞ্চলতার দরুন একটার পর একটা যখম লেগেই থাকতো। কারণ তারা অধিকাংশ সময় রাইফেলের নিরাপদ লকটিকে বন্ধ করে রাখতো না, আর সেজন্য ট্রিগারে আঙ্গুলের সামান্য চাপ পড়লেই গুলি বেরিয়ে যেতো। তারা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে রাখতো এবং নলের মুখটা থাকতো নিচের দিকে, তাই অধিকাংশ গুলি পায়ে কিংবা হাঁটুতে লাগতো। গার্ডদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে সব ধরনের ডাক্তারী সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হতো, কিন্তু কয়েদীদের চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক সরঞ্জাম পর্যন্ত প্রদান করা হতো না।

একবার জিমু ডাক্তার ছাদেকোভিচ্কে রক্তাক্ত একজন কয়েদীর মাথা সেলাই করতে দেখলো। কেন্টিন থেকে আসার পথে একজন গার্ড নির্দয়ভাবে লোহার রড দিয়ে আঘাত করে মারাত্মকরূপে তাকে আহত করেছে। সেলাই করার পর ডাক্তার লোকদেরকে বললেন, কয়েদীটির মাথায় আঘাতের ফলে পুরো শরীরের চেয়ে ও বেশী রক্ত ক্ষতস্থানে জমে

গিয়েছে। তিনি এ যখমটি কাপড় সেলাই করার সুঁই এবং সাধারণ সুতা দিয়ে সেলাই করেন। কারণ, এছাড়া অন্য কোন জিনিস তিনি পাননি। সেলাইয়ের সময় দাঁত চেপে সেই কয়েদীটি যেভাবে প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে যাচ্ছিল, সে দৃশ্য কোন সময় ভুলবার নয়।

প্রতিবাদী মহিলা কয়েদী

ডাক্তার ছাদেকোভিচ্ আমারেস্কা শিবিরের বিভিন্ন অংশের লোকদের চিকিৎসা করা ছাড়াও চল্লিশজনের মত মহিলারও চিকিৎসা করতেন। এঁদের মাঝে অনেক সার্বিয়ান মহিলাও ছিল, এদের অপরাধ এরা মুসলমান প্রতিবেশীদের উপর সার্ব আর্মি ও সার্ব রাজাকার ফোর্সদের অকথ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। এসব মহিলাদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো জোভানকা। সে জিমুর প্রতিবেশী। সে ঐ ইমারতেই বাস করতো যেখান থেকে জিমু ও তার অন্যান্য প্রতিবেশীকে গ্রেফতার করে এ ক্যাম্পে আনা হয়েছে।

মহিলারা জিমুদের কামরার উপরে অবস্থিত বারান্দায় ঘুমাতো। এ বারান্দাটি দিনের বেলায় তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবহার করা হতো। তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে মহিলাদেরকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দেয়া হতো। রান্নাঘরে এসে তাদের কারো কারো খানা পাকাতে হতো। আবার কারো কারো বরতন, থালাবাটি ধুইতে হতো, আর বাকী সবাই পুরোদিন সেখানে চুপ করে বসে বসে খেতে আসা কয়েদীদেরকে ভর্ৎসনা, গালিগালাজ ও মারধোর খেতে দেখতো।

জিমু প্রায়ই দেখে, জোভানকা কেন্টিন হতে ফেরার পথে এরির হাতে চুপে চুপে কিছু ধরিয়ে দেয়। এগুলো সাধারণতঃ রুটির টুকরা। তবে একবার সে এক টুকরো চকলেটও এরিকে প্রদান করেছিল। সেজন্য জিমু মাথা হেলিয়ে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

এসব বন্দী নারীদের মাঝে স্থানীয় আদালতের জজ নেস্কা, দাঁতের ডাক্তার বেব এবং সাংবাদিক জান্দরান্কা প্রমুখকে জিমু পূর্ব থেকেই চিনতো। এক মহিলার দু' ছেলেও এ ক্যাম্পে বন্দী ছিল। তাদের একজন কেএলোস্। অপরজন আনিস। মহিলাটি তার ছেলেদেরকে চুপে চুপে কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্য দিতো। এ পরিবারটি জিমুদের কামরায়ই

থাকতো। কখনো কোন রহমদীল গার্ড সে মহিলাটিকে তার সন্তানদের প্লেটে সামান্য অতিরিক্ত খোরাক কিংবা রুটির এক আধ বাড়তি টুকরা প্রদান করার অনুমতি দিয়ে দিতো।

হোয়াইট হাউস

হাজেরা নামের এক মেয়েকে অন্য পঞ্চাশ জন বন্দীর সাথে 'হোয়াইট হাউস' নামক কয়েদখানায় রাখা হয়। জেলখানাকে হোয়াইট হাউস বলে আখ্যায়িত করা সার্বদের মত লোকদেরই কৃতিত্ব হতে পারে। এ কয়েদখানার বন্দীদের উপর সার্বরা অমানবিক নির্যাতন চালাতো। এর বাইরের অংশ সাদা ছিল বিধায় সার্বরা উপহাস করে 'এটাকে হোয়াইট হাউস বলতো। এ কয়েদখানা মাঝারি ধরনের চারটি কক্ষ নিয়ে গঠিত এবং রান্নাঘরের সাথেই অবস্থিত। এতে একটি গোসলখানাও রয়েছে, তবে সেটা একমাত্র গার্ডরাই ব্যবহার করতো। এ কয়েদখানার বন্দীদের প্রস্রাব–পায়খানার কাজ সমাধার জন্য ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হত। গার্ডরা নিজেদের মর্জি মাফিক চারজন কিংবা পাঁচজনের গ্রুপ বানিয়ে নিয়ে যেতো। আবার কখনো বা একজন একজন করে নিয়ে যেতো। অনেক কয়েদীকে সে মুহূর্তে জবাই করে কিংবা গুলি করে হত্যাও করা হত।

হায়েনার হাসি

এক রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল। সার্ব সৈনিকরা মুহাম্মাদ আলীজাহ সিরাজলককে বাইরে আসার নির্দেশ দিল। তিনি একজন ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বয়স ষাট হবে। তার মাথার চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেছে। বাইরে এনে তাকে প্রথমে উলঙ্গ হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। অতঃপর এ অবস্থাতেই তাকে হাজেরা যে কামরায় থাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। হাজেরার বয়স সর্বোচ্চ ১৮ বছর হবে। তাকেও উলঙ্গ করা হল। অতঃপর তাদের উভয়কে নির্দেশ দেয়া হল তারা যেন সমস্ত কয়েদীদের সামনে যৌন সম্ভোগ করে। কয়েদীরা বিস্ময়ভরে এ দু'জন সৎ ও অসহায় মুসলমানের অবমাননা বেইজ্জতীর করুণ দৃশ্য দেখল। মুহাম্মাদ আলীজাহ্ কারারক্ষীদের কাছে দু'হাত জোড় করে, অনেক কাকুতি–মিনতি করে বলল ঃ "দেখুন! হাজেরা আমার নাতনীর

সমতুল্য। ওর সাথে এমন জঘন্য পাপ কাজ করার কথা বলবেন না, আল্লাহ্ নারাজ হবেন।"

কিন্তু পাষাণহৃদয় গার্ডরা একটা হায়েনার হাসি হেসে বলল ঃ "দেখো, এ বুড়ো আবার কতো অভিমান করছে। আমাদের কাছে ঐ মুহূর্তে এর চে' কম বয়সের মেয়ে নেই। আমরা যদি একে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে তোমার জন্যও ঠিক হবে।"

নিরীহ মেয়েটি লজ্জায় হাত দিয়ে লজ্জাস্থানটি ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে এবং কেঁদে কেঁদে অনুনয় বিনয় করে আবেদন করছে, যেন ওকে কাপড় পরার অনুমতি দেয়া হয়।

"না....... না........ কখনো না........! একজন গার্ড অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দাঁত বের করে বলল, "এখনই এ বুড়ো রাজি হয়ে যাবে, তাকে রাজি হতেই হবে।"

এরপর সে তার অন্যান্য সঙ্গী গার্ডদেরকে বলল ঃ "এ বুড়োটাকে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে যাও এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ কাজে রাজি করতে প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বাইরে রেখে দাও।"

মুহাম্মাদ আলীজাহ্কে এ প্রচণ্ড শীত ও ঝড়ের রাতে, যখন পুরো গরম কাপড় পরেও বের হওয়া মুশকিল, পূর্ণ দু' ঘন্টা খালি গায়ে উলঙ্গ অবস্থায় বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। অতঃপর খুবই মুমূর্ষু অবস্থায় ভিতরে নিয়ে আসা হল। এরপর পুনরায় হাজেরার সাথে যৌনকর্ম সম্পাদন করার নির্দেশ দেয়া হল। কিন্তু এবারও সে খুবই দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সার্ব হায়েনারা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাইফেলের বাট ও আর্মি বুট দিয়ে প্রচণ্ড বেগে একের পর এক আঘাত হানতে লাগলো। অবশেষে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

"এই অপবিত্র পুটলীটাকে বাইরে ফেলে দাও" একজন গার্ড চেঁচিয়ে বলল।

মুহাম্মাদ আলীজাহ্কে দরজার বাইরে ডানদিকের খোলা জায়গায় ফেলে দেয়া হল। সকালে দেখা গেল তিনি মরে শক্ত হয়ে গেছেন।

পাষাণ হৃদয়

হোয়াইট হাউসের সবচেয়ে পাষাণ হৃদয় ও কুখ্যাত নির্যাতনকারী 'যোকা' নামক একজন সার্ব সৈনিক। তার দাবী, সে সার্ব সেনাদের মাঝে সবচে' বেশী শক্তিশালী। সাধারণতঃ তার হাতে লোহার তিন ফুট লম্বা ডাণ্ডা থাকতো। ডাণ্ডাটির মাথায় ইস্পাতের তৈরী একটি পেরেক লাগিয়ে রাখা হয়েছে। পেরেকটি কয়েক ইঞ্চি লম্বা ও খুবই ধারালো। সে লোহার ডাণ্ডাটি বন্দীদের মাঝ দিয়ে চলার সময় হিংস্রভাবে ঘুরাতে থাকতো। সে হঠাৎ কোন কয়েদীর সামনে থেমে বলতো ঃ "তোমার কাছে তোমার কোন্ চোখটি বেশী প্রিয়।" অমনি সে সেই কয়েদীর চোখের ভিতর পেরেক ঢুকিয়ে দিত। আবার কোন কোন সময় কোন কয়েদীর সামনে থেকে তার গোপন অঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ডাণ্ডা দিয়ে তার পুরুষাঙ্গটি নাড়া দিয়ে বলতো, "তোমার কোন্ অণ্ডকোষটি বেশী প্রিয়?" অমনি সেই কয়েদীর কোন একটি অণ্ডকোষে পেরেক ঢুকিয়ে দিত।

একবার সে তুলনামূলক সামান্য ছোট পেরেক একজন ষোল, সতেরো বছরের যুবকের পায়ের গোঁড়ালীতে ঢুকিয়ে দিল এবং তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল ঃ "যদি তুই এই পেরেক খোলার চেষ্টা করিস, তাহলে তোকে গরুর মত জবাই করে মারবো।"

কয়েকদিন পর সে যুবকটি যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা গেলো।

কয়েদীদের টাকা-পয়সা, ঘড়ি এবং অন্যান্য ব্যবহারের উপযোগী জিনিস-পত্র ছিনিয়ে নেয়া এসব কারারক্ষীদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ নিয়মটি শুধু হোয়াইট হাউস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, সমস্ত বন্দীখানায়ই এ ব্যাপারটি চলতো। কিছু কয়েদীর নিকট সিগারেট ছিনতাই হওয়াটা খানা না পাওয়ার চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক ছিল।

চাঁদাবাজ গার্ড

হঠাৎ কোন গার্ড এসে ঘোষণা করতো, "দশ মিনিটের মধ্যে আমার জন্য দু'শ জার্মানী মার্ক জমা করে রাখবে, নইলে দরজার সামনের দশজন কয়েদীকে গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে দেবো।" এরপর সে কয়েদীদেরকে কিছু বলার বা কোন ধরনের মিনতী করার সুযোগ না দিয়েই তড়িৎগতিতে চলে যেতো।

কয়েদীরা নিজেদের পকেট তন্ন তন্ন করে খুঁজে যা পেত তা সেই দশজন কয়েদীর হাতে তুলে দিতো। সাধারণতঃ এ জমা টাকা যতটুকু দাবী করা হয়েছিল পরিমাণে তার চেয়ে কম হত।

গার্ডটি ফিরে এলে পাঁচ ছয়টি হাত ঘড়ি পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেত। আর কিছু বলতো না। সিকো ঘড়ি তাদের খুবই প্রিয়। অনেক গার্ড আবার কয়েদীদের মধ্য হতেই কাউকে বিক্রয়কারী নির্ধারিত করতো। সে বাজার থেকে দশ গুন বেশী দামে কয়েদীদের নিকট সিগারেট, বিস্কুট বিক্রয় করতো।

অনেক সময় কোন বন্দীকে শাস্তি দিতে চাইলে এক ধরনের নাটক করা হতো। একজন গার্ড এসে তাদের টার্গেট করা কয়েদীকে বড় এক কার্টন সিগারেট দিয়ে যেতো। বলত সে যেন তার নির্ধারিত দাম অনুযায়ী বিক্রি করে.....। কিছুক্ষণ পরই আকস্মিকভাবে আরেকজন গার্ড এসে উপস্থিত হত এবং সমস্ত সিগারেট ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। এক ঘন্টা পর প্রথম গার্ড ফিরে এসে এমন ভাব দেখাতো, যেন সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। তারপর সে ঐ বদনসীব কয়েদীর নিকট এসে সিগারেটের টাকা চাইতো যাকে বিক্রয়ের জন্য বলা হয়েছিল। তখন সে কয়েদীটি তাকে যতই বুঝাতো কিংবা তার সামনে ওজর পেশ করতো, কোনটাই সে মানতো না, শেষ পর্যন্ত তার উপর নির্মম নির্যাতন চালাতো, এমনকি মেরে ফেলাও হতো।

সিগারেট পাগল

আমারেস্কা বন্দী শিবিরে সিগারেটের একটি ব্যতিক্রমধর্মী কাহিনী রয়েছে। সিগারেট পানে অভ্যস্ত কয়েদীরা নিজেদের সিগারেট শেষ হয়ে গেলে উন্মাদের ন্যায় যাদের কাছে সিগারেট আছে তাদের চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হত এবং মাত্র একটা টান দেয়ার জন্য কত কাকুতি মিনতি যে করতো। অনেক সময় দশ জন লোক একটা সিগারেট পালাক্রমে পান করতো। এক এক ব্যক্তির হিস্সায় একটি কিংবা দু'টি টান পড়তো। যদি কেউ লম্বা টান দিতো তাহলে তাকে তার অন্যান্য সাথীদের ক্রোধের সম্মুখীন হতে হত।

এমন কিছু নেশাগ্রস্ত লোকও দেখা যেতো যারা এ আশায় হা করে সিগারেট পানকারীর আশে পাশে ঘুরাঘুরি করতো, হয়তো তারা তাদের ছুঁড়ে মারা ধোঁয়া থেকেই কিছুটা স্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম হবে।

অনেক সময় কারো কাছেই কোন সিগারেট থাকতো না। তখন কয়েদীরা আঙ্গুলকে এমনভাবে ঠোঁটের কাছে নিতো এবং শ্বাস গ্রহণ করতো, যেন তারা সত্যি সত্যি মুখে সিগারেট নিয়ে পান করছে। কয়েদীরা সিগারেটের বেঁচে যাওয়া অংশ জমা করতো, যা লম্বায় এক ইঞ্চির চেয়েও কম। কিন্তু তারা খুবই দক্ষতার সাথে এগুলো জ্বালিয়ে পান করতো। অথচ তাদের আঙ্গুল পুড়তো না। এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক অসম্ভব ব্যাপার।

কখনো কখনো তারা এসব পান করা সিগারেট থেকে তামাকের গুড়ো বের করে তা হেফাযত করে রাখতো এবং পরে এগুলো পুরাতন খবরের কাগজের টুকরার ভিতর পেঁচিয়ে সিগারেটের মত বানিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে পান করতো।

বেশ কিছু দিন পর গার্ডরা কড়া প্রহরায় বন্দীদেরকে কয়েদখানা থেকে বের করে বাইরের খোলা ময়দানে নিয়ে যেতে শুরু করল। তখন কয়েদীরা ঘাসের পাতা ছিঁড়ে এনে সূর্যের আলোয় শুকাতো। পরে এগুলোকে সিগারেটের মত বানিয়ে খুব আগ্রহভরে পান করতো।

জিমুদের বন্দীশালায় মুজু করনালক নামে স্বাস্থ্যবান এক যুবক ছিলো। সে–ই বেশীর ভাগ সিগারেট ও বিস্কুট বিক্রি করতো। সেজন্য অন্য কামরার কয়েদীরা জিমুদের কামরাকে 'মুজুর বন্দীশালা' বলে ডাকতে শুরু করল। মুজোর দায়িত্বে যেসব কাজ ছিল তা হচ্ছে, নিজের বন্দী সাথীদের প্রতিদিন গণনা করা, তাদেরকে খাবার জন্য কাতারবন্দী করে দাঁড় করানো ইত্যাদি ইত্যাদি। এ কাজে বারহো কেপ্টেনোভিং নামক এক মুসলমান তাকে সহযোগিতা করতো। সে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আমারেস্কা খনিতেই চাকুরী করতো। প্রায়ই রাতে কারারক্ষী এসে মুজুকে বাইরে ডাকতো। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতো এবং ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরো কিছু গরম কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে যেতো, কিছুক্ষণ পরই সে সিগারেট ও বিস্কুটের ডিব্বা হাতে নিয়ে কামরায়

ঢুকতো। এসেই এগুলো বিক্রি করতে লেগে যেত। মুহরেম মুরছেলোভেক মুরছাল, যিনি প্রেজডোর শহরের একটি প্রসিদ্ধ রেষ্টুরেন্টের মালিক ছিলেন। তিনি মুজুর পাক্কা গ্রাহক ছিলেন। তিনি সিগারেট খরিদ করে যারা সিগারেট ক্রয় করার সামর্থ্য রাখতো না তাদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। কয়েদীদের লোলুপ দৃষ্টি যেভাবে রীতিমত মুজুর হাতে রাখা সিগারেট ও বিস্কুটের অনুসরণ করতো, সে তামাশাটাও দেখার মত।

মুজু গার্ডদেরকে 'কমরেড সার্জেন্ট' বলে ডাকতো। অন্য কয়েদীরা এ ধরনের ফ্রি হওয়ার দুঃসাহস তখনই করতে পারতো যখন কোন গার্ড খোশ মেজাযে থাকতো।

ভয়াল রাতের নির্যাতন

একদিন মাঝ রাতে একজন 'কমরেড সার্জেন্ট' মুজুকে বাইরে ডাকলো। সুগঠিত সুন্দর শরীরের অধিকারী মুজু অন্যান্য রাতের মত আজও একটি জার্সি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু সে আর ফিরে এলো না, সার্বরা চিরদিনের জন্য তার অস্তিত্বকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিলো।

এর বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত মুজুর সহযোগী 'বারহো' মুজুর দায়িত্ব পালন করতে থাকে। কিন্তু পরে হঠাৎ করে এক রাতে তার সাথেও ঠিক ঐ ঘটনাই ঘটল যা মুজুর সাথে ঘটেছিল। বারহোর ভাই মাহমুদ আলীজাহ, প্রেজডোরের একটি ডেকোরেটর কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন। তিনিও তাদের একজন ছিলেন যারা রাতের অন্ধকারে 'বিশেষ তলবের' ফলে চিরদিনের জন্য গায়েব হয়ে গেছেন।

এছাড়াও একটি বড় রেষ্টুরেন্টের মালিক যিকো করনালক এবং তার ছেলে আমীন, প্রেজডোরের ব্যবসায়ী সংস্থা 'বোছনা মুনটাজা'-এর ডাইরেক্টর যেলাজাবোভিচ, শহরের সবচেয়ে প্রিয় ক্যাফের মালিক আসেফ ক্যাপ্টেনোভিচ, প্রেজডোরের প্রধান বিচারপতি নাদযাদ ছায়রাক, জজ ইউসুফ পাছেক, রাফাদ সালজানোভিচ, ওছমান মাহমালজান এবং যেলজেকুস্কুরা প্রমুখ মুসলমান গণ্যমান্য লোকদেরকে ও সার্বরা চিরদিনের জন্য ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

আমারেস্কা নির্যাতন শিবির বন্ধ হওয়ার মাত্র একরাত পূর্বে ডাক্তার

ঈসা ছাদেকোভিচকে তলব করা হয়। তিনি তার সমস্ত ডাক্তারী সরঞ্জামাদি ছোট্ট একটি প্লাষ্টিকের ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়ালেন এবং অতি সন্তর্পনে রজনীর বিস্তৃত আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দরজার কাছের লোকেরা তাকে একটি সামরিক গাড়ীতে সওয়ার হতে দেখলেন। ঠিক সে মুহূর্তে শহরের কেন্দ্রভাগে প্রতিষ্ঠিত 'কেরাত্রাম বন্দী শিবির' থেকে আনা দু'জন কয়েদীকে বাসে চড়িয়ে কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয়। কেরাত্রাম শিবিরটি সেদিনই খালি করা হয়। গার্ডদের ভাষ্যানুযায়ী, এ দু'জন বন্দী সেই ক্যাম্পের সবচেয়ে শক্তপ্রাণ। ডাক্তার ছাদেকোভিচ এর ব্যাপারে একটি আশাব্যঞ্জক কথা এই ছিল যে, তাকে বাসের পরিবর্তে সামরিক গাড়ীতে উঠানো হয়েছিল। এজন্য সামান্য একটু আশা করা যেতে পারে যে, তিনি হয়তঃ বেঁচে যাবেন। নতুবা যাদেরকে বাসে সওয়ার করানো হতো তাদের কোন হদিস পাওয়া যেত না। ডাক্তার ছাদেকোভিচ–এর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে সে সময় প্রেজডোরেই অবস্থান করছিল।

সবদিকেই একটা নিরবতা বিরাজ করছে। কারণ, নিরবতাই এমন একটি বস্তু যা এখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। কয়েদীরা নিরবতার আশ্রয় নিয়ে এখানকার ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় পরিবেশে নিজেদের দুঃখ যাতনাকে ভুলে যেতে কিছুটা সচেষ্ট হত।

জিমু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বেদনাভরা দৃষ্টিতে দূর–দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশের দিকে তাকালো। নিজেকে সম্বোধন করে বলল ঃ "ওই দেখো তো প্রেজডোর।" তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও ভারাক্রান্ত হয়ে এল। বলল, "আমি কি আমার প্রিয় প্রেজডোরকে আবার দেখতে পাবো?" তার চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। নিকট থেকেই কারো মৃদুকণ্ঠ ভেসে এলো। যা কোন কারারক্ষী শুনতে পায়নি "এসব হায়েনারা আমাদের সবাইকে খতম করতে পারবে না....। কোন না কোন আল্লাহর বান্দা অতিসত্বর এদের বর্বর ও নির্যাতন কাহিনীর কথা প্রকাশ করবেই। কারণ, হিংস্র জন্তুরাও নিজেদের পশ্চাতে কোন না কোন চিহ্ন ছেড়েই যায়। এরা কোযারা পর্বতমালার অধিবাসীদের উপর যে জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে, মানব অধিকার যেভাবে লংঘন করছে, মুসলমান মা–বোনদের ইজ্জত যেভাবে লুণ্ঠন করছে এবং এ অঞ্চলটা যেভাবে ধ্বংস ও উজাড় করছে,

তা কোন মানব তো দূরের কথা, এমন কি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্ তাআলাও হয়তো এদেরকে মাফ করবেন না। এর মাশুল একদিন এ নরাধম পশুদের দিতেই হবে।"

রাতে অনেক সময় দেখা যেতো, কয়েদীদের অনেকেই সংক্ষিপ্ত ঘুমের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে হঠাৎ উঠে বসছে। পাগলের মত চিৎকার করছে।

জীবন্ত লাশ

একদা রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত কয়েদীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কামরার নিরবতা খান খান করে কে যেন উচ্চস্বরে বলে উঠলো, "ওহে বন্ধুগণ! শুনো, শুনো, আমরা সবাই জীবন্ত লাশ, আমরা সবাই জীবন্ত লাশ।"

এ আওয়াজটা ছিল হাজুর। তিনি একজন নরম প্রকৃতির ও ঈমানদার মানুষ। তিনি ফায়ার বিগ্রেডে ড্রাইভারের চাকুরী করতেন। কিছুদিন হল তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। সাথী কয়েদীরা তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলো। তবে তার কথাগুলো প্রতিধ্বনি হয়ে অনেক দিন পর্যন্ত বন্দীদের কানে বাজতে লাগলো।

একদিনের ঘটনা। কয়েদীরা আহার শেষ করে সারিবদ্ধ হয়ে কেন্টিন থেকে নিজ নিজ বন্দীখানার দিকে আসছে। হাজু একদম খোলা ময়দানের দিকে মুখ করে চলতে লাগল। একজন গার্ড এ দৃশ্য দেখে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল, হাজু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পরে জানা গেল যে, গুলিটি তাঁর কাঁধে লেগেছিল। সে যাত্রায় সে রক্ষা পেল। গার্ডরা অধিকাংশ সময় তাকে ভয় দেখিয়ে বলতো, "হাজু! যদি তোমার এখানকার কোন জিনিস ভাল না লাগে তাহলে তুমি কামরা থেকে বেরিয়ে এসো, বাকী কাজটা আমরা সেরে নেবো।"

ভয়ংকর খেলা

একদিন কারারক্ষীরা সকল বন্দীকে বাইরের খোলা ময়দানে একত্রিত করলো। রোগী ও যখমীদেরকেও কোন ছাড় দিল না। কয়েদীরা একজন আরেকজনের উপর ভর দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে ময়দানে পৌছল। প্রায় তিন হাজার বন্দী রান্নাঘরের সামনের দেওয়ালটি ঘেঁষে ভেড়া-বকরীর মত জড়সড় হয়ে দাঁড়ালো। এ সংকীর্ণ জায়গাটিতে প্রচণ্ড রোদের ভেতর

একজন আরেকজনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সেপাহীরা ফায়ার করার ভঙ্গিতে পজিশন গ্রহণ করছে। একজন সৈনিক, যে সব সময় নিজের মেশিনগান নিয়ে মারাত্মক ভঙ্গিতে খেলা করতো, সে দৌড়ে ছাদে আরোহণ করলো এবং মেশিনগানে গুলি ভরতে আরম্ভ করল। গুলি ভরার পর সে শুয়ে মেশিনগানের নলটি কয়েদীদের দিকে ঘুরিয়ে তার করে ট্রিগারের উপর আঙ্গুল রাখল।

জিমু এরিকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো এবং তার হাত দু'টো এরির মাথার উপর দিয়ে আড়াল করে ধরল। যেন এরি তার চতুষ্পাশের এ ভয়ানক কর্মকাণ্ড দেখতে না পায়। কিছুক্ষণ পরেই কামান ফিট করা তিনটি সাঁজোয়া ট্রাক কয়েদীদের দিকে মুখ করে তাদের থেকে সামান্য দূরে এসে দাঁড়াল। "এরা আমাদের সবাইকে খতম করে দেবে" কেউ বলল। সবাই ভয়ে আতংকিত, চেহারা ফ্যাকাশে ও চোখ বিস্ফোরিত। কিন্তু এ ভয়াবহ অবস্থা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার একটা আশ্চর্য প্রেরণা সকলের মাঝে বিরাজমান। সবাই নিরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে তারা তাদের দিকে তাক করা অস্ত্রগুলোকে আড় চোখে দেখছে। আনুমানিক এক ঘন্টা পর্যন্ত এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। অতঃপর ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ কয়েদীদেরকে নিজ নিজ বন্দীশালায় চলে যেতে নির্দেশ দিল।

জন্মদিনের আজব শখ

আমারেস্কা নির্যাতন শিবিরে যেসব রক্ষীরা ছিল, তারা ছিল আমারেস্কা, মেরেস্কা ও গ্রেনডেনা গ্রামের বাসিন্দা। এরা নিয়মিত সেনা ছিল না, এরা ছিল স্বেচ্ছাসেবক। তবে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় বানজালুকা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর জোয়ানরা এখানে আসতো। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদেরকে 'সুদক্ষ' বলে সম্বোধন করতো। সত্যিই এরা নিরস্ত্র বন্দী মুসলমানদের হাত, পা এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গতে সুদক্ষ ছিল। বন্দীদের মাথা দেয়ালের সাথে মেরে মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করতে এবং মগজ বের করতেও তারা অনেক দক্ষ ছিলো। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সার্বসেনা ও স্বেচ্ছাসেবকরা মিলে আমারেস্কা বন্দী শিবিরে

রক্তের হোলী খেলতো। এক ছুটির দিনে একজন 'সুদক্ষ' ফৌজ খোলা ময়দানে দণ্ডায়মান বন্দীদের আশে পাশে চক্কর লাগিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, "আজ আমার পঁচিশতম জন্ম বার্ষিকী, এ পর্যন্ত আমি নিজ হাতে মাত্র তেইশজন মুসলমানকে জবাই করেছি, আজ আমি বেশী নয়, মাত্র দুজন মুসলমানকে হালাল করবো।"

এ খোলা ময়দানটি আঙ্গিনার মতো ছিল। বন্দীদের পানাহার শেষ হলে এ বিশেষ জায়গাটিতে নিয়ে আসা হত এবং কয়েদীদের প্রতিটি গ্রুপ থেকে কিছু লোককে বিল্ডিংয়ের দিকে পিঠ করে মাটির উপর বসিয়ে রাখা হত। যখন অন্য কোন বন্দী শিবির থেকে আগত নতুন কয়েদীদেরকে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ কামরাসমূহে নিয়ে যাওয়া হত, তখন মাটির উপর বসা কয়েদীদেরকে নির্দেশ দেয়া হত, তারা যেন উপুড় হয়ে শুয়ে নিজেদের মাথাগুলো হাত দিয়ে আড়াল করে রাখে। এর উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন তাদের আশে পাশে যা ঘটছে তা দেখতে না পায়। এ সময়ে গার্ডরা 'অবাঞ্ছিত' বন্দীদেরকে সোজা করতো। এ সময় ময়দানে হলুদ রঙের একটি ভ্যান দাঁড়ানো থাকতো। এ ভ্যানটিতে করে সেই 'অবাঞ্ছিত' বন্দীদের লাশ কিংবা মারাত্মকরূপে আহত কয়েদীদের কাটা অঙ্গ কোন অজানা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হত। সাধারণতঃ ময়দানে বসে থাকা কয়েদীদেরকে দিয়ে লাশ উঠানোর কাজ সম্পাদন করা হতো। পরে এদেরকেও লাশ হয়ে ঐ গাড়ীতে চড়তে হতো, যেন কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর অস্তিত্ব না থাকে।

যখন প্রখর রোদে ময়দানের পাকা ফ্লোর উত্তপ্ত হয়ে উঠত তখন প্রায়ই গার্ডরা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে কয়েদীদেরকে কাপড় খুলে উপুড় হয়ে সেই উত্তপ্ত ফ্লোরে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিতো। প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে মনে হত যেন শরীরের চর্বিগুলো গলে বেরিয়ে পড়বে। এইভাবে প্রায় দশঘন্টা শুয়ে রাখত।

ধন্যবাদের অপরাধ

কয়েদীরা উন্মুক্ত স্থানে ঘুরাফেরা করার কিংবা নিজেদের মর্জিমাফিক কোন জায়গায় বসার অনুমতি খুবই কম পেতো। কদাচিৎ তারা যখন

অনুমতি পেত তখন গার্ডদের অত্যন্ত কড়া পাহারা থাকতো। একদিন কয়েদীরা গার্ডদের উদারতার উপর বেশীই ভরসা করে ফেলেছিল। রেজুহাডযালেক নামের ত্রিশ বছর বয়সের এক কয়েদী জিমুদের গ্রুপে এসে বসল। সে বসে এক টুকরা রুটি খাচ্ছিল, যা গার্ডদের তাড়াহুড়ার কারণে কেন্টিনে খেয়ে শেষ করতে পারেনি। একজন গার্ড তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার দিকে তাকিয়ে একটা পাশবিক হাসি হেসে 'হ্যালো' বলল। মুহূর্তের জন্য রেজুর কাছে সেই সেপাইটি সহানুভূতিশীল ও ভদ্র মনে হল। তাই সে আবেগের বশবর্তী হয়ে বসনিয়ান ভাষায় 'বাজরুম' আপনাকে ধন্যবাদ বলল।

"তোমার এত বড় স্পর্ধা কীভাবে হল? তুমি আমাকে তোমার সমকক্ষ মনে করে বাজরুম (ধন্যবাদ) বলছো?" সেপাইটি তার মা বাপ তুলে গালি দিয়ে বলল, "এখনই আমি তোমাকে অন্য জগতে পাঠিয়ে তবে দম নেব।" সেই দরদী (?) মানুষটি মুহূর্তের মধ্যেই একটি হিংস্র দানবের রূপ ধারণ করল। সে রেজুর চুল শক্ত করে ধরে লোহার রড দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে করতে তাকে উপরে নিয়ে গেল। প্রথমে তার কান দুটো ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল, অতঃপর আরো কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে রেজুর জিহ্বাটা টেনে ধরে কেটে ফেললো আর বললো ঃ "তুই এ যবান দিয়ে বাজরুম বলেছিস, এটা তো আর রাখা যায় না।"

এরপর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে লাগল। রেজুর করুণ আর্তনাদ ও চিৎকার ধ্বনিতে কামরাটি প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। খোলা ময়দানে বসা কয়েদীরাও তার হৃদয়বিদারক আহাজারি শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু কেউ উপরে গিয়ে তাকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, বরং নিজ স্থান হতে নড়তেও সাহস পেলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেজুর গোঙ্গানী ও চিৎকার ধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল। রেজু চিরদিনের জন্য চির শান্ত হয়ে গেল। পনের বিশ মিনিট পর সেই পাষণ্ড, দু'জন কয়েদীকে কামরায় তলব করল এবং নিচে বসা সমস্ত কয়েদীকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলল।

"এ নর্দমার কীটটিকে এখান থেকে সরিয়ে ফেল" সেই রক্ষীটি কর্কশস্বরে উপরে আসা দু'জন কয়েদীকে নির্দেশ দিল। তারা রেজুর রক্তাক্ত ও কর্তিত লাশটিকে নিচে নিয়ে গেল।

এ ঘটনার পর রেজুর স্ত্রী বন্দী শিবিরে রেজুকে দেখতে এলে কেউ তাকে আসল ঘটনাটি বলল না। হত্যাকারী সেপাইরা এতো নষ্টামী ও খবিস হওয়া সত্ত্বেও রেজুর স্ত্রীর সামনে তার স্বামীর নৃশংস হত্যার কথা স্বীকার করতে সাহস পেলো না। রেজুকে হত্যা করার কোন যুক্তিই সার্বদের কাছে ছিল না। তাদের যুক্তিরই বা কি প্রয়োজন। তারা তো হিংস্র বর্বর জানোয়ারের চেয়ে অধম। রেজু একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ, আদর্শবান নাগরিক ও স্নেহ-মায়া-মমতা ভরা হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তার সন্তানরা প্রেজডোরেই অবস্থান করছিল। অনেক দিন পর্যন্ত তারা তার মৃত্যুর সংবাদ পায়নি। রেজুর স্ত্রী রেজুর বিশেষ চেয়ারে বসে তালুর উপর চিবুক রেখে প্রতিদিন বাইরে রেজুর রাস্তার পানে তাকিয়ে থাকতো। হয়তঃ রেজু কোন দিন ফিরে আসবে। একটা আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। হয়তঃ কিছুদিন পর সে আসল ঘটনাটি অবগত হয়ে গিয়েছিল।

রক্তাক্ত আত্মা

যে সব বন্দী এখনো বর্বর কারারক্ষীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেনি, তাদের আত্মাটাও কম যখম ছিল না। তাদের শরীর দেখে মনে হতো যেন মুর্দা লোকেরা কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবসময় মারপিট, গালিগালাজ, মান হনন, ইজ্জত লুণ্ঠন, যেন তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনে হতো যেন মানবতা ও সৎকর্ম বলতে দুনিয়াতে কোন বস্তু নেই।

সার্ব জেলাররা নিজেদেরই আইনগুলো নিজেদের সামরিক বুট দ্বারা পদদলিত করে যাচ্ছে। খঞ্জর দিয়ে কেটে ফেলছে। এ আইনে তাদের কোন ফায়দা হচ্ছে না এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরও কোন ফায়দা হচ্ছে না। এটা এক অদ্ভূত ও অনর্থক ক্রীড়া, যা সার্বদের জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। আর এরই চক্করে নিরীহ মুসলমান বন্দীদের প্রাণ দিতে হচ্ছে। যে কোন বিবেকবান মানুষ এ অবস্থা দেখে এ সিদ্ধান্তে সহজেই পৌছতে সক্ষম হবে যে, এ ধরনের অর্থহীন ক্রীড়ার শেষ পরিণতি কখনো শুভ হয় না।

বর্বর খেলার পরিকল্পনাকারী

আর এটা বুঝা যাচ্ছে না, এ বিষাক্ত ক্রীড়ার উদ্ভাবক কে? কার মস্তিষ্কে সর্বপ্রথম এ শয়তানী বর্বর খেলার পরিকল্পনা জন্মলাভ করেছে? হাঁ, মনে হয় সারাজেভোর সেই উন্মাদ মাতাল লোকটির মাথায়, যাকে সবাই রাদোভান কারাজিক নামে চেনে। যে কয়েক বছর পূর্বেই এসব হত্যাকাণ্ড ও নির্মম তৎপরতার ব্যাপারে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছিল ঃ

"দয়া কাকে বলে তা যেন কাছেও ঘেঁষতে না পারে, এসো, চলো, শহর, নগর, গ্রাম, গঞ্জ এসব নাপাক ও অবাঞ্ছিত মুসলমানদের অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করি।"

এই মাতাল লোকাটিই এ মিথ্যা ও ধোঁকায় পূর্ণ রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। সে-ই বেলগ্রেডের জালেম শাসকদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সে-ই সার্বদের অন্তরে ঘুমন্ত হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈরীভাবকে জাগিয়ে তুলেছে এবং তাদেরকে লাগামহীন, বর্বর, মানব হন্তা ও হিংস্র হায়েনারূপে গড়ে তুলছে। কেউ বলতে পারবে না, আর কখনো এসব সার্বরা তাদের বর্বর স্বভাব পরিত্যাগ করে মানবরূপে পরিচয় দিতে পারবে কিনা!

মৃত্যু সীমানার কাছাকাছি

একের পর এক লাঞ্ছনার শিকার এবং স্বীয় ইচ্ছার বিপরীত গ্রেফতার হওয়া এসব মুসলমান বন্দীদের ঠোঁট থেকে হাসি-আনন্দ চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে। মনোবলহীন, সাহসহীন, রোগ-ব্যাধি এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত মৃত্যু-সীমানার কাছাকাছি উপনীত এসব অসহায় লোকের অশ্রুভরা চোখগুলো শূন্যে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে থাকতো। তাদেরকে যারা গ্রেফতার করে এ আগুনের বন্দীশালায় এনেছে তারাও তাদেরই মত এ ধরণীর সন্তান। এই আকাশের নিচে তারাও জন্মগ্রহণ করেছে। আর এখানেই তারা নিজেদের জীবনের অনেক দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত করেছে। বসনিয়ার একজন প্রবীণ মুসলমান মহিলা কবি বলেছেন ঃ

"বলকানের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত কৃষকদের এ পুণ্যভূমিতে আমরা একজন আরেকজনের সাথী সঙ্গী।"

এ সকল হতভাগা বন্দীরা এখন এ ব্যাপারটিও বুঝতে পারছে না যে, তারা কোন্ দেশের নাগরিক। তারা এ দেশটিকে 'বসনিয়া হার্জেগোভিনা' বলতো। কিন্তু যারা তাদেরকে গ্রেফতার করেছে, তাদেরকে সমূলে বিনাশ করছে, তারা এ দেশটিকে 'সার্ব প্রজাতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করছে। কয়েদীদের এ নতুন নামটির উপর কোনই আপত্তি ছিল না যদি তারা তাদের এ তথাকথিত 'সার্ব প্রজাতন্ত্রের' সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এবং তার সাথে সাথে সংখ্যালঘু ক্রোয়েটদেরকে নাগরিকরূপে গ্রহণ করে তাদেরকেও থাকার অনুমতি প্রদান করতো। যারা আবহমান কাল থেকে অত্র অঞ্চলে সার্বদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করে আসছে।

প্রিয় জন্মভূমি

বসনিয়ার সেই প্রবীণ মহিলা কবির পংক্তিটি ঃ "বলকানের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত কৃষকদের এ পুণ্যভূমিতে আমরা একজন আরেকজনের সাথী সঙ্গী।'

এখন একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয় এটা কৃষক ও কষ্টসহিষ্ণু পার্বত্য লোকদের মাতৃভূমি। এটা এমন এক দেশ—যার আবহাওয়া হাতের তৈরী চমকপ্রদ জুতা ও সদ্যসমাপ্ত হাল চালানো ভূমি থেকে উত্থিত এক বিশেষ মোহনীয় সুবাসে ভরপুর থাকে। নিঃসন্দেহে এটা বার্নিশ করা খুবসুরত পাদুকা, শিক কাবাব, জায়তুনের তেল, এডরিয়াটিক সমুদ্র পারে দেহকে হলুদবর্ণ দানকারী রোদ এবং হলুদবর্ণ করার জন্য গায়ে মাখার লোশনের ভূমি।

এটা অতুলনীয় রোমাঞ্চকর সঙ্গীতের দেশ, কিন্তু আজ কি কারণে তার সৌন্দর্য, মোহনীয় পরিবেশ ধ্বংসের মুখোমুখী? কেন এটা এক মহা আযাবে জর্জরিত হয়ে পড়েছে?

হে আমার প্রিয়, খুবসুরত, কোমল কান্তা বসনিয়া! হে আমার প্রিয় জন্মভূমি! তোমার উপর যে মহাদুর্যোগ এসে পড়েছে সেজন্য সত্যিই আমি ব্যথিত, আমার হৃদয়টি খান খান হয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়
জাহান্নামের চতুর্থ গহ্বর

১০ই জুনের সন্ধ্যেবেলা। দিনটি বুধবার। তদন্তকারী আমলাগণ নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে বিশেষ গাড়ীতে চড়ে প্রেজডোরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো।

আতংকের ডাক

একজন গার্ড, পরিমাণের চেয়ে অধিক মদ্যপান করে ঢুলতে ঢুলতে এসে জিমুদের বন্দীখানার দরজার ভিতরে উঁকি মারলো এবং জিমুকে বাইরে আসার জন্য নির্দেশ দিল। রাতের বেলা এ ধরনের তলব হওয়ার পর আকস্মিক মৃত্যুর নিস্তব্ধতা সমস্ত কয়েদখানায় ছড়িয়ে পড়ল। জিমুর মাথাটি ভীষণভাবে ঘুরতে লাগল। তার মনে হল মুহূর্তের মধ্যে যেন শত শত হাতুড়ী তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে মারাত্মকভাবে আঘাত হানছে। হৃদয়ের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। এ নির্দেশ শুনে পুরো শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। চেহারার শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে পুত্র এরিকে বলল ঃ "ঘাবড়াবেনা বেটা! আমার কিছুই হবে না।"

জিমু এরিকে জড়িয়ে ধরল। এরির কোমল শরীরের কম্পন সে পূর্ণরূপে অনুধাবন করলো। "স্নেহের এরি! সাহস হারিও না বেটা! তোমার আব্বু অবশ্যই ফিরে আসবে।" জিমু এ কথাটি বলে খুব কষ্টে এরির হাত দুটো তার স্কন্ধ থেকে সরিয়ে মুখটি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। যেন এরি তার চেহারার উপর গড়িয়ে পড়া অশ্রুধারা দেখতে না পায়। কিন্তু তার নিজের কথার উপর নিজেরই বিশ্বাস ছিল না যে, সে জীবন্ত ফিরে আসতে সক্ষম হবে। জিমু দরজা অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এলো। সে তার মাথার পশ্চাতে অনেক অদৃশ্য চোখের দৃষ্টি অনুভব করল। যাদের নিরব দৃষ্টি কথার চেয়েও বেশী ভারী ও দুর্বিষহ মনে হচ্ছে। খানিক পূর্বে জিমু যেখান থেকে উঠে এসেছিল, সেখান থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দনের আওয়াজ ভেসে আসছে। এরি হাউ মাউ করে কাঁদছে এবং সেসব দুর্বল বাহুর বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে যারা ওকে ধরে রাখার জন্য অগ্রসর হয়েছিল।

"আব্বু! আব্বু! প্লিজ, যেয়ো না, ফিরে এসো, প্লিজ!" এরি কাঁদছে

আর চিৎকার করছে। জিমু এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। তার চোখ দু'টো এরির আওয়াজের অনুসরণ করল এবং ওর দিকে ফিরে তাকাল। জিমুর মনে হল যেন তার কণ্ঠনালীতে বড় ধরনের একটি গোলা আটকে গেছে, যার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার মুখমণ্ডলে গড়িয়ে পড়া অশ্রুধারা বৃষ্টির রূপ ধারণ করল। তকদীরের এ ভয়ানক উপহাসকে উপেক্ষা করে খুব কষ্টে সে বলল ঃ "আমি ফিরে আসবো, এরি ! আমি অবশ্যই ফিরে আসবো।"

অতঃপর সে সামনে অগ্রসর হল। জিমু সে দানবরূপী গার্ডটিকে পিছনে ফেলে যার মুখে হিংস্রতা ও দাম্ভিকতার অট্টহাসি ফুটে উঠছে সামনে অগ্রসর হল। তার চোখে মুখে অন্ধকার ছেয়ে আছে।

"আমার আগে আগে চলো" গার্ডটি হোয়াইট হাউসের দিকে ইশারা করে বলল। পুরো পথে সে জিমুকে অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগলো। কখনো সে তার হাতের ডাণ্ডা দিয়ে জিমুর মাথার পিছনের অংশে আঘাত করছে। গরম ও বায়ুহীন পরিবেশ তার কষ্টকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। জিমু বেশ কিছুক্ষণ চলার পর তার চলার গতি মন্থর করে পিছনের দিকে তাকালো। উদ্দেশ্য, সে কতটুকু পথ অতিক্রম করেছে তা নির্ণয় করা। এতে জালেম গার্ডটি অগ্নিশর্মা হয়ে তার কাঁধে ঝুলানো বন্দুকের অগ্রভাগ জিমুর শরীরে এত জোরে চেপে ধরল যে, তা সহ্য করতে গিয়ে তার পুরো চেহারাটি ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য জিমুর ভিতরটা ঘৃণা ও রাগের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। উভয়ে এমন কাছাকাছি হয়ে গেল যে, হয়তঃ সে পিছনে ফিরে গার্ডটির চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করবে এবং একটি শক্তিশালী ঘুষি সেই মাতাল হায়েনাটির থুতনিতে বসিয়ে দেবে। কিন্তু, সে এমনটি করতে পারল না। কারণ, তার কলিজার টুকরা এরির হৃদয় বিদারক আর্তনাদ তার কানে ভেসে আসছে। সে এরির জন্য হলেও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে চায়। সে নতুন চেতনা ও উদ্দীপনা নিয়ে সামনে অগ্রসর হল।

গার্ডটি তাকে হোয়াইট হাউসের বাম দিকে অবস্থিত ২নং কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরই মনে হল, যেন তার মস্তকের উপর আসমান হতে ভারী কোন বস্তু পতিত হচ্ছে। জিমু আঘাতের প্রচণ্ডতায় মাথা ঘুরে ধপাস করে ভূমিতে পড়ে গেল। তার চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল। তখনও তার সামান্য চেতনা অবশিষ্ট

ছিল। সে তার চোখ দু'টো খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে যেতে লাগল। সেই মুহূর্তেও সে ভুলতে পারছে না যে, তাকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তাকে হীনবল হলে চলবে না। তার চেহারা ও মাথা থেকে যে রক্ত বয়ে যাচ্ছে সে তা পরিস্কার করল এবং উঠে বসে চোখ মেলে তাকালো। সে দেখতে পেল, চারজন সার্ব হায়েনা শয়তানের রূপ ধারণ করে হাতে ডাণ্ডা এবং চোখে মুখে বিদ্বেষ নিয়ে ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এসব রক্তপিপাসুদের মধ্যে তাদের কুখ্যাত নেতা যেজাক ওরফে জেগাও ছিল, যার পৈশাচিক দূরাত্মা শত শত নিরীহ মুসলমানদের রক্ত পান করে কলুষিত হয়েছে। এই নরাধম নিজে এ পর্যন্ত ৫০০ মুসলমান (যাদের মাঝে দুধের শিশুও রয়েছে)কে প্রেজডোরকে 'মুসলিম মুক্ত' করার নামে হত্যা করেছে। নরহত্যার কাজটি তার কাছে এতই প্রিয় যে, সে অনেক সময় দু'টি কতলের মধ্যবর্তী সময়ে নিজের রক্ত রঞ্জিত ধারালো ছুরিটি কোষবদ্ধ করার সময়ও পায় না। তার পা দুটো লম্বা, শরীর হালকা পাতলা। চেহারায় বড় একটি ক্ষত চিহ্ন। চেহারার দিকে তাকালে যে কোন লোক সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, যুগ যুগ ধরে নির্দয় ও নিষ্ঠুর লোকের যেসব শয়তানী বৈশিষ্ট্যের কথা প্রচলিত আছে, তা সবই তার মধ্যে রয়েছে। জেগার মুখোমুখী হওয়ার অর্থই হচ্ছে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়া।

"আমি এখ্খুনি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে, জেগার শাস্তির ধরন কি!"

সে জিমুকে পানি গরম করার 'বাষ্পঘরটির' কাছে উপুড় হয়ে শোয়ার নির্দেশ দিয়ে দানবের মত অট্টহাসি হেসে বলল ঃ "কুকুরের মত চার হাত–পা ছড়িয়ে পেট জমিন থেকে উঁচু করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো।"

জিমু একটি নবজাত শিশুর মত অসহায় ও লাঞ্ছনার ব্যাপক অনুভূতি নিয়ে তার নির্দেশ পালন করল।

ঠিক সে মুহূর্তে কারারক্ষীরা জিমুদের বন্দীশালা থেকে আসেফ, কেকী ও বেজুকে নিয়ে এলো। বেজু সবার শেষে ছিল। সার্বীয় 'হত্যাকারী গ্রুপের' সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য নেকসিয়া। সে বেজুকে ধাক্কা মারতে মারতে পাশের কামরায় নিয়ে গেল। তার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল মারপিট, আর্তনাদ, বিলাপ ও চিৎকার ধ্বনি। আসেফকে জিমুর পজিশনেই 'বাষ্পঘরের' অন্য প্রান্তে দাঁড় করালো। সবচেয়ে দীর্ঘদেহী গার্ড

ডোকা। তার বর্বরতাও প্রসিদ্ধ। সে কেকীকে রুমের মধ্যখানে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। অতঃপর জাম্প মেরে বাতাসে উড়ে গিয়ে নিজের ২৫০ পাউণ্ড ওজনের ভারী দেহটা কেকীর পেটে ও পাঁজরের উপর নিক্ষেপ করলো। কেকীর পাঁজরটা চর চর করে ভেঙ্গে যাওয়ার শব্দ পুরো কামরায় ছড়িয়ে পড়ল। আরেকজন হায়েনা, যার মাথায় একটা ফিতা বাঁধা ছিল, বিদ্যুতের মোটা তারের তৈরী একটি ডাণ্ডা দিয়ে আসেফকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে আরম্ভ করল। জেগা জিমুর মাথা ও কোমরের উপর মাথায় ইস্পাত লাগানো একটি ডাণ্ডা দিয়ে বিরামহীনভাবে আঘাত করতে লাগল। জিমু আঘাতের প্রচণ্ডতাকে হ্রাস করার জন্য মাথাটা নুইয়ে দিল। ফলে অধিকাংশ আঘাত ডান হাতে পড়তে লাগল। জেগারের চোখে মুখে ঘৃণার ভাব ছড়িয়ে পড়ল। সে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। জিমুর মাথা ফেটে রক্তের ধারা ফ্লোরের উপর ছড়িয়ে পড়লো। অল্পক্ষণের ভেতরেই সেখানে গভীর লাল রঙের একটি পুকুর সৃষ্টি হয়ে গেল। এ বর্বর কর্ম চালাতে চালাতে জেগা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তখন সে ক্লান্তি দূর করার জন্য কিছু সময় বিশ্রাম নিলো। কিছুক্ষণ পরই আবার সে শুরু করলো তার বর্বর নির্যাতন।

বন্ধু বটে

সবার অজান্তে কখন যেন সার্ব সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত একটি লোক দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এ লোকটির নাম সাপোঞ্জা। সে প্রেজডোরের একজন প্রসিদ্ধ ফুটবল তারকা। তার সাথে জিমুর খুবই সদ্ভাব ছিল। সে বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল ঃ "হাঁ, তুমিই তো আমার পুরাতন বন্ধু জিমু! আমি যখন পেকরাক ও লীপাক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছিলাম, তখন তুমি এখানে প্রেজডোরে বসে খুব মজা করছিলে, তাই না!"

এ বলে সে জিমুর মুখের উপর একটা জোরদার ঘুষি বসিয়ে দিল এবং সাথে সাথে ভারী ফৌজী বুট পরিহিত পা দিয়ে জিমুর বুকের উপর এত জোরে লাথি মারতে লাগল যে, জিমুর মনে হলো যেন তার পাঁজর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। জিমু ভূমিতে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক কষ্টে নিজের হাঁটু ও বাহুর সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতে লাগলো। কারণ, সে জানে যে, যদি একবার সে পড়ে যায়,

তাহলে আর উঠতে পারবে না। তার মধ্যে বাঁচার এক অদম্য স্পৃহা কাজ করে যাচ্ছে। জেগা হিংস্র মাতালের মত হো... হো.... করে হেসে উঠল। সাপোঞ্জাকে হাত ধরে একদিকে নিয়ে গেল। অতঃপর নিজের বিশেষ লাঠি দিয়ে জিমুকে তুলো ধুনা করতে লাগল। রুমে ছড়িয়ে পড়া রক্তের বন্যা, ঘামের দুর্গন্ধ ও আহতদের গোঙ্গানীর আওয়াজ এসব নরপাষণ্ডদের মাতাল উত্তেজনাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। জিমুর চেহারায় এবার এমন একটা আঘাত লাগল যা পূর্বের তুলনায় এতই প্রচণ্ড যে, সে তার প্রচণ্ডতায় একদিকে সিটকে পড়ে গেল। তার মাথাটা নিজের শরীর থেকে বয়ে যাওয়া রক্তের ভিতর ডুবে গেল।

জেগা জিমুর চুল ধরে টেনে উঠালো এবং আঘাতে জর্জরিত তার ক্ষতবিক্ষত বিকৃত চেহারা দেখে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ "উঠ্ নাপাক কুকুর! এখান থেকে দূর হ... ! আমার চোখের সামনে থেকে সবাই দূর হ ! !"

জিমুর পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই মুশকিল, তবুও সে কোনভাবে দরজার দিকে এক পা, এক পা করে অগ্রসর হল। আসেফ এবং কেকীও জিমুর অনুসরণ করল।

"কুকুরের মত চার হাত–পা জমিনে রেখে সামনে যা।" জেগা রক্তপিপাসু হিংস্র দানবের মত হুংকার ছেড়ে বলল।

তার নির্দেশে তিনজনই মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে হোয়াইট হাউসের কাছে জমা ময়লা কাদা অতিক্রম করে আগে বাড়তে লাগল। তারপর তাদেরকে পঁচা দুর্গন্ধময় অপবিত্র নর্দমার পানিতে গোসল করতে বলা হল। তারা নর্দমার পানিতে গোসল করতে লাগল এবং নিজেদের কম্পিত হাত দ্বারা মাথা, চেহারা ও শরীরে লেগে থাকা রক্তগুলো ধুইয়ে সাফ করলো।

"মনে হয় এসব খোকারা অনেক বেশী পঁচা মদ খেয়েছে। দেখো, ওদের চেহারা কেমন লাল টকটকে হয়ে গেছে।" জেগা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের এ বিদ্রূপাত্মক কথাগুলো বলে পাগলের মত হাসতে লাগল। অতঃপর তাদেরকে হাঁকিয়ে আবার হোয়াইট হাউসের দিকে নিয়ে গেল। ওখানে তারা স্লাভা একেমোভিচ্ নামের এক কয়েদীকে দেখলো। এ নির্যাতন কক্ষেই তাকে ইতিপূর্বে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। স্লাভা একেমোভিচ্ তাদের একজন ছিলেন যারা সর্বপ্রথম স্থানীয় সার্ব সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তার উপর এত

বেশী নির্যাতন চালানো হয়েছে যে, তার চেহারা পর্যন্ত চেনা যাচ্ছে না। সে 'বাষ্পকামরার' কাছে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। খানিক পরে সে মাথাটা উপর দিকে করলে জিমু তার চেহারার জায়গায় জায়গায় জমাট রক্ত দেখতে পেলো। তার মুখের চামড়াগুলো ছুরি দিয়ে ছিলে ফেলা হয়েছে এবং চোখের কাছে জমাট রক্তে ঢাকা দু'টি গর্ত দেখা যাচ্ছে। কারণ, তার চোখ দুটো সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলা হয়েছে।

"তোমাদের সবাইকে এবং তোমাদের বংশধরকে এভাবে নির্মূল করা হবে।" জেগা একজন সামরিক অফিসারের মত ঘোষণা করলো।

"আমরা এর মা-বাপ, ভাই-বোন সবাইকে জবাই করেছি, এখন এর বাচ্চাদের পালা। আর শুনো হে মুসলমান! তোমাদের সন্তানদেরকেও পালাক্রমে জবাই করা হবে।" এ বলেই সে ঘুরে জিমুর চেহারার উপর প্রচণ্ড বেগে একটা বুটের লাথি দিল। জিমু তার মুখ ও নাক থেকে জমাট রক্তের পিণ্ডকে টুকরো হয়ে উড়তে দেখলো। তার ভেঙ্গে যাওয়া দাঁতগুলো জিহ্বার মধ্যে ঢুকে পড়ল। এরপর আকস্মিকভাবে একটা নিরবতা ছেয়ে গেল এবং সব ধরনের মারপিট থেমে গেল। জিমু অনুভব করলো, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া এ নিরবতার মধ্য দিয়ে সামরিক উর্দিপরা একজন লোক কামরায় প্রবেশ করলো। তার প্রবেশের পূর্বেই যেন কোন নিরব নির্দেশনামার কারণে এ বর্বর নির্যাতন একদম থেমে গেল। কয়েদীদেরকে সেই দুর্গন্ধময় পঁচা ময়লা পানি দিয়ে হাত মুখ পরিস্কার করার নির্দেশ দেয়া হল। এরপর তাদেরকে তাদের নিজ নিজ বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেয়া হল। তবে স্লাভা একেমোভিচকে এরপর আর দেখা যায়নি।

জিমু সবার পূর্বে কামরায় প্রবেশ করল। দরজা খুলতেই ভেতর থেকে আসা কণ্ঠস্বর ও কানাঘুষা একদম থেমে গেল। একটা আশ্চর্য ধরনের নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। জিমু খুব কষ্টে নিজের বাহুটা উপরে উঠালো। তার মনে হল, যেন সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো তাকে রাস্তা দেয়ার জন্য সরে গেলো। এরপর একটি জোর চিৎকার ধ্বনি তার কানে প্রবেশ করলো ঃ 'আব্বু! আব্বু!'। জিমু জ্ঞান হারানোর পূর্বে নিজের শরীরকে তার ছেলে এরির বাহুবেষ্টনীতে আবদ্ধ অনুভব করল। তার চারপাশে একটা গভীর নিরবতা ও অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কিছুই অনুমান করতে পারল না, এ অজ্ঞান অবস্থায় কতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে। তবে যখন তার জ্ঞান ফিরতে শুরু করল, তখন সে নিজের

চেহারা ও শরীরে এক ধরনের শীতলতা অনুভব করলো। তার মনে হল, যেন অনেক দূর থেকে কিছু দুর্বোধ্য শব্দ ভেসে আসছে। নিজের চোখ দু'টো খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু ব্যথার তীব্রতা তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তর ভাগকে ছিন্ন–ভিন্ন করে ফেলল। তার চেহারা ও শরীরে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে তার চেতনা ফিরে এলো। চোখ দিয়ে দেখার সামর্থ্য ফিরে পেল এবং তার চার পাশে দাঁড়ানো লোকদের ভীড়ের মাঝে সবার পূর্বে যে দৃশ্যটি তার নজরে পড়ল তাহলো তার প্রিয় এরির অশ্রুভরা চেহারা।

সীমাহীন অসহায়ত্ব

তার শরীর ঠিক হতে প্রায় একমাস লেগে গেল। প্রথমে কয়েকদিন সে নিজের জায়গা থেকে নড়তেও পারেনি। তার ছেলে এরি অন্য আরো কয়েকজন লোকের সাহায্যে তাকে গোসলখানা পর্যন্ত নিয়ে যেত। জিমুর কাছে তার নিজের এ অসহায়ত্ব ও অপারগতা ভাল লাগছে না। সে প্রতিটি কাজের বেলায়ই অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু তার কাছে এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। খাওয়ার জন্য কেন্টিন পর্যন্তও যেতে পারছে না। সেজন্যই তার সঙ্গী–সাথীরা তার জন্য নিজেদের খোরাক হতে রুটির কিছু টুকরা বাঁচিয়ে নিয়ে আসে। কোন সময় বিস্কুটও নিয়ে আসে। এরি প্রতিদিন নিজের রেশন হতে অর্ধেক তার বাবার জন্য নিয়ে আসে। জিমু প্রথমবার যখন আয়না দিয়ে নিজের চেহারা দেখল, তখন চিৎকার দিয়ে উঠল। তার চেহারাটা গভীর যখম ও ভিতরের আঘাতের কারণে কালো নীল বর্ণ ধারণ করেছে। নাকের জায়গায় ফুলে উঠা একটি মাংসপিণ্ড দেখা যাচ্ছে, যার বিস্তৃতির কারণে চোখ দুটো প্রায় ঢেকে পড়েছে। সামনের কয়েকটি দাঁত ভেঙ্গে গেছে। কোমরের উপর অবিরাম আঘাতের কারণে তার রূপটাই পাল্টে গেছে।

পরে ডাক্তার ছাদেকোভিচ্ তাকে বললেন, তার নাক, একটি পাঁজর ও ডান হাতের কব্জি ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সবগুলোই ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি আরো বললেন ঃ "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, আপনি এ আঘাতটি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। নতুবা আমরা তো ভেবেছিলাম, আপনি হয়তঃ বাঁচবেন না। এখন আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আপনি একজন শক্ত দেহ ও শক্ত মনের অধিকারী মানুষ।"

ডাক্তার ছাদেকোভিচ্ কয়েদখানার দরজা থেকে কাঠের একটি টুকরা ছুটিয়ে তা দিয়ে হ্যাণ্ডলিং বানালেন এবং তারপর জিমুর শার্ট ফেঁড়ে তার ভাঙ্গা হাতের চিকিৎসার জন্য ব্যাণ্ডেজ তৈরী করে পট্টি বেঁধে দিলেন।

অব্যাহত নির্যাতন

আসেফের উপর এরপরও দু'বার নির্যাতন চালানো হয়। দ্বিতীয়বার মার খাওয়ার পর সে সোজা হয়ে শুতে পারতো না। কয়েক দিন পর্যন্ত একাধারে সে একটি চেয়ারে বসা ছিল। ঐ অবস্থাতেই সে কখনো নিজের বাহুটা চেয়ারের একটি হাতলের উপর রেখে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়তো, এটাই ছিল তার ঘুম। টয়লেটেও তাকে চেয়ারসহ নিয়ে যাওয়া হত। সামান্য সুস্থ হলে গার্ডরা তাকে তৃতীয়বারের মত বাইরে তলব করল, সেটাই ছিল তার জীবনের শেষ তলব।

কেকীর উপরও আরো দু'বার নিপীড়ন চালানো হয়। সে দু'বার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। একবার সে লোহার একটি ধারালো টুকরা দিয়ে নিজের গলার রগ কাটার চেষ্টা করে। আরেকবার সে গোসলখানার দরজার উপরের অংশের সাথে একটা তার বেঁধে ফাঁসির ফাঁদ তৈরী করে এবং নিজের গলাটা সেই ফাঁদে দিয়ে ঝুলে পড়ে। কিন্তু সময়মত গার্ডরা টের পেয়ে তার গলা থেকে সে ফাঁদটা খুলে ফেলতে সক্ষম হয়। এ তারটি, যা দিয়ে সে ফাঁসির ফাঁদ বানানো হয়েছিল, তা দিয়ে পাইপে মলমূত্র আটকে পড়লে পরিস্কার করা হতো। মলমূত্রের পাইপটি অধিকাংশ সময় বন্ধ হয়ে থাকতো। ফলে, কয়েদখানার পরিবেশ দুর্গন্ধময় ও অসহনীয় হয়ে পড়তো।

বেজুর উপর নেকসিকা নামের এক আস্ফালনকারী আমীরজাদা তিনবার নির্যাতন চালায়। শেষ বার নির্যাতন চালানের পূর্বে সে বেজুকে বলল ঃ "এবার আমি তোমাকে খতম করে দেবার মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু আমার মাতা তোমার প্রাণরক্ষার আবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার ছেলে–সন্তান রয়েছে, এজন্য তোমাকে যেন মেরে না ফেলি। তুমি এটাই ধরে নাও যে, তুমি একমাত্র আমার মার কারণে বেঁচে গেলে।"

এর কিছুদিন পর বেজুকে সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। তবে সে কোথায় আছে বা কি অবস্থায় আছে, কয়েদীরা কিছুই জানে না।

পুরাতন হিসাব নিকাশ

জেগা ও তার বদমাশ সঙ্গীদের আমারেস্কা ক্যাম্পে কোন যিম্মাদারী ছিল না। 'কেরাত্রাম বন্দী শিবির' ছিল তাদের কর্মস্থল। তবে তাদেরকে আমারেস্কা ক্যাম্পে বিশেষভাবে ডেকে আনা হতো, কারণ নির্যাতনে তারা অসাধারণ পারদর্শী। এমনিতেও বন্দী শিবিরগুলোর দ্বার যে কোন সার্ব রাজাকারের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাদের কোন কাংখিত ব্যক্তি শিবিরে থাকলে তারা তার সাথে পুরাতন হিসাব নিকাশ চুকিয়ে নিতো। সাধারণতঃ এ ধরনের হতভাগা সে সব মুসলমানই হতেন যারা সার্বদের পাড়া প্রতিবেশী ছিলেন। সার্বরা মুসলমানদের উপর কোন না কোন বাহানা বানিয়ে চরম নিপীড়ন চালাতো।

ইতিহাস বিকৃতকারী এসব নর পশুদের নিজেদের চেহারাও বিকৃত হয়ে পড়েছে। তাদের বিদ্বেষ ও বৈরিতায় পূর্ণ রক্তবর্ণ চোখগুলো তাদের কোমরে বাঁধা খঞ্জরের চেয়েও বেশী দ্রুতগতিতে নিজেদের শিকারের অন্তরকে চিরে ফেলতো। তাদের মনে যে শাস্তির কথা উদয় হত, তৎক্ষণাৎ তারা তা এসব নিরস্ত্র নিরীহ মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করতো।

মুসলমানদেরকে বেশী কষ্ট দিতো এলাকার সে সব ছোট খাটো বদমাশ ও মামুলী ধরনের গুণ্ডারা যারা নিজেদের শক্তি ও বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য সব সময়ই ব্যাকুল ও অস্থির থাকতো। রাতারাতি এরা তাদের মুসলমান প্রতিবেশীর চরম শত্রু হয়ে গেল।

যে ব্যাপারটা সে সময় খুবই মামুলি ছিলো এবং প্রায়ই ঘটতো তা হল, আপনি যে কোন সার্ব সেপাইকে ৫০ ডলার দিয়ে কাগজের এক টুকরায় আপনার কাংখিত বন্দীর নাম লিখে দিবেন। সে সেপাই তখন আপনাকে আপনার কাংখিত কয়েদীটি সোপর্দ করে দেবে। তারপর সে হতভাগ্য কয়েদী আর প্রভাতের আলো দেখার অবকাশ পেতো না।

জেগার লাগানো যখমগুলো সেরে ওঠার প্রাক্কালে 'বোসানকা কেস্টা জেনেকার' একজন হাজী সাহেব জিমুকে অনেক সাহায্য করেন। হাজী রমিজ! জিমুর খুবই নিকটে শুতেন। জিমু ও তাকে, যে কম্বলখানা সম্মিলিতভাবে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছিল, রমিজ নিজের অংশটা জিমুকে দিয়ে দেন এবং নিজের শোবার জন্য চামড়ার একটা পুরাতন ও ছেঁড়া জ্যাকেট বিছানা ও কম্বলরূপে ব্যবহার করেন। অথচ,

হাজী সাহেব নিজেও তখন মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। কয়েকমাস পূর্বে এক গাড়ী দুর্ঘটনায় তার পাঁজরের কয়েকটা হাঁড় ও ডান হাঁটুর অনেকটা অংশ ভেঙ্গে যায়। প্রেজডোর হাসপাতালে চিকিৎসার পর তিনি বাড়ীতে চলে আসেন। এর কিছুদিন পরই রাস্তায় চলাকালে সার্ব সেনারা তাকে গ্রেফতার করে আমারেস্কা ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তার ভাঙ্গা পায়ে লোহার রড ফিট করে দেয়া হয়। তিনি এখন অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে পারেন। তিনি জিমুকে বললেন ঃ

"আপনি ঘরে ফিরে যাওয়া মাত্রই একটা ভেড়ার তাজা চামড়া নিজের ক্ষত–বিক্ষত কোমরে কয়েকদিন পেঁচিয়ে রাখবেন, এ ধরনের আঘাত ভাল হওয়ার এটাই সর্বোত্তম পন্থা।"

বৃষ্টির দিনে অধিকাংশ সময় তিনি বলতেন ঃ "এটা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত, প্রবল বৃষ্টিধারা জমীনে বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ছিটানো রক্তের সমস্ত চিহ্নগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং বৃষ্টি বর্ষণ সে সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না সমস্ত লাশ ভাসিয়ে নেয়।"

আনন্দের দিন

জিমুর গ্রেফতারীর দু'মাস পর হঠাৎ একদিন সার্বরা যে সকল কয়েদীর বয়স ৬৫ বছরের উপরে এবং ১৮ বছরের নিচে তাদেরকে মুক্ত করে দিল। হাজী রমিজও মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল ছিলেন। জিমুর জন্য এ দিনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দের। কারণ, তার ছেলে এরি এবং তার চাচাতো ভাই ফুদুর ছেলে আলীজান–এর নামও মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের তালিকাভুক্ত ছিল। ঐ দিন প্রভাতে মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত লোককে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একত্রিত করা হলো। সেখানে তারা প্রখর ও প্রচণ্ড রোদের ভিতর পুরো দিন বসে কাটিয়ে দিল। ঠিক সন্ধ্যার সময় দু'টি বাস এসে এসব লোকদেরকে 'তারলোপোলে' শিবিরে নিয়ে যায়। এ শিবিরটিকে সার্বরা 'অভ্যর্থনা ক্যাম্প' নাম দিয়েছিল।

তারলোপোলে থেকে তাদেরকে পালাক্রমে নিজ নিজ গৃহে পৌছে দেয়া হয়। এরিকে ঘরে যাওয়ার জন্য ১৭ দিন পর্যন্ত 'তারলোপোলে শিবিরে' অপেক্ষা করতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়
জাহান্নামের পঞ্চম গহ্বর

প্রতিদিন সকালে বন্দীরা মারাত্মক দুর্ভাবনা, আতঙ্ক ও একটি ভীতিজনক পরিবেশে চোখ মেলে। দূর–দূরান্তের কোথাও এসব নৃশংসতা শেষ হওয়ার সামান্যতম আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। রাতের হাজিরা ; দিনের তদন্ত, টর্চার,মারপিট, চিৎকার ও গোঙ্গানী এসব কিছু একটা স্থায়ী রূপ ধারণ করে ফেলেছে। উপরন্তু, জেলখানার আমলাদের বন্দীদের দুঃখ–দুর্দশা, ব্যথা–বেদনাকে অবজ্ঞা করা, তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং বন্দীদের শরীরের দুর্গন্ধ, মাত্রাতিরিক্ত উকুন ও ছারপোকায় পরিবেশ বিষিয়ে তুলছে। সকলের পাঁজরের হাড়গুলো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। যুলুমের চাকায় নিষ্পেষিত হয়ে সবাই অন্যরকম হয়ে গেছে। তাদের চেহারাগুলোও যেন একই রকম। মারাত্মক দুর্বলতার কারণে তারা মৃতসম। সর্বদা অসহনীয় দুর্গন্ধ নাসিকারন্ধ্র দিয়ে তাদের শরীরে প্রবেশ করে, ফলে সবসময় তাদের মুখটা তিক্ত ও বিস্বাদ হয়ে থাকে। কারারক্ষীরা কখনো দরজা খুললে বন্দীরা সবাই দরজার দিকে মুখ করে বসে। তাজা হাওয়ায় শ্বাস–প্রশ্বাস নেয়ার তীব্র আশা তাদের ব্যাকুল করে তোলে। দরজা বন্ধ হলেই আবার সেই সীমাহীন পাশবিক বর্বরতার ধারা শুরু হয়ে যায়। বন্দীরা বাইরের তাজা ও পরিস্কার বাতাস গ্রহণ করার জন্য দরজার কাছে ভিড় করার চেষ্টা করতো। ফলে তাদেরকে দাণ্ডা ও রাইফেলের বাটের অতিরিক্ত প্রহার সহ্য করতে হত।

ধাবমান মৃত্যুর ছায়া

ছেজরাক এলাকার মুহাম্মাদ নামের এক বন্দী কয়েক দিন পর্যন্ত দরজার কাছে পড়ে রইল। মুহাম্মাদের বয়স ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। তার এক ভাই জার্মানে থাকে। বসনিয়ার অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে দু' বছরের ইনসুলেন (ঔষধের নাম)–এর ষ্টক একই সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার বাবা ও ছোট ভাই কারারক্ষীদের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করল, যেন তার ঔষধগুলো এখানে এনে ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু কোন লাভ হল না। তারা অনুমতি দিল না। মুহাম্মাদ ধীরে ধীরে দুর্বল হতে লাগল। তার সুন্দর চেহারা ধাবমান মৃত্যুর ছায়ায় এক আজব ধরনের ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করল।

অতঃপর সে একদিন তার ভাইয়ের কোলে মাথা রেখে ইহধাম ত্যাগ করলো। সবার সামনে তার শ্বাস-প্রশ্বাস আস্তে থেমে গেল। চারজন লোক মিলে তার মৃত দেহ বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় বন্দীরা সবাই দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার সম্মানে ও শোকে দাঁড়িয়ে থাকলো। তাদের এ নিরবতা তাদের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা বার বার ঘোষণা করল।

ঠিক একই দৃশ্য তারপর আরো অনেক দেখা গিয়েছে। পরপর সিফাত রামা ডানভেচ্, শামিল পেঝু, বিজা অঞ্চলের ছালজোগেনিক এবং জিমুভেচ্ সহ অনেককেই লাশ রূপে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। এ সকল মৃত ব্যক্তির লাশ বন্দীখানার সামনের লনে এনে রাখা হতো। সেখান থেকে হলুদ রঙের ভ্যানে করে অজানা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হতো। তবে সিফাত রামা জনভেচ্ (ইনি প্রেজডোরের একটি প্রসিদ্ধ রেষ্টুরেন্টের মালিক) এবং সালজোগেনিক-এর আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাদের লাশ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

মৃত্যুই যেখানে সহজ

আমারেস্কা বন্দী শিবিরে মৃত্যুই সহজ, জীবন অত্যন্ত কষ্টদায়ক। দূর-দূরান্ত থেকেও কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। কোযারার পর্বতমালার কোলে বিস্তৃত তৃণভূমিতে অন্ততঃ এ দিনগুলোতে একটিও সবুজ চারা ও পুষ্প দেখা যায় নি। জীবন সংগ্রামে যারা কমজোর তাদের বেঁচে থাকার কোন অবকাশই নেই। একমাত্র শক্ত দেহ ও বলিষ্ঠ শরীরের অধিকারী লোকরাই বেঁচে যায়। যাদের মনোবল শক্ত, সার্ব হায়েনাদের মর্মান্তিক শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে কিংবা যারা সার্বদের বিশেষ তলব থেকে বেঁচে যেত (যাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প) তারাই এ দুঃসহ জীবন সংগ্রাম থেকে মুক্তি পেয়েছে।

শিক্ষকের পুরস্কার

গণিত শিক্ষক আবদুল্লাহ পাস্কার। তার ছয় ফুট লম্বা শরীর দেখলে তাকে একজন বক্সার মনে হয়। শক্ত ও বলিষ্ঠ শরীরের অধিকারী। তার দুর্ভাগ্য, কারারক্ষীদের মাঝে তার একজন এমন প্রাক্তন ছাত্র পাওয়া গেল, যে ছাত্র জীবনে নিজের অনুপযুক্ততার কারণে শাস্তি পেতো। সে যখন প্রথমবার তার উস্তাদ আবদুল্লাহকে কেন্টিন হতে ফিরতে দেখল,

তখন তার চোখ দু'টো একদম জ্বলে উঠল। ব্যঙ্গ করে শিক্ষককে লক্ষ্য করে বলল ঃ "উফ প্রফেসর! কেমন সম্মানের কথা, তোমার সাথে এখানে এমন পরিবেশে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তোমার অনেক লেকচার শুনেছি এখন তোমাকেও আমার কিছু কথা শুনতে হবে।" এ বলে তাকে উপরের সে কক্ষে নিয়ে গেল। যেখানে তদন্তের নামে টর্চার করা হতো। সে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় তাকে টয়লেট পরিস্কার করার নির্দেশ দিল। এরপর যখনই সে ছাত্রটির নাইট ডিউটি পড়তো, তখনই সে আবদুল্লাহকে বাইরে ডাকত এবং তার উপর অমানবিক নির্যাতন চালাতো। একবার সে বিরামহীনভাবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আবদুল্লাহর মাথায় লোহার লাঠি দিয়ে প্রহার করতে থাকে পরে তাকে কয়েদখানার ফ্লোরের উপর আলুর বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলে বলল ঃ "আমি তোমার মগজ থেকে অংক বের করে ছাড়বো। এতে আমার জান চলে গেলেও পরোয়া নেই।"

আবদুল্লাহ এসব নির্যাতন, অপমান ও জুলুম অত্যন্ত সাহসকিতা, দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সাথে সহ্য করতে থাকেন। তার সঙ্গীরা প্রতিবার এ আশা নিয়ে তার ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিতো, হয়ত এটাই শেষ নির্যাতন। কিন্তু না অন্য এক রাতে সেই নরাধম ছাত্রটি আবদুল্লাহকে পুনরায় তলব করল। আবদুল্লাহ নিজের শোয়ার জায়গায় নিজের জিনিসগুলো রেখে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। এরপর সে আর ফিরে এলো না। শোনা গেছে, সেই ছাত্রটি আবদুল্লাহকে খুবই কষ্ট দিয়ে শেষ পর্যন্ত ছুরি দিয়ে জবাই করেছে।

সেবার মূল্য

ইদরিস জেকোভিচ্‌ও প্রেজডোরের একজন প্রসিদ্ধ মানুষ ছিলেন। তার উপরও সবসময় নির্যাতন চালানো হয়। বহুবার তাকে তদন্তের নামে ডেকে নেয়া হয় এবং প্রতিবারই তিনি মারাত্মক রূপে আহত হয়ে ফিরে আসেন। একবার কারারক্ষীরা তার একটি বাহু কনুইয়ের উপর হতে এমনভাবে ভেঙ্গে ফেললো যে, হাড্ডি মাংস কেটে বেরিয়ে পড়ল। হাসান আলছেক নামের এক বন্দী তার হাড়টা জোড়া লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো এবং সে অনেকাংশে সফলও হল। ইদ্রিসের অসহনীয় ব্যথাটা ক্রমশঃ কমতে লাগল। হাসান কাঠের কয়েকটি টুকরা সংগ্রহ করে তা

দিয়ে একটা হ্যাণ্ডলিং বানালো এবং একটা পুরাতন টি–শার্ট দিয়ে ব্যাণ্ডেজ তৈরী করে দিল। কিন্তু হাসানকে এ সেবা–শুশ্রূষার চরম মূল্য দিতে হলো। এক রাতে হাসানকে একজন গার্ড দরজার সামনে ডাকল এবং বলল, আমারেস্কা রেডক্রসের কয়েকজন প্রতিনিধি তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছে, তাই সে তাকে নিতে এসেছে। হাসান গার্ডের সাথে বেরিয়ে পড়ল। এরপর সে আর ফিরে এলো না। তাকেও সার্বরা অন্য জগতে পাঠিয়ে দিল।

চরম পাশবিকতা

যেসব হতভাগা কয়েদী কারারক্ষীদের পাশবিক নির্যাতন সহ্য করতে পারেনি তাদের মধ্যে মোটর সাইকেল পাগল মাহমুদ জাসকো ও তার পুলিস বন্ধু আমিরও ছিল। কারারক্ষীরা তাদেরকে এক রাতে বারোটার সময় বাইরে নিয়ে উলঙ্গ করে লোহার রড দিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগল। অতঃপর আরো দু'জন কয়েদীকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল এবং তাদের গলার উপর ধারালো ছুরি চেপে ধরে নির্দেশ দেয়া হল, তারা যেন কোযারকের এ দু'জন নওজোয়ান (মাহমুদ জাসকো ও তার বন্ধু আমির)–এর পুরুষাঙ্গ দাঁত দিয়ে কামড়ে কেটে ফেলে, অন্যথায় ছুরি দিয়ে তাদের গলা কেটে ফেলা হবে। তারা নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যনিরুপায় হয়ে সার্বদের নির্দেশ পালন করল ফলে মাহমুদ জাসকো ও আমীর অসহ্য নির্যাতন ও যুলুমের শিকার হয়ে ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল। কিন্তু এ দু'জন বন্দীকেও তারা রেহাই দিল না। ছুরি দিয়ে তাদের গলাও কেটে ফেলল। তাদের হৃদয় বিদারক চিৎকার ধ্বনিতে সমস্ত ক্যাম্পটা প্রকম্পিত হয়ে উঠছিল। এ ধরনের মারাত্মক ও অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে আরো অনেককে হত্যা করা হয়। সব মিলিয়ে প্রেজডোরের প্রায় এক হাজার লোককে আমারেস্কা বন্দী শিবিরের লোমহর্ষক পাশবিকতা সহ্য করে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

ডাক্তার ছাদেকোভিচ্ বলতেন ঃ "যে সব নিপীড়িত লোকদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, এরা ছিল জাতির জন্য গৌরবের বস্তু। এসব বর্বরতার পর এ অঞ্চলটিকে আমারেস্কা না বলে 'ভয়ংকর মৃত্যুপুরী' বলে স্মরণ করা উচিত।"

জিমুরও খেয়াল তাই, এখন এ এলাকাটির নাম 'ভয়ংকর মৃত্যুপুরী'ই হওয়া উচিত। ডাক্তার সাহেব যা বলেছেন, তাই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে।

ছান্নাদ ও নায্‌যাদ

প্রেজডোরের প্রসিদ্ধ শিল্পী হাল্লাদ মুছলেমোভিচ্–এর দু' ভাই ছান্নাদ এবং নায্‌যাদও এই ক্যাম্পে বন্দী ছিল। কারারক্ষীরা ছান্নাদকে অধিকাংশ সময় কষ্ট দিতো। একবার জিজ্ঞাসাবাদের পর সে যখন ফিরে আসছিল তখন একজন গার্ড তার হাতে একটি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো এবং অন্যজন ছুরি দিয়ে তার কোমরের মাংস কাটতে লাগল। অতঃপর বিদ্যুতের তার দিয়ে তার পা দুটো বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে প্রহার করে করে তাকে রক্তে রঞ্জিত করে ফেললো। ছান্নাদ এসব নির্যাতন কোনভাবে সহ্য করলেও তার ওজন ষাট পাউণ্ড কমে গেল।

নাজ্জাদ ত্রিশ বছরের এক দীর্ঘদেহী ও সুদর্শন যুবক। তার মাথার চুলগুলো ছিল দারুন আকর্ষণীয়, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। একজন গার্ড উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাকে ধরে নিয়ে ছুরি দিয়ে তার চুলগুলো কেটে দিল। তার মাথায়ও কয়েক জায়গায় যখম করল, অতঃপর তাকে নির্দেশ দেয়া হল, সে যেন তার ভাই হাল্লাদ মুসলেমোভিচ্ এর সেই প্রসিদ্ধ গানটি পরিবেশন করে শোনায় যার মৌলিক কথা হচ্ছে ঃ "আমার বসনিয়া ক্রন্দন করছে"। নাজ্জাদ বাধ্য হয়ে সে গানটি তাকে গেয়ে শোনালো।

বেশ কিছুদিন পর তাদের দু'ভাইকে জিমুদের কয়েদখানায় স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে এসে তারা নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পায়।

গোবরে পদ্মফুল

অবশ্য সব গার্ড একই ধরনের নির্দয় ও রক্তপিপাসু ছিল না। তাদের মাঝে কিছু ভাল লোক অবশ্যই ছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন রহমদীল লোককে আমারেস্কা ক্যাম্পে বেশী দিন টিকতে দেয়া হলো না। সাধারণতঃ এ ধরনের লোকদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দেয়া হত। দ্রোনিতাও গ্রেডলিস্কের রণাঙ্গনে গমনকারী এসব লোকদের সংবাদ খুব কমই পাওয়া যেত।

এসব রহমদীল ও মানবতাবাদী লোকদের মাঝে একজন ছিলেন

সুটুল। ঘটনাক্রমে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত আমারেস্কা বন্দী শিবিরে ছিলেন। তার বাড়ী ছিল প্রেজডোরে। বন্দীরা সবাই তাকে চিনে। তিনি যথাসম্ভব নিজের শহরের লোকদেরকে সাহায্য করতেন। অথচ তিনি ভাল করেই জানতেন যে, যারা মুসলমান ও ক্রোটদেরকে সাহায্য করে, সার্বরা নিজের জাতি ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে কড়া শাস্তি প্রদান করে।

তিনজন সার্বের উপর মুসলমান ও ক্রোটদেরকে সাহায্য করার অভিযোগ আনা হয়। তাদের সবাইকে আমারেস্কা ক্যাম্পে ধরে আনা হয়। তারা হলেন ঃ আগোরকণ্ডক, তার স্ত্রী জাদরাংকা এবং অপরজন হলেন ড্রেস্কোলোজক। জাদরাংকা দু' মাস পর মুক্তি পান। তার পনের দিন পর ড্রেস্কোলোজক মুকাদ্দমার শাস্তি ভোগ করার জন্য বানজালুকা প্রেরিত হন। তবে আগোরকে বিভিন্ন ধরনের নৃশংসতা চালিয়ে হত্যা করা হয়। তার পিতা আমারেস্কা এলাকারই অধিবাসী ছিলেন।

তবে গার্ডদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মানুষটি হচ্ছেন যেলেজকো। বন্দীরা তাকে মহব্বত করে 'যিগি' বলে ডাকতো। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। আমারেস্কার একটি পেট্রোল পাম্পে তার হিস্সা আছে। তিনি কখনো কোন কয়েদীর উপর হাত তুলেন নি। তার ডিউটি ছিল জিমুদের কয়েদখানার একটি খিড়কির নিচে। তিনি অধিকাংশ সময় রুটির টুকরা অথবা গাছ থেকে সদ্য ছেঁড়া তাজা আলু বুখারা খিড়কী দিয়ে ভিতরে নিক্ষেপ করে দিতেন। জিমু এবং তিনি উভয়ই একজন অপরজনকে পূর্ব থেকেই চিনতেন। বরং তাদের মাঝে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। আমারেস্কা শিবিরে নিয়োগের প্রথম দিনেই তিনি সমস্ত কয়েদীদের সামনে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন ঃ "জিমু! তুমি হলে বন্দী, আর আমি হলাম গার্ড। কিন্তু, তোমার সাথে পূর্বেও যেমন বন্ধুত্ব ছিল, এখনো তা বজায় থাকবে।" এ বলে তিনি পরম আবেগভরে জিমুর সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং আরও বললেন ঃ "দোস্ত! আমার যতটুকু সাধ্য, আমি তোমার জন্য করবই। তবে কোন মোজেযার আশা না করাই বাঞ্ছনীয়।" জিমু লক্ষ্য করলো যে, একথাগুলো বলার সময় তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার দাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর যিগি মাঝে মধ্যে নিজের ঘর থেকে খানা প্রস্তুত করে নিয়ে আসতেন এবং চুপে চুপে জিমুর কাছে পৌঁছে দিতেন। কখনো তিনি জিমুকে সঙ্গে

করে ক্যান্টিনে নিয়ে যেতেন এবং তার নির্ধারিত হিস্‌সা থেকে বেশী খাদ্য দিয়ে দিতেন। এছাড়া তিনি জিমুর ঘর থেকে জিমুর স্ত্রী ইলমা ও ছোট্ট ছেলে ডেনীর চিঠিপত্রও নিয়ে আসতেন। তিনিই সবার পূর্বে জিমুর ছেলে এরির টারনোপোলে শিবির থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

একদা জিগি জিমুদের জানালার ফ্রেমের উপর নিজের বন্দুক দিয়ে মৃদুভাবে খট্‌খট্‌ করলেন এবং অন্যান্য গার্ডদের অগোচরে খুবই আস্তে আওয়াজ দিয়ে জিমুকে লক্ষ্য করে বললেন, সে যেন নিজের মাথাটা জানালার ভাঙ্গা অংশের কাছে নিয়ে আসে, কারণ তিনি তার সাথে একটা জরুরী কথা বলতে চান। খিড়কীটা ছিল খুবই উঁচুতে। জিমু একটি পা বাষ্পদানীর উপরে রাখল এবং নিজের শক্ত হাত দিয়ে জানালার ফ্রেমটা ধরে খুবই কষ্টে নিজের মাথাটা ভাঙ্গা গ্লাস পর্যন্ত নিয়ে এলো।

"আমি পনের মিনিট পর তোমাকে পুনরায় আওয়াজ দেব। আমার কাছে তোমার জন্য একটা সুন্দর উপহার আছে।" যিগি চোখ মেরে তাকে বললেন।

সত্যিই পনের মিনিট পর তিনি জিমুকে প্লাষ্টিকের একটি মুখ বন্ধ বড় পাত্র দিলেন। পাত্রটি রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল। অতঃপর যিগি বললেন ঃ "এটা নিজের সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে খাও। খেয়ে পাত্রটা আমাকে দিয়ে দেবে।"

পাত্রটি মেক্রোনী ও ভুনা গোশত দিয়ে ভরা ছিল। পরে একদিন যিগি জিমুকে বললেন ঃ "এ খানাটি আসলে গার্ডদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে দিবসটি ছিল স্থানীয় একটি ছুটির দিন এবং নিয়ম অনুসারে ভুনা গোশত ও আলু বুখারা দিয়ে বানানো ব্রাণ্ডির বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। সে কারণে এগুলো বেঁচে যায়।" এভাবে কারারক্ষীদের জন্য প্রস্তুতকৃত আহার দিয়ে কয়েদীদের শুকনো সংকোচিত পাকস্থলিগুলো অনেক দিন পর কিছুটা সজীব হয়ে উঠল।

যিগি যখনই জিমুর জন্য খাবারের কোন জিনিস আনতেন, তখন তাকে বলে দিতেন, সে যেন সেখান থেকে কিছু অংশ তার প্রতিবেশী ব্লাদাকে অবশ্যই প্রদান করে। জিমুর ঘরের পরে ছিল একটি ঘর, তারপরেই হল ব্লাদার ঘর। তিনি খুবই সৎ ও নিষ্ঠাবান লোক। তিনি সবসময় অন্যের উপকারের চিন্তাই করতেন।

একদিন রাতের তৃতীয় প্রহরে একজন গার্ড ব্লাদা, হুকো, আমীর ও সাবুকে হোয়াইট হাউসের সেই কুখ্যাত নির্যাতন রুমটিতে নিয়ে গেলো। পরের দিন হোয়াইট হাউসের পাশের কয়েদখানার একজন বন্দী জিমুকে বলল, সে নিজ হাতে ব্লাদার মৃতদেহ হলুদ ভ্যানে উঠিয়ে দিয়েছে। জিমু এ ঘটনা যিগিকে শোনালে তিনি খুবই মর্মাহত হন এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। পরের দিন ডিউটিতে এসেই যিগি জিমুকে ডাকল এবং খুবই দৃঢ়তার সাথে বলল ঃ "জিমু! তুমি নিজের খেয়াল রাখবে। আমি প্রতিদিন এসে সর্বপ্রথম নামের তালিকা দেখব। যদি আমি কখনো তোমার নাম সেই বিশেষ তালিকায় দেখি, তাহলে তোমার পূর্বে আমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

মানবরূপী দানব

ঘটনাক্রমে যিগি গার্ডদের সেই কুখ্যাত গ্রুপের সাথে ছিল, যাদের নেতা মোটা হওয়ার কারণে পুরো গ্রুপটিকে 'কারকান শিফট' বলা হতো, তবে লোকেরা এ গ্রুপটিকে 'আতঙ্ক শিফট' বলেও আখ্যায়িত করতো। এ গ্রুপের দু'জন গার্ড ছিল খুবই হিংস্র ও পাষাণ হৃদয়। তাদের সঙ্গীরা তাদের একজনকে 'পাছপ্লেজ' ও অপরজনকে 'ছোছক' বলে ডাকতো। এরা ছিল মানবরূপী দানব। শুধু নিজের আত্মার তুষ্টির জন্য নিরীহ লোকদেরকে কতল করতো। কোন বন্দীর জীবন শেষ করার জন্য এতটুকু যুক্তিই যথেষ্ট ছিল যে, তাদের কাছে সেই বন্দীর চেহারাখানা কিংবা তার চলার ভঙ্গিটা ভাল লাগেনি।

একবার রেডার ফুটবল ক্লাবের প্রখ্যাত কোচ ও খেলোয়াড় বাজরাম গাগ–কে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে কয়েদীদের কাছ থেকে দু'শ জার্মান মার্ক জমা করার নির্দেশ দিল। দশ মিনিট পর তারা এসে অর্থ সমর্পণ করতে তাগাদা করল। গাগ তাদের জানিয়ে দিল, "তার কাছে তাদের কাংখিত টাকা নেই এবং সে নিজে তার সঙ্গী কয়েদীদের কাছ থেকে অর্থ জমা করার কোন চেষ্টাও করেনি। কারণ, কয়েদীদের কাছে এখন আর কানাকড়িও পাওয়া সম্ভব নয়।"

গাগের বক্তব্য শুনে তারা ক্রোধে আগুন হয়ে গেল। কয়েদীদেরকে পিছনে হটে যাবার নির্দেশ দিল। ছোছক দরজার কাছে নিজের রাইফেল লোড করল এবং ট্রিগারের উপর আঙ্গুল রেখে দাঁড়িয়ে রইল। পাছপ্লেজ

গাগকে নির্দয়ভাবে মারতে লাগল। নির্যাতনের প্রচণ্ডতায় দণ্ডায়মান কয়েদীদের সকলের হৃদয়ই টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ করে গাগ ভীত-সন্ত্রস্ত ও নির্যাতনে অতীষ্ঠ হয়ে পিছনের দিকে সরে গেলো এবং নিজের হাত দুটো উপরে উঠিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কয়েদীদের উপর দিয়ে লাফিয়ে বাতাসের মধ্যে উড়ে গিয়ে জানালার গ্লাসের সাথে জোরে টক্কর খেলো। এতে করে জানালার কাঁচগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে নিচে ছড়িয়ে পড়ল। গাগ তাড়াতাড়ি কাঁচের একটা টুকরা হাতে উঠিয়ে নিল এবং তা দিয়ে নিজের হাতের কব্জির রগ কেটে ফেলতে লাগল, যেন দ্রুত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে এসব জালেমদের বিরামহীন নৃশংসতা হতে মুক্তি পাওয়া যায়। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে কয়েকজন কয়েদী দৌড়ে গিয়ে গাগের হাত থেকে কাঁচের টুকরা ছিনিয়ে নিল। কিন্তু এরপরেও সে দু'জন নরপাষণ্ড গাগকে রেহাই দিল না, তাকে বাইরে নিয়ে গেল। এরপর আর কেউ তাকে দেখেনি।

ঠিক এরূপভাবে একবার একজন সার্ব হায়েনা নিজের পাশবিক দানবতা চরিতার্থ করার জন্য বারাকু বারাঝোভিচ্-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সে দুপুরের আহারের পর অন্য কয়েকজন বন্দীর সাথে বাইরে খোলা জায়গায় বসেছিল। বারাকু এ অঞ্চলে যুগোশ্লাভিয়ার সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতো। গার্ড বলল ঃ "তাহলে তুমিই হলে সেই বারাকু, যে ফৌজী ভর্তি করতে?"

"হাঁ, আমিই সেই বারাকু"। বারাকু একটা অভিনব ভঙ্গিতে শুষ্কমুখে জবাব দিল।

"হারামজাদা! তোর কি মনে আছে, তুই আমাকে আর্মড ডিভিশনে পাঠাতে অস্বীকার করেছিলি, প্রস্তুত হ, এখনই তোর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় এসে গেছে।" এ বলে তাকে ধরে হোয়াইট হাউসের সেই নির্যাতন কক্ষে নিয়ে গেল। এরপর তার আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

বদনসীব কয়েদী

প্রতিদিনই নতুন কয়েদী শিবিরে আনা হত। বাস থেকে অবতরণ করার সাথে সাথেই তাদের উপর নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালানো হত। অনেক বদ নসীব কয়েদী কয়েদখানা পর্যন্ত পৌছারও সুযোগ পেতো না।

গার্ডরা এ সব নিরস্ত্র বন্দীদের মস্তক পাকা দেয়ালের সাথে এত জোরে মারতো যে, একটা বিভীষিকাময় শব্দের সৃষ্টি হত। মাথার মগজ ছিটে পড়ার, হাড়গুলো গুড়ো হয়ে যাওয়ার ও ছড়িয়ে পড়ার আওয়াজ ভেসে আসতো। .... তার সাথে সাথে মৃত্যুগামী কয়েদীদের হৃদয়বিদারক চিৎকার এবং মরণগোঙ্গানীর শব্দ... যে আওয়াজ শুনে বন্দী শিবিরে বিদ্যমান কয়েদীদের হৃদয় ভয়ে আঁতকে উঠতো।' বিকট চিৎকার ধ্বনিতে তাদের কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো। একটা আতঙ্ক তাদের আত্মা, হাড়, গোস্ত ও শিরাসমূহকে বিদীর্ণ করে অতি গভীরে ঢুকে পড়তো। শরীরগুলো ঘামে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে যেতো। মনে হত এ এলাকার প্রতি ইঞ্চি মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হয়তঃ যুদ্ধের সময় সবকিছুই বৈধ। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের যে বিভীষিকাময় দৃশ্য আমারেস্কা নির্যাতন শিবিরে দেখা গেছে, তার ভয়াবহতা ও নৃশংসতা বর্ণনা করা কোন ভাষা দিয়েই সম্ভবপর নয়। সবচেয়ে মারাত্মক ও হৃদয় বিদারক দৃশ্য ছিল মুসলমান বালিকা, যুবতী ও বয়স্কা মহিলাদের সার্ব আর্মি কর্তৃক ধর্ষিত হওয়া, অতঃপর তাদেরকে অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা। নির্যাতনের বিভিন্ন পদ্ধতি এসব অস্ত্রহীন মযলুম নারীদের উপর প্রয়োগ করা হতো, যা লিখতে গেলে হাত কেঁপে উঠে। তাদের হাত থেকে আট বছরের বালিকা হতে ষাট বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউই রেহাই পেতো না।

মাজেকা প্রেজডোরের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। খুবই হাস্যরসিক। প্রায়ই তিনি খুব সত্য একটা কথা বলতেন। তিনি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে সর্বপ্রথম নিজের চেহারা ও শরীরটা হাতিয়ে দেখতেন এবং পরে বলতেন; "হাঁ, সব ঠিক আছে, আমি আজও বেঁচে আছি।"

দু' তিন মাস পর তিনি বন্দী শিবির থেকে রেহাই পান। কিন্তু, কয়েক দিন পরই হার্টফেল হওয়ার কারণে মারা যান। কেননা, প্রেজডোরে তার রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপথ্য ছিল না এবং সেখান থেকে বের হওয়ারও অনুমতি ছিল না। তার বয়স ছিলো মাত্র ত্রিশ বছর।

বর্বরতায় কলুষিত আত্মা

বন্দীরা বলতো, "এসব গার্ডদের আত্মাগুলো হিংসা, বিদ্বেষ ও বর্বরতায় কলুষিত হয়ে গেছে। এদের খোরাক আম–মযলুম কয়েদীদের

অসহায় প্রাণ। কিন্তু তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, আমাদেরকে সমূলে বিনাশ করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।”

কোন বন্দীকে মোটর অয়েল পানে বাধ্য করার সেই ভয়ানক দৃশ্য, কিংবা নিরস্ত্র ও অসহায় কয়েদীদের মাথায় গুলি মারার পর দর্শকদের কাছ থেকে বাহবা কুড়ানোর তাগাদা, কিংবা প্রেজডোর ফুটবল টিমের গোলরক্ষক দাররাতের ঝলসে যাওয়া চেহারায় ছেয়ে যাওয়া সেই আতংক যখন তার মাথাটা একটা জ্বলন্ত টায়ারের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিংবা একজন কংকালসার কয়েদী, যে না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, যার শরীরে হাড্ডি ছাড়া আর কিছু নেই, সেই বন্দীটি যখন একটি মরা কবুতর খাওয়ার চেষ্টা করছে, অথবা সে সব ক্রন্দনরত শিশুদের গড়িয়ে পড়া অশ্রুধারা, যাদের পিতাকে ধারালো খঞ্জর দিয়ে জবাই করে, তাদের শরীরকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হচ্ছে আর সেই লোমহর্ষক দৃশ্য দেখানোর জন্য এসব কিশোরদেরকে দাঁড় করে রেখেছে... এ ধরনের বিভীষিকাময় দৃশ্য ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একের পর এক নির্যাতন এবং মৃত কয়েদীদের লাশ থেকে ছড়িয়ে পড়া দুর্গন্ধ, এসব মনের মাঝে এতই মারাত্মক প্রভাব ফেলতো যা কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্তর সবসময় আতঙ্কে দুরু দুরু করত। বসনিয়ার প্রসিদ্ধ কবি ইজ্জত সিরাজ লক-এর একটি কবিতা জিমুর মনে পড়ল ঃ

তারা আটাইশ জন ছিলেন,
কিংবা, হয়ত পাঁচ হাজার আটাইশ জন,
কিংবা হয়তঃ তার চেয়ে বেশী।
একই মালায় গাঁথা ছিলেন সে সব মুক্তিপাগল শহীদানরা,
তারা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে সন্তানের বাপ হয়ে যেতেন
কিন্তু, তারা তো সবাই সার্ব কসাইখানায় জবাই হয় গেছেন
সবাই দাফন হয়ে আছেন কবরের ভিতর
হে আমার প্রাণাধিক মুসলিম গাজীরা!
এসো, আজ রজনীতে আমরা একজন আরেকজনকে আলিঙ্গন করি
স্মরণ করি সেসব অজানা শহীদানকে॥

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাহান্নামের ষষ্ঠ গহ্বর

আমারেস্কা ক্যাম্প কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পরিবেষ্টিত নয়। কিন্তু পাথর দিয়ে নির্মিত কিল্লার ন্যায়, খুবই মজবুত ও সুরক্ষিত। এ ক্যাম্পটিকে তিনটি সংরক্ষিত এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রথম এলাকা ক্যাম্পের ভিতর, তার পঞ্চাশ গজ দূরে দ্বিতীয় সংরক্ষিত এরিয়া। এ দু'টি এলাকাই ক্যাম্পের ভিতর। এর আরো পঞ্চাশ গজ দূরে তৃতীয় সংরক্ষিত এলাকাটি অবস্থিত। আর এটা ক্যাম্পের বাইরে। প্রতিটি এলাকায় ত্রিশ জন করে সশস্ত্র প্রহরী বা গার্ড রয়েছে। প্রথম গ্রুপ দু'টি ক্যাম্পের ভিতরে বিদ্যমান বন্দীদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য এবং তৃতীয় গ্রুপটি ক্যাম্পের উপর কোন হামলা হলে তা প্রতিহত করার জন্য। এ তিনটি বাধা অতিক্রম করে পলায়ন করা একেবারেই অসম্ভব। এ তিন অংশেই সদাসর্বদা প্রহরীরা সতর্ক পাহারায় থাকে।

দুঃসাহসী দুই বন্দী

দু'জন দুঃসাহসী বন্দী এ তিনটি বাধা অতিক্রম করে পলায়ন করতে সক্ষম হলেও তাদের একজনকে কাছেই অবস্থিত সার্ব অধ্যুষিত এলাকা গ্রেডেনার লোকেরা ধরে ফেলে। তাকে ক্যাম্পে এনে সাথে সাথে জবাই করা হয়। অপরজন আমারেস্কা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত ধ্বংস বিধ্বস্ত গ্রাম কোযারোসায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। এটা তাদেরই গ্রাম। সার্বরা গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। কোথাও কোন প্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সেই পলাতক বন্দী প্রায় মাসখানিক এখানকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। একদিন সে নিরাপদ মনে করে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়া। কিছুদূর যেতে না যেতেই হঠাৎ একটা টহলরত সার্ব সেনাদল তাকে দেখে ফেলল এবং তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়ে সে পড়ে গেল। সার্বরা তাকে ধরে পুনরায় আমারেস্কায় নিয়ে আসে। পরে তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে কেউ কেউ বলেছে, চিকিৎসার কোন সুযোগ না দেয়ার কারণে পায়ের যখমে বিষ ছড়িয়ে পড়লে সে মারা যায়।

এ ধরনের মৃত্যু অহরহ হচ্ছে। সার্বরা বন্দীদের উপর যেসব ধারালো কিংবা জং লাগানো অস্ত্র দিয়ে নিপীড়ন চালাতো, সে সব অস্ত্রের যখমগুলো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না হওয়ার কারণে এক–দু'দিনের মধ্যেই পঁচে রক্ত ও পানি পড়তো। এরপর ফুলে লাল মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হতো এবং পুঁজ উপরের চামড়া বেয়ে ফোটা ফোটা করে পড়তে থাকতো।

একবার একজন বন্দী তার মাথার যখম থেকে হাত দিয়ে এমন সব পোকা বের করে আনলো, যেগুলো সাধারণতঃ মৃতদেহ পঁচে সৃষ্টি হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তা সত্ত্বেও সেই বন্দীটি বেঁচে যায়। অনেক বন্দী মৃত্যুর এই ভয়ানক খেলা থেকে একমাত্র এ আশায় বেঁচে থাকতো যে, হয়ত একদিন এ নির্যাতনের নিকষ কালো রজনীর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

অন্য গ্রহের ভয়ানক জন্তু

স্বল্প আহারের দুর্বলতা, ডাল খাওয়ার ব্যাধি আর কমজোর মাকড়শার মত ঠ্যাং নিয়ে এসব মৃতপ্রায় জীবিত লোকগুলো খুব কষ্টেই নিজের জায়গা হতে নড়াচড়া করতে পারতো। ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত উকুন ও ছারপোকায় ভরা ছেঁড়াফাঁড়া কাপড় পরিধান করে এ কংকালসার মানুষগুলো ঘামে ভিজে খালি পায়ে যখন চলতো, তাদেরকে তখন অন্য গ্রহের কোন ভয়ানক জন্তু মনে হতো।

অসহ্য উত্তপ্ত রোদ, মাছির ভন্ ভন্ শব্দ, আর মাথা ও কাপড়ে জট পাকানো উকুন ও ছারপোকা!! এসবই তাদের বর্তমান জীবনের সেই ভয়াবহ বাস্তবরূপ যা তাদের সুখী সমৃদ্ধশালী পূর্বজীবনে তারা কখনো কল্পনাও করেনি। এদের মাঝে যারা প্রকৃতিগতভাবেও ধৈর্য ও সহনশীল এবং শোকরগুজার তারাও হিম্মত ও সাহস হারা হয়ে পড়েছে। নৈরাশ্য, অসহায়ত্ব এবং একটি ধারাবাহিক অপমান ও লাঞ্ছনার অনুভূতি ও হীনমন্যতা দিন দিন তাদের আত্মার গভীরে ঢুকে পড়ছে। আর সময়, এতো ধীরগতিতে চলছিলো যে, মনে হচ্ছে যেন তার চলার গতি একদম থেমে গেছে।

এ দিনগুলো বিনা অশ্রুতে ও বিনা শব্দে কান্নার দিন। দু'আ দুরূদ পর্যন্ত উচ্চারণ করার শক্তি ও মানসিকতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। মনে

হচ্ছে যেন বন্দীরা মুকাদ্দমার শুনানি ও দণ্ডাদেশ শ্রবণ করার পর ক্যাম্পের সব ধরনের কষ্ট সহ্য করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে। চতুর্দিকে একটা উদাসিনতা ও নৈরাশ্যের জাল বিস্তার করে আছে। যারা বেশী বয়স্ক কয়েদী তারা এবারের গরম মৌসুমের তুলনায় বেশী কষ্ট ও বেদনাদায়ক মৌসুম আর কখনো দেখেনি। কোযারা পাহাড়ের কোলে বেড়ে ওঠা ঘাসগুলো সূর্যের প্রচণ্ড তাপে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। রাতের বেলা লাকড়ীর মত বাঁকা আলোহীন চন্দ্রটা আকাশে দৌড়াতে থাকে। ক্যাম্পের মাঝে কয়েদীদের উলঙ্গ বক্ষে মৃত্যুটা বিন্দু বিন্দু করে তাদের অসহায় আত্মা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। গার্ডদের কাছে মৃত্যু এক খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাদের শরীরটা তীক্ষ্ণ ধারালো তলোয়ারের রূপ ধারণ করেছে এবং তাদের পদধ্বনি কয়েদীদের নিকট মৃত্যু ঘন্টার বলে মনে হতো। হাজার হাজার লোকের প্রাণ সার্ব হায়েনাদের মেশিনগানের ট্রিগারে রাখা আঙ্গুল, খঞ্জর ধরা হাত এবং আর্মি ড্রেসের পকেটে রাখা মৃত্যু পরোয়ানার কারণে কয়েদীরা সবসময় জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় ঝুলন্ত থাকতো। গার্ডরা মৃত্যুর পরোয়ানাটা ফালতু টিস্যু পেপারের মত ব্যবহার করতো। যে কোন লোকের বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করাটা তাদের কাছে বাম হাতের খেলা। প্রেজডোর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে আটক এসব মযলুম মুসলমানদের ভাগ্যে এ নির্মমতা একটা মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমারেস্কা বন্দী শিবিরে কোযারকের লোকদের সংখ্যাই বেশী এবং তাদেরই ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশী। তাদের ঘরবাড়ী প্রায়ই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এলাকার লোকদের অনেককে ঘটনাস্থলেই কতল করা হয়েছে। বাকী যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে তাদেরই প্রাক্তন সার্ব প্রতিবেশীদের রক্তপিপাসু তীক্ষ্ণ খঞ্জর ও আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে একটা দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক সফর পাড়ি দিতে হচ্ছে। তাদের সফর প্রেজডোরের আশপাশে অবস্থিত বারজিকানী, কারাত্রাম, টারনোপোলজী ও আমারেস্কা বন্দী শিবিরগুলোতে সমাপ্ত হয়।

আগ্রাসী মৃত্যুর ছোবল

আমারেস্কা বন্দী শিবিরে আনুমানিক দু' হাজার কোযারকের

অধিবাসীদের মধ্যে কাসেম গ্রাজডেংক নামের একজন দোকানদারও রয়েছে। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার ছেলে ছা'দও তার সাথে ছিল। ছা'দকে তার বন্ধুরা ছুদু বলে ডাকতো। তাদেরকে জিমুদের কয়েদখান্নার বাইরে ময়দানের একপ্রান্তে অবস্থিত হ্যাংগারে রাখা হয়। এসব লোকদেরকে তাদের গ্রামে গোলাবর্ষণের সময় কোযারার সেই পাহাড়ের ঘন বনজঙ্গলের দিকে পলায়নের সময় গ্রেফতার করা হয়। তারা ধাবমান মৃত্যুর ছোবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় দিশেহারা হয়ে পাহাড়ের ঘন জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ভাবছিল, গ্রামের উপর যে আপদ নাযিল হয়েছে তা থেকে তারা উদ্ধার পেয়ে একটা নিরাপদ স্থানে পৌছে যেতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত। তারা ভাবতেই পারেনি যে দিকে তারা যাচ্ছে সেদিকেই হাজার হাজার সার্ব সেনা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাদের অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে। হাজার হাজার লোকের সাথে সার্ব জমদূতের হাতে তারাও গ্রেপ্তার হয়। সেখানে তাদেরকে দু'দিন রাখা হয়। তাদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়। অনেককে জবাই করা হয়। মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হয়। পিতা, স্বামী, ভাই ও ছেলের সামনে তাদেরকে উলঙ্গ করে ধর্ষণ করা হয়। অনেক মহিলার স্তন কেটে খুবই কষ্ট দিয়ে শহীদ করা হয়। দু'দিন পর তাদেরকে আমারেস্কা ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। কাসেমের ভাই এবং তার তিন পুত্রও আটক লোকদের মাঝে ছিল। প্রথমে তাদেরকে 'ছাব্বিশ' নামক কয়েদখানায় রাখা হয়, এটা হ্যাংগারের উপরের অংশে অবস্থিত। এরপর তাদেরকে নিচে একটি বড় প্রশস্ত হলরুমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে পূর্ব হতেই প্রায় একহাজার কয়েদী নিজেদের বন্দীজীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। তাদের সিমেন্টের খালি ফ্লোরের উপর শুতে হতো। ফ্লোরের জায়গায় জায়গায় পেট্রোল ও মোটর অয়েল পড়ে ময়লা জমে আঠালো হয়ে গেছে। এগুলো থেকে একটা উৎকট গন্ধ পুরো হল রুমটিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এ হলরুমটি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাকী জায়গা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। হ্যাংগারের উপরে পঞ্চাশ জন করে থাকার ছোট ছোট বন্দীখানা। তার উপরে ছাদে যা ফ্লোর থেকে প্রায় ৪৫ ফুট উঁচুতে অবস্থিত, লোহার বড় বড় টুকরার ফাঁকা জায়গায় কবুতর বাসা বেঁধেছে।

সেই কবুতরগুলো যখন ফর্ ফর্ করে উড়তো, তখন অসংখ্য উকুন ও ছারপোকা বৃষ্টির মত বন্দীদের উপর পড়তো। অসহনীয় দুর্গন্ধের কারণে কয়েদীদের সবসময় বমিবমিভাব হতো। সেখানে বাতাস আসা-যাওয়ার কোন জানালা ছিল না। ছাদের কাছাকাছি ইটের তৈরী কিছু ছিদ্র। এতটুকুই ফাঁকা জায়গা। কখনো গার্ডরা বড় দরজাটা খুলে সেখানে রাখা পুরাতন লোহা ও যন্ত্রপাতি মেরামত করার জন্য নিয়ে যেতো।

কাসেম ও ছুদু উপরের দিকে যে সিঁড়িটা গেছে, তার নিচে স্থান পেয়েছে। সিঁড়ির উপরে যেসব বন্দীখানা রয়েছে, পূর্বে সেগুলো খনির ব্যবস্থাপনা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

কাসেম নিজের গায়ের জ্যাকেটটি খুলে নিজের পুত্র ছুদুর জন্য সিমেন্টের ফ্লোরে বিছিয়ে দিয়েছে। সে নিজে খালি ও দুর্গন্ধযুক্ত ফ্লোরে শোয়। কাসেমের শুকিয়ে পড়া ভাঙ্গা গালে একটা দুর্ভাবনা ও চিন্তার ছাপ ফুটে উঠছে। তার চুলগুলো সময়ের পূর্বেই বার্ধক্যের নিদর্শনস্বরূপ পেকে যাচ্ছে। কিন্তু তার চোখের দীপ্তি দেখে বুঝা যায়, সে জীবন সংগ্রামে হাল ছেড়ে দিতে কোনক্রমেই প্রস্তুত নয়।

ছুদুর বয়স আঠারো বছর। তার চোখে তারুণ্যের উচ্ছলতা ও উজ্জ্বলতায় বুঝা যাচ্ছে, বাল্যকালে তার দেহটি ছিল দীর্ঘ এবং শরীরটা ছিল শক্ত সুঠাম। সে এমন এক সুদর্শন যুবক যার দিকে কোন রমণী একবার তাকালেই আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। কিন্তু এখন সে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, বরং দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। তরতাজা সুপুষ্ট চেহারাখানা পাথরের মত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। চোখ দু'টি আপন দীপ্তি হারিয়ে কোঠরের দিকে লুকোতে চাচ্ছে। চোখের পাশে কালো দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শরীরের চামড়া ঘুচিয়ে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে। তার পা দু'টো শুকিয়ে চিকন হয়ে কাঠের আকার ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে, যেন দু'টি লাকড়ীর টুকরা সিমেন্টের ফরশের উপর পড়ে আছে। কুখাদ্য, দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে অন্যান্য লোকদের মত সেও আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এটা খুবই কষ্টদায়ক পরিস্থিতি যে, রোগীকে কিছুক্ষণ পর পরই টয়লেটের দিকে দৌড়াতে হয়। পায়খানা করার সময় মনে হত, যেন ভিতরের চাপে নাড়িভূড়ি সবকিছুই

ছিড়ে বেরিয়ে পড়বে। প্রায়ই রোগী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে টয়লেটে পৌছার পূর্বেই পায়খানা করে ফেলতো যা তার পা ও প্যান্ট দিয়ে চুইয়ে পড়তো। টয়লেটের দিকে দৌড়ানোর সময় তারা অন্য যে সব কয়েদী সাথে ধাক্কা খেতো তাদের শরীর ও ফ্লোর ময়লাযুক্ত হয়ে যেতো। এরপর টয়লেটের দরজার কাছে সবসময় একজন গার্ড এ ধরনের হতভাগা রোগীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান থাকতো। ছুদু অত্যন্ত দুর্বলতার কারণে খাবারের জন্য কেন্টিন পর্যন্ত যেতে পারতো না। তার বাবা কাসেমেরও এমনই অবস্থা। এক মুহূর্তের জন্যও সে তার কলিজার টুকরাকে একলা ছেড়ে যেতে প্রস্তুত ছিল না। সে কিছু জার্মানী মার্ক লুকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তা দিয়ে ছুদুর খাওয়ার জন্য কিছু বিস্কুট কিনে নিতো এবং খুবই স্নেহভরে বারংবার বুঝাতো। বলতো, "বেটা! তোমার শরীর সুস্থ করতে হলে অবশ্যই কিছু না কিছু খেতে হবে। নতুবা প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে যাবে।"

এ কথাগুলো বলার সময় মনে হত যেন সে কোন মন্ত্র পড়ছে। ছুদুকে নিয়ে তার আশা–হতাশার শেষ ছিল না। ছুদু কাত হয়েই শুতো। তবে খাওয়ার সময় খুবই কষ্টে মুখটা কিছুটা উপরের দিকে উঠাতো, যেন তার বাবা তার মুখে বিস্কুট ঢেলে দিতে পারে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আস্তে আস্তে বিস্কুট চিবাতে থাকতো এবং পরে খুব কষ্টে তা গলধঃকরণ করতো। কিন্তু তখন প্রচণ্ড ব্যথায় তার চেহারা বিবর্ণ আকার ধারণ করতো। পাকস্থলী মোচড় খাওয়াতে তার কাশির পালা শুরু হতো। কাশতে কাশতে তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো তখন প্রচণ্ড দুঃখ ও হতাশায় কাসেমের দু' চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। তার মনে চাইতো, উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে ক্রন্দন করতে, এতে হয়ত মনের ব্যথা কিছুটা লাঘব হতে পারে। কিন্তু সে তার ছেলের দিকে তাকিয়ে তা করতো না। কারণ, এতে হয়তঃ সার্বরা তার ছেলেকে মেরে ফেলতে পারে। তার সমস্ত দুঃখ–বেদনা কয়েক ফোটা অশ্রু হয়ে ধীরে ধীরে তার রৌদ্রে ঝলসানো গণ্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে পড়তো। তবু বেঁচে থাকার এক অদম্য স্পৃহা এক মুহূর্তের জন্যও তার অন্তর থেকে দূর হতো না। সে মাঝে মাঝে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে দু'আ করতো ঃ "হে আল্লাহ!

আমাদের ন্যায় বদনসীবদের উপর তুমি তোমার করুণা বর্ষণ করো, আমাদেরকে তুমি ধৈর্য ধরার শক্তি দাও।” তখন তার চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসতো।

আরেক কেয়ামত

“বের হও, সবাই বাইরে চলো।” একজন গার্ড বড় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হুংকার ছেড়ে বলল।

কাসেম জানতো ছুদুকেও এই নির্দেশ পালন করতে হবে। সে এ কথাটিও জিজ্ঞেস করার সাহস পেলো না যে, ছুদু তো মারাত্মক অসুস্থ, ও কি এখানে থেকে যেতে পারে? কারণ, সে ভাল করেই জানে, যদি কিছুক্ষণের জন্যও তার কথাটি গার্ডরা মেনে নেয়, কিন্তু তারপরে তার বরখেলাফ করতে গার্ডদের সময় লাগবে না। কারণ, তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে বন্দী মুসলমানদের কষ্ট দেয়া ও তার উপকরণ খোঁজা। তাই সে খুব কষ্টে ছুদুকে তার দুর্বল পায়ের উপর দাঁড় করালো এবং তাকে নিজের শরীরের সাথে লাগিয়ে বাইরে উন্মুক্ত ময়দানের দিকে নিয়ে গেল।

“নিজ নিজ কাপড় খুলে ফেলো.... সবাই খুলো, কেউ যেন বাকী না থাকে।” একজন গার্ড গর্জন করে বলল, “তোমাদের দুর্গন্ধের কারণে আমরা হ্যাংগারে প্রবেশ করতে পারছি না।” আরেকজন গার্ড মোটা পাইপ হাতে নিয়ে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। পাইপ থেকে পানি প্রবল বেগে সিমেন্টের পাকা ফ্লোরের উপর পড়ে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করছে। কাসেম অবর্ণনীয় লজ্জার সম্মুখীন। ছেলের সামনে এ অপমান। এ নির্লজ্জতা। যেন কেয়ামতের তাণ্ডব। হাশরের ময়দানেও তো সমস্ত মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হবে। এখানেও তো মুসলমানদের উপর কম কেয়ামত যাচ্ছে না।

কয়েদীদের হাড্ডির খাঁচার মত কংকাল দেহগুলো তাদের ছেঁড়া ফাড়া কাপড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা করলো তা ভুলবার মত নয়। তাদেরকে দশজন দশজন করে গ্রুপ বানিয়ে পাইপের স্রোতের নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কাসেম ও ছুদুর পালাও এলো। তখনও তারা পাইপ হাতে গার্ডটি হতে কয়েক কদম দূরে, এখনো তারা

কাছে এসে পৌঁছেনি। কিন্তু আচানক গার্ডটি পাইপের মুখ তাদের দিকে করে পানি ছুঁড়ে মারল। ঠাণ্ডা পানির প্রবল ও শক্তিশালী স্রোত চাবুকের মত এসে কয়েদীদের শরীরে ধাক্কা মারল। দানবীয় অট্টহাসি হেসে এবং বিভিন্ন অশ্লীল ও লজ্জাকর কথা বলতে বলতে গার্ডরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এসব দুর্বল ও শক্তিহীন বন্দীদের সাথে দয়ামায়াহীন ও বর্বর খেলা খেলতে থাকলো। ছুদু কষ্টের আতিশয্যে নেতিয়ে পড়ে কোমরটা পানির দিকে করার চেষ্টা করলো। প্রচণ্ড ব্যথায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। চোখের উপর হাত দুটো মেলে ধরলো। উদ্দেশ্য, তার পিতার উলঙ্গ অবস্থা দর্শন না করা। আর কাসেম নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে ছেলেকে পানির প্রচণ্ড আঘাত থেকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিছু কয়েদী তাদের খোলা যখমে পানির আঘাতের কারণে প্রচণ্ড ব্যথায় ছটফট করে ক্রন্দন করতে লাগলো। যেসব কয়েদী অপেক্ষাকৃত কিছু স্বাস্থ্যবান ও সাহসী তারা পানির কয়েক ফোটা গলধঃকরণেরও চেষ্টা করছে, তাদের শুষ্ক গলাটা কিছুটা ভিজাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পানির প্রচণ্ড বেগের কারণে তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। গার্ডরা জেনে শুনে পানি জোরে ছুঁড়তো। তারা তাদের এ নিষ্ঠুর আচরণে নিজেরাই উল্লাসে ফেটে পড়তো। বন্দীদের এই অসহায়ত্বই সার্ব হায়েনাদের চিত্তবিনোদনের উপকরণ। যদিও এসব নিষ্ঠুর খেলা বেশী দীর্ঘায়িত হতো না, তবুও একটার পর একটা নির্যাতন তাদের উপর চলতেই থাকতো। অতঃপর কয়েদীরা নিজ নিজ কাপড় উঠিয়ে হ্যাংগারের দিকে ছুটে চললো। কাসেম ও ছুদু ছিল সবার পিছনে। যেই মাত্র কয়েদীরা হ্যাংগারে প্রবেশ করল অমনি গার্ডরা বৃষ্টির মত তাদের কোমরে ও মাথায় লাঠি বর্ষণ করতে লাগল। সাথে সাথে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজও চলতে লাগলো। কাসেমের শার্টটি দরজার হ্যাণ্ডেলের সাথে আটকে গেল। ব্যাপারটি বুঝতে না বুঝতেই অন্তত লাঠির দশটি আঘাত তার শরীরে পড়লো। সে শার্ট টান দিতে চাইল, কিন্তু তা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে গেল। দৌড়ে সে হ্যাংগারের কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা অংশে পৌঁছে গেল।

সেদিন রাতে ছুদুর প্রচণ্ড জ্বর এলো। পাকস্থলীর ব্যথাটাও মারাত্মক রূপ ধারণ করলো। পাকস্থলীর ব্যথা গোলার ন্যায় উপরে উঠতে উঠতে

মগজ পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছে। চোখের সামনে সীমাহীন অন্ধকার ছেয়ে যেতে লাগল। আশে পাশে দাঁড়ানো লোকদের আওয়াজ চিনতেও তার মুশকিল হচ্ছে। ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে তার বাবাকে তার উপর ঝুঁকতে দেখল। সে তার ঘর্মাক্ত আঙ্গুল দিয়ে ছুদুর চুলগুলো মৃদুভাবে নেড়ে দিচ্ছে। ভাঙ্গা খিড়কী দিয়ে ভিতরে আসা বাল্বের আলোয় ছুদুর চেহারাটি খুবই বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে।

'বাবা.... !' ছুদু ক্ষীণস্বরে বলল। শুনার জন্য কাসেম আরো কাছে এসে বসল।

'বাবা..... আমার নিজের মৃত্যুর কোন দুঃখ নেই, আমার আর এসব নির্যাতন দেখতে ইচ্ছে হয় না, আমরা এসব লোকদের কী ক্ষতি করেছি।'

কাসেম নিজের মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল, যেন ছুদু তার চোখের অশ্রুগুলো দেখতে না পায়।

ছাদের কাছাকাছি বানানো ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে সকাল বেলার অল্প অল্প আলো ভিতরে আসতে লাগল। ছুদুর শ্বাস গ্রহণ করাটা খুবই কষ্টদায়ক মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরে ধীরে ধীরে তার মাঝে একটা বিশেষ লক্ষণ দেখা গেল। সে ছোট ছোট শ্বাস নিতে লাগল। জীবনটা তার শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার আঠারো বছরের জীবন প্রদীপটা পিতার সামনে নিভে যাচ্ছে।

'বা.... ! প্লিজ..... !'

সে কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু তার শেষ শব্দগুলো তার ঠোঁটের উপরই বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। হ্যাংগারের ভিতর একটা গভীর শোক ও নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। এক কোণ থেকে খোদাকে ভর্ৎসনা করার শব্দও ভেসে এলো (এজন্যই নৈরাশ্যকে কুফর ও শয়তানের কাজ বলা হয়েছে)। কাসেম নিজের জায়গা হতে উঠে দাঁড়ালো। নিজের শরীরটাকে সোজা করল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। যেন সে পাথর হয়ে গেছে। তার মুখখানা প্রচণ্ড শোক ও অসহনীয় অনুতাপে আশ্চর্যরূপ ধারণ করলো। হৃদয়ের কান্না ও চোখের প্রবল অশ্রুর বন্যাকে থামানের জন্য হাতের কব্জির উপর প্রচণ্ড জোরে দাঁত বসিয়ে দিল। তার চোখ দুটি শুষ্ক. কিন্তু হৃদয়টি কান্নায় ফেটে যাচ্ছে। পুত্রের বিরহে তার

মনটা চরম উদাস। সে কিছুই বুঝতে পারছে না, সে কি করবে। সামনে পড়ে থাকা সন্তানের লাশটি তার জীবিত থাকার মৌলিক অর্থটাই ছিনিয়ে নিয়েছে। মৃত ছেলের প্রতিচ্ছবি তার বুকের ভিতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। সে তার স্ত্রীকে (যদি সে এখনো জীবিত থাকে) কেমন করে এটা বলবে যে, তার বেটা..... তার প্রিয় কলিজার টুকরা .... তার চোখের মনি এখন আর এ দুনিয়াতে নেই .... আর ছাআদাহ .... (ছুদুর বোন) এ বিরহ বেদনা কীভাবে সহ্য করবে...? কাসেম নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। একজন গার্ড তার দিকে এগিয়ে এলো। ছুদুর প্রাণহীন শরীরে একটা লাথি মেরে বলল ঃ "এটা কি, এখনো এখানে পড়ে আছে কেন?" কাসেম মুখে কিছু বলল না, কিন্তু তার চোখ দু'টো খঞ্জরের মত গার্ডটির দিকে উঠল। তার ঘৃণা ও প্রতিশোধ ভরা দৃষ্টি একটি আহত ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করলো।

গার্ডটি নিজের হিংস্রতা লুকানোর চেষ্টা করা ছাড়াই ঘৃণাভরে বলল ঃ "এটা তো মরে গেছে এই আবর্জনাকে উঠিয়ে এখ্খুনি বাইরে নিক্ষেপ করো।"

কাসেমের ঠোঁটটি গার্ডকে কিছু বলতে কিংবা তার মুখের উপর থুথু নিক্ষেপ করতে উদ্যত হতে যাচ্ছে, কিন্তু তা বাস্তবায়িত করতে পারল না। সে মূক ও বধির লোকের মত খামোশ দাঁড়িয়ে রইল। সে মৃত ছুদুর দিকে এমনভাবে দেখছিল, যেন মনে মনে কোন অদৃশ্য ইনসাফকারীর কাছে দৃঢ় শপথ নিচ্ছে যে, সুযোগ পেলে ছুদুর উপর যে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে, তার বদলা একদিন না একদিন অবশ্যই সে নেবে।

কাসেম সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে তার ভাই ও ভাতিজা ছুদুর লাশটিকে বাইরে উন্মুক্ত ময়দানে রেখে এলো। সেখানে আরো অনেকের লাশ কাফন দাফন ছাড়া পড়ে আছে। পরে এসব মৃতদেহকে হলুদ রঙের ভ্যানটিতে উঠিয়ে দেয়া হয়।

কাসেম যেন নিজেকে সম্বোধন করে বলছে ঃ "ওর যৌবনটা এখানেই কোথাও কোন গর্তের ভিতর দাফন করে দেয়া হবে ...... আমি কি কখনো সেই পরিখাটি শনাক্ত করতে পারবো?" কাসেমের বাকী জীবনটা এ প্রশ্নের উত্তরই খুঁজতে খুঁজতে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

সপ্তম অধ্যায়
জাহান্নামের সপ্তম গহ্বর

ছুদুর মৃত্যুর পরের দিন। ৬ই আগষ্টের ভোরের হাজিরাটা অসাধারণভাবে দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কাসেমের নামও তলবকৃত লোকদের মধ্যে আছে। নিজ নিজ ছেঁড়া ফাঁড়া কাপড়গুলো বগলে চেপে কয়েদীরা বাইরে খোলা ময়দানে জমায়েত হল। কেউ জানে না, কি হতে যাচ্ছে। তাদেরকে দশজনের সারি বানিয়ে দাঁড় করানো হল। একজন বড় মোচওয়ালা গার্ড তাদের নাম ডাকতে শুরু করল। অন্য আরেকজন গার্ড কিছুক্ষণ পর পর কয়েদীদের নতুন নতুন তালিকা এনে হাজির করছিল। সবদিকেই একটা কৌতূহলী ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ, আজ পর্যন্ত দিনের আলোয় এতগুলো বন্দীকে একসঙ্গে নির্যাতনের জন্য এভাবে একত্রিত করা হয়নি। জিমুর মাথায় একটা আশঙ্কা তোলপাড় করছিল, এমন যেন না হয় যে,তাদের সবাইকে একসাথে .....। কিন্তু সে এর চে' বেশী আর কিছু ভাবতে সাহস পেলো না।

একটি গ্রুপকে একদিকে নিয়ে যাওয়া হল, তাদের মধ্যে জিমুর চাচাতো ভাই ফাযেল এবং ফুদুও আছে। অতঃপর মুহূর্তের মধ্যে এ খবরটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল যে, তাদেরকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে এবং আমারেস্কা ক্যাম্পও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রতিটি লোকের মুখে এ কথার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো।

অনিশ্চিত যাত্রা

কয়েদীদের নাম ডাকার এই ধারা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত অব্যাহত রইল। যখন আমারেস্কা শহরের দিক থেকে ধুলোবালি উড়িয়ে একে একে বিশের অধিক বাস সেখানে এসে জমা হল, তখন মৃদু হাসির রেখা বন্দীদের ম্লান ও বিষন্ন চেহারায় উকি দিতে লাগল। সবার চোখে আনন্দাশ্রু। একজন আরেকজনকে বারবার জড়িয়ে ধরছে, আলিঙ্গন করছে। জিমুর চেহারায়ও একটা মৃদু হাসির রেখা স্পষ্ট। তবে তার চেহারা থেকে বেদনার চিহ্নও হারিয়ে যায়নি। তার মনে এ প্রশ্নটিও দানা বেঁধে উঠল ঃ "সত্যিই কি আযাবের এই কালো রজনী খতম হতে যাচ্ছে?"

কয়েদীরা এখন গার্ডদের উপস্থিতি উপেক্ষা করে আনন্দ-উল্লাস

প্রকাশ করেছে। তবে কারারক্ষীরা তাদেরকে উপহাস ও ঈর্ষার নজরে দেখছে। এর পরিণতি নিঃসন্দেহে শুভ হওয়ার কথা নয়। বাসগুলো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। সাথে দু'টি সামরিক ট্রাক ও দশজন আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত সার্ব সেনা। প্রথম দু'টি বাসে যেসব বন্দীদেরকে উঠানো হল তাদেরকে কিছুদিন ধরে গ্যারেজে রাখা হয়েছিল। বাকীদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়। মুহরেম নাযিরোভিচ্ প্রেজডোর রেডিও'র একজন প্রাক্তন প্রযোজক। জিমুদের গ্রুপে ছিলেন। গ্রুপে কোযারকের সাঈদ সোফটকও ছিলেন। প্রেজডোরে তার চশমার দোকান আছে। হাল্লাদের ভাই ছান্নাদ ও নায্যাদ অন্য বাসে উঠেছে। সফরসঙ্গীদের মধ্যে জিমু অন্য কাউকে চিনতো না। বাসে উঠার পর সবাইকে মাথা নিচু করে রাখার নির্দেশ দেয়া হল। যে বাসে চল্লিশজন লোক বসার কথা সেটিতে প্রায় একশজন কয়েদীকে এমন গাদাগাদি করে ভরা হল যে, কিছু লোক সিটে, কিছু নিচে এবং কিছুলোক অন্যজনের উপর বসে পড়লো। জিমু দু'জন অপরিচিত যুবককে তাদের আসনে বসার অনুরোধ করল। তাদের সিট ড্রাইভারের পিছনে ডান দিকে দ্বিতীয় সারিতে। মুহরেম ও সাঈদ তাদের বরাবর সিটে বসল। প্রায় আধা ঘন্টা পর প্রতিটি বাসে তিন জন করে আর্মির সদস্য আরোহণ করল। অতঃপর বাসগুলো ছেড়ে দিলো। কিছু বাস টারনো পোলজী ক্যাম্পের অভিমুখে রওয়ানা দিল। কিন্তু বাকী যে বাসগুলোতে তেরশ বন্দী উঠেছে সেগুলো বিপরীত দিকে অবস্থিত কুখ্যাত মানজেকা বন্দী শিবির অভিমুখে রওয়ানা হলো। ....

নির্মম নির্যাতন

আমারেস্কা বন্দী শিবিরে মাত্র ১৮৪ জন কয়েদী অবশিষ্ট থাকলো। বাসের এ কাফেলার উভয় পাশে প্রেজডোরের বিশেষ ফোর্সের জোয়ানরা সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে। তাদের মেশিনগানের নলগুলো বাসের দিকে তাক করা। লম্পট ও বদমাশদের এ গ্রুপের চীফ কমাণ্ডার জোরান বাবেক। লোকেরা তাকে 'বাকন' বলে ডাকে। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, স্পোর্টসেও তার অনেক সুখ্যাতি। ভাল খেলোয়াড় হিসেবে প্রেজডোরের জনগণ তার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করতো। কিন্তু এখন তার সমস্ত কৃতিত্ব তার হাতে ধরা সেই চাবুক পর্যন্তই সীমিত হয়ে গেছে। কারণে

অকারণে নানা ছলছুতোয় তা দিয়ে মযলুম মুসলমানদের উপর শপাং শপাং করে আঘাত করাই তার একমাত্র কাজ। একমাত্র চিন্তা।

বাসগুলো আমারেস্কা গ্রামের প্রবেশ দ্বারে এসে থেমে গেল। যেসব বন্দী মারাত্মক আহত, কিংবা যাদের ক্ষতের চিহ্নগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তাদেরকে সেখানে নামিয়ে দেয়া হল। স্বেচ্ছায় কেউ নামল না। কারণ, তারা ভাল করেই জানতো যে, এর অর্থ হবে জবাই হওয়া। যাকে সার্ব কসাইরা 'শর্ট কাট' নাম দিয়েছে। এরপর মারজা নামক একজন সার্ব হাতে মোটা ডাণ্ডা নিয়ে বাসে ঢুকলো এবং কোন বাচবিচার ছাড়া সবাইকে প্রহার করতে লাগল। সে নিচে পড়ে থাকা বন্দীদের শরীর মাড়িয়ে চতুর্দিকে লাঠি বর্ষণ করে যাচ্ছে। জিমুর মাথায় দুটি ও পাঁজরে একটি ডাণ্ডা পড়ল। একটি অবর্ণনীয় ব্যথা তার পুরো শরীরটাকে গ্রাস করে ফেলল। কিন্তু সে স্বীয় স্থান হতে নড়ল না এবং মুখ দিয়েও কোন উহ্ শব্দ বের করলো না। কারণ, আওয়াজ করলে এ সব হায়েনাদের বর্বরতার আরো সুযোগ করে দেয়া হবে। যাত্রাপথে আরো কয়েকবার মারজা ও তার সঙ্গীরা বাস থামিয়ে এ ধরনের নির্যাতন চালালো।

বাসগুলো পুরাতন ও ভাঙ্গা ছিল। এর পূর্বে এ বাসগুলো উপশহরের পাকা সড়ক ও ছোট রুটে চলতো। এখন এতগুলো লোকের ভার বহন করে এগুলোর পক্ষে চলাটা মুশকিল। ড্রাইভাররা সার্ব আর্মিদের বিশেষ চিহ্নওয়ালা উর্দি পরা। বাইরে এমন গরম, মনে হচ্ছে যেন আসমান হতে অগ্নি বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু বাসের ভিতরের অবস্থা তার চেয়েও শোচনীয়। ড্রাইভাররা জেনে শুনে কিছুক্ষণ পরপর বাসের হিটার চালিয়ে দিচ্ছে। ফলে ভিতরের তাপমাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, এ তাপে যে কোন জিনিস অনায়াসে সিদ্ধ করা যাবে। ঘামে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বায়ুহীন পরিবেশে এমন একটি দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, এখনো পরীক্ষা শেষ হয়নি।

মুকুটের হীরা

পরিশেষে তারা বানজালুকায় পৌঁছল। বানজালুকা অত্র অঞ্চলের সবচেয়ে বৃহত্তম ও আকর্ষণীয় শহর। 'এসব আমাদের কর্মেরই ফল' জিমু শহরের উপকণ্ঠ জাছিছ হয়ে সার্ভিস রোড অতিক্রম করার সময় মনে

মনে ভাবতে লাগল। বানজালুকা একসময় খুবই ছোট শহর ছিল এবং এখানে কল্পনাতীত শান্তি ও স্থিতি বিরাজ করতো। এ শহরটিতে একমাত্র মুসলমানরাই বাস করতো। ১৯৬৯ সালের ভূমিকম্পে এ শহরটি চরমভাবে বিধ্বস্ত হয়। অষ্ট্রিয়া, হাংগেরী ও ওসমানী সাম্রাজ্যের মধ্যখানে অবস্থিত সীমান্তবর্তী এ নগরীটির পুনর্নির্মাণ ও সৌন্দর্য বহাল করার জন্য এখানকার মুসলমান অধিবাসীরা উঠে পড়ে লেগে যায়। 'মুকুটের হীরা' বলে খ্যাত এ শহরটির জন্য পয়সা ব্যয় করতে কেউ কার্পণ্য করেনি এবং শ্রম ব্যয় করতেও কেউ কোন দ্বিধা করেনি। স্বয়ং জিমুও স্বেচ্ছাসেবক যুবকদের সেই গ্রুপে ছিল যারা এই বিধ্বস্ত জনপদটিকে আবার সুন্দর নগরীতে রূপান্তরিত করেছিল। নতুন নতুন অট্টালিকা ও ছিমছাম দালানকোঠা গড়ে উঠে। নির্মিত হয় স্কুল, নার্সারী ও সুন্দর সুন্দর হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট। বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপগুলো সরিয়ে সেখানে তৈরী হয় সুন্দর সুন্দর পার্ক, বাগান ও বড় পাকা সড়ক। এখন নতুনভাবে গড়ে উঠা এ জনপদটিকে অবশ্যই 'মুকুটের হীরা' বলে আখ্যায়িত করলে অতুক্তি হবে না।

ভূমিকম্পের পর শহরটির পুনর্নির্মাণের প্রাক্কালে বিভিন্ন অঞ্চল হতে অনেক লোক এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এদের মাঝে কেবলমাত্র বসনিয়ার লোকই ছিল না,বরং আশে পাশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোকেরা এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। বিভিন্ন জাতের লোক সমাগমের কারণে শহরটি বহুজাতিক কালচারের নগরীতে পরিণত হয়। এখানে জাতিগত সমস্যাও সৃষ্টি হয়। বর্তমানে এ শহরটি তার অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। শুধু কি তাই! সার্ব প্রশাসনের বর্তমান রাজধানী হল এই বানজালুকা শহর। এখানেই কপটতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়ার মতো বিভিন্ন মহামারির বীজ রোপিত হয়। অতঃপর সমগ্র অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার সশস্ত্র সার্ব যুদ্ধবাজরা তার অলিগতিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে। কাল্পনিক সার্ব রাজ্যের নামে যেকোন লোককে ইচ্ছা হত্যা করতে থাকে। প্রতিবেশী ও দোস্ত-বন্ধুদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিস্কার করে দেয়। কিছুদিন পূর্বেও একজন অপরজনের মাঝে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারা এক সম্প্রদায়

অন্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে শরীক হতো। সবাই মিলে আমোদ স্ফূর্তি করতো। খৃষ্টানরা যখন নিজেদের সন্তানদের ব্যাপটিসমা দিতো তখন মুসলমান প্রতিবেশীকেও আমন্ত্রণ জানাতো। মুসলমানরাও বিবাহ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদেরকে আহবান করতো। কিন্তু এখন তারা তাদের কল্পনার রাজ্যের জন্য বিষাক্ত সাপ ও হিংস্র হায়েনার মত হয়ে উঠেছে। এসব মাতাল খৃষ্টান মৌলবাদীরা নিজেদের সেসব সার্ব আত্মীয়-স্বজন, ভাই-ব্রাদার, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকেও ক্ষমা করছে না যাদের মাঝে মানবতাবোধ আছে। যারা সাম্প্রদায়িকতার নামে নিরীহ মুসলমান প্রতিবেশীদের নিধন করতে সমর্থন দিচ্ছে না। যারা এ জঘন্য কাজের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করছে। সার্ব হায়েনারা তাদের এ ধরনের স্বজাতিদেরকেও হত্যা করছে। তাদেরকে নিজেদের ভিটাবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ তারা যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করে আসছে। মুসলিম বিদ্বেষ তাদের চোখে হিংস্রতার আবরণ ঢেলে দিয়েছিল। মনুষত্বের গুণাবলী তারা হারিয়ে ফেলেছে। পুরো অঞ্চলটি নিরীহ মজলুম লোকদের লাশ দিয়ে ভরে ফেলছে।

কখনো কখনো জিমু ভাবতো, "হায়, যদি ভূমিকম্প না হত। যদি সেই পুরাতন শহরটিই থাকতো, তাহলে কতই না ভাল হত। হয়তঃ এত ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতো না.....।"

জীবন নিয়ে খেলা

বাসগুলো যখন পুরাতন শহর অতিক্রম করছে, তখন একজন গার্ড ড্রাইভারকে সামনের দরজাটি খুলতে বলল। ড্রাইভার একটি সুইচ টিপ দিল। অমনি গড় গড় শব্দ করে পুরাতন দরজাটি খুলে গেল। গার্ড তার মেশিনগান দরজার কাছে রাখল এবং রাস্তার পাশের একটা মসজিদের মিনারাকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করতে লাগল। সঙ্গীরা তাকে বাহবা দিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠল। জিমু বিড় বিড় করে বলল ঃ "আজ না হোক, কাল তোমাদের এসব জঘন্য অপকর্মের শাস্তি পেতেই হবে।"

জিমু বেশী ঘর্মাক্ত হওয়ার কারণে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। সে তার অবনত মস্তকটি হাত দিয়ে চেপে আরো নত করে নিল। বাসগুলো পাহাড়ের দিকের বড় সড়কটি ছেড়ে একটি পাকা সংকীর্ণ সড়কের দিকে

মোড় নিল। অতি শীঘ্র পিচ ঢালা সড়কের পরিবর্তে ছোট ছোট কংকর বিছানো সড়ক এসে গেল। তারপর কাঁচা ও আবর্জনায় ভরা সড়ক শুরু হয়ে গেল। কয়েক মাইল চলার পর বাসগুলো থেমে গেল। ফৌজী ট্রাকে আরোহিত সার্বসেনারা ভয়ংকর দানবীয় রূপ ধারণ করে ডাণ্ডা হাতে ট্রাক হতে লাফিয়ে পড়ল এবং সকল বাসে ছড়িয়ে পড়ল। মাতালের মত কয়েদীদেরকে প্রচণ্ড বেগে ডাণ্ডা মারতে লাগলো এবং সেই সাথে বুট দিয়ে লাথিও মারতে লাগলো। সে সময় তারা কয়েদীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে কোযারকের বাসিন্দা কে.... কে... ?

কেউ যখন কোন উত্তর দিচ্ছে না, তখন নরপাষণ্ড 'মারজা' এলোমেলো লম্বা চুল নিয়ে এগিয়ে এল এবং এক একজন কয়েদীর চুল ধরে তাদের চেহারাগুলোকে নিজের রক্তপিপাসু চোখের সামনে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

"আচ্ছা, তাহলে তুমি এখানে রয়েছো.... আমার কবুতর!" সে প্রেজডোরের ইমেডেস ক্যাফের মালিক দাউদকে চুল ধরে বাসের দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল। তারপর সে দাউদকে এত জোরে ধাক্কা মারল যে, সে বাস হতে ছিটকে ধুলোবালিভরা সড়কে হাত–পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। মারজা হোলিষ্টার থেকে পিস্তল বের করে দাউদের দিকে তাক করে নিকটেই গাছের একটি ঝাড়ের দিকে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। সামান্য দূর চলার পর সে তাকে থামার এবং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। দাউদ চুপচাপ তার নির্দেশ পালন করল। যেন সে নিজের অদৃষ্টের ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট। কিন্তু তার চোখ দু'টো ভয়ে আতঙ্কে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। মারজা পিস্তলের নলটি দাউদের মাথার পিছনের অংশে রেখে ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে দাউদের কিসসাটি খতম করে দিতে উদ্যত হচ্ছে, ঠিক সে মুহূর্তে একটি চিৎকার ধ্বনি শোনা গেল, "না... না..... মারজা! না.... ওকে মেরো না... প্লিজ!"

মারজা হতবাক হয়ে যেদিক থেকে আওয়াজটি আসছে, সেদিকে তাকালো। দেখল, তারই একজন সাথী চিৎকার করতে করতে তার দিকে দৌড়ে আসছে এবং বলছে ঃ "মারজা! প্লিজ, ওকে মেরো না,.... ও আমার বন্ধু।" মারজার চেহারায় ঘৃণাভরা হাসি ফুটে উঠল। ফলে তার

বিশ্রী দাঁতগুলো স্পষ্ট হয়ে তার কুৎসিত চেহারাকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুললো।

"ও সত্যিই ভাল মানুষ। আমি এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি ওর ক্যাফেতে খানা পরিবেশক হিসেবে চাকুরী করতাম।" মারজার সে সঙ্গীটি দাউদকে মাটি থেকে উঠালো।

"যদি তা–ই হয়, তাহলে তুমি ওকে নিয়ে যেতে পারো। তোমার সাথে ওর কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে, সেটা আমার ভাববার বিষয় নয়, কিন্তু আমার একটা কথা মনে রেখো, সবচেয়ে ভাল মুসলমান সে–ই, যে মরে গেছে।" মারজা বলল। এরপর সে পিস্তলটি পুনরায় হোলিষ্টারে রাখল এবং পিছনে ফিরে একটি ফৌজী ট্রাকে আরোহণ করল। দাউদ এবং তার সাবেক কর্মচারী—সার্ব ফৌজিটি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর সে যখন বাসে আরোহণ করতে যাবে ঠিক তখন মারজা ট্রাকে রাখা একটি মেশিনগানের নলের উপর ঝুলানো একটা ছোট প্লাষ্টিকের কুমিরের দিকে ইংগিত করে দাউদকে বলল ঃ "এটাকে চুমো দাও।" দাউদ চুপচাপ ট্রাকের সামনে এসে তার নির্দেশ পালন করল। এতে ট্রাকে বসা মারজার সঙ্গীরা উন্মাদের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। মারজা দাউদকে বলল ঃ "ও তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে। এখন জলদী করে বাসের ভিতর তোমার রূপটাকে লুকিয়ে ফেল, নতুবা আমার ইচ্ছা আবার পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তার পূর্বেই তুমি এ কাজটি করে নাও, যাও।"

অতঃপর বেদনাদায়ক নিরবতায় ডুবন্ত বাসের এ কাফেলাটি পুনরায় যাত্রা শুরু করল। আবর্জনা ও ময়লায় পরিপূর্ণ কাঁচা সড়কটির শেষ মাথায় অবস্থিত 'বোট ক্যাম্পের' সেনাবাহিনীর একটি বড় গ্রুপ তাদেরকে থামতে বলল।

"এসো, এসব হারামজাদাকে খতম করে দেই।" একজন সার্ব সেনা চেঁচিয়ে উঠল।

"দেখো তো, এসব কুকুরদের শরীর থেকে কি রকম দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।" আরেকজন ফৌজী ক্ষণিকের জন্য বাসের ভিতর উঁকি মেরে বলল।

আরেকজন ফৌজী বেয়নেট লাগানো নিজের রাইফেলটি বাসের

পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। এটা জানার জন্য যে, এই বেয়নেট কোন্ ব্যক্তির শরীরের কোন্ অংশে গিয়ে লাগে। কয়েদীদের সৌভাগ্য যে, তা কারো গায়ে লাগল না। আগামীতে তাদের জন্য কোন্ ধরনের নতুন শাস্তি আবিস্কৃত হয় এ ভয়ে তারা আতংকিত!

মৃত্যুর বিভীষিকা

একজন বিশ্রী সেনা ট্রাক থেকে নেমে বাসে চড়ল। সে মোটরকারের একজন ইঞ্জিনিয়ারকে খোঁজ করছে। সেই ইঞ্জিনিয়ারের প্রেজডোরে ছোট্ট একটি ওয়ার্কশপ আছে।

নজির সহ বাসের পিছনের অংশের উপর শোয়া সবাই নিরব। ভিতরের অসহ্য গরমের সাথে নজির নিজের ভাঙ্গা পাঁজরের ব্যথাও বরদাশত করে যাচ্ছে। আমারেস্কা নির্যাতন শিবিরের এটি একটি চিহ্ন। সৈন্যটি অনুসন্ধান করে চলে গেল। কিন্তু কয়েক মিনিট পর আবার এসে বলল ঃ "আমি নজির কারাককে যেভাবে হোক চাই। আমি ভাল করেই জানি, সে এই বাসটিতেই আছে।" এবারও কোন উত্তর আসল না। শুধু পুরাতন ইঞ্জিনের ফটফট শব্দই বাসে গুঞ্জন করছে। ফলে সেপাইটি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে বলল ঃ "তোমরা কি আমাকে বেকুব ভাবছো.... সবাই কি বধির হয়ে গেছো? যদি তোমরা আমার কথা শুনতে পাও তাহলে কান লাগিয়ে শুনে নাও। নজির কারাকের জন্য মাত্র দশ সেকেণ্ড সময় আছে। তার পরেও যদি সে চুপ থাকে তাহলে আমি পূর্ণ এক ম্যাগজিন গুলি বাসের ভিতর ফায়ার করবো..... নিজের লাভ লোকসান ভেবে দেখো।"

যখন সে বদমাশটি হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সে মুহূর্তে অন্যদিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসল।

"আমি এখানে আছি"—নজির এই নরপাষণ্ডের হুমকি থেকে নিজের সাথীদেরকে বাঁচানোর জন্য উঠে দাঁড়াল।

"বাইরে এসো... নাৎসীদের জারজ সন্তান.... তুমিও হারামী, আর তোমার বাপও ছিল অবৈধ বীর্য থেকে জন্ম। বৃক্ষ যেমন, তার ফলও তেমন।"

"আমি উঠতে পারছি না.... আমি মারাত্মক আহত..... আমি পায়ের

উপর দাঁড়াতে পারছি না।" নজির বলল।

"আমার কথা শুনো..... আবর্জনা কোথাকার.... অপবিত্র মুসলমান.... বাইরে একাই বেরিয়ে এসো, নইলে এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।"

সেপাইটি নিজের ধমকী শেষও করল না, মাতালের মত রাস্তায় যা পাচ্ছে লাথি মারতে মারতে বাসের পিছনের দিকে অগ্রসর হল। নজির নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া অনেকগুলো শরীর সরিয়ে সেই স্তূপ থেকে খুব কষ্টে নিজেকে বের করল। ভয়ে আতঙ্কিত সবাই অসাড় হয়ে পড়ে রইল। প্রচণ্ড আঘাতের পরও কেউ উফ পর্যন্ত করল না। নজির খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাসের দরজার দিকে অগ্রসর হল। বাসের বাইরে ফৌজী ট্রাকের চারজন জোয়ান, যাদের মাঝে মারজা ও বাকনও আছে, তার অপেক্ষা করছে। তারা নজিরকে উলঙ্গ করে ফেললো। মা-বোন তুলে গালি দিতে দিতে নির্দয়ভাবে মারতে লাগল। চাকু দিয়ে কেটে তার মাথায় 'জারজ সন্তান' শব্দটির 'জা' অক্ষরটি বানিয়ে দিল। অতঃপর একজন সৈনিক অত্যন্ত ধারালো তরবারী দিয়ে নজিরের শরীরকে নিচ থেকে আরম্ভ করে মাথা পর্যন্ত নির্দয়ভাবে কেটে দুটি অংশে বিভক্ত করে ফেলল। মৃত্যুর গগনবিদারী একটি চিৎকারের সাথেই তার শরীরের দুটি অংশ যমীনে পড়ে ছটফট করতে লাগল। যমীন রক্তে লাল হয়ে গেল। এরপর ফৌজীরা বাসের মালপত্র রাখার জায়গায় নজিরের মৃতদেহের অংশ দুটি আলুর বস্তার মত ছুড়ে মারল এবং নিশ্চিন্ত মনে ট্রাকে গিয়ে বসল। যেন সেখানে কিছুই ঘটেনি।

বোট ক্যাম্প থেকে 'মানজেকা বন্দী শিবিরের' দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। বাস ছেড়ে দিল। যখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের আঁধার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক তখন এই কাফেলাটি মানজেকা শিবিরে গিয়ে উপনীত হলো। ক্যাম্পের গেটে বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'মানজেকা মিলিটারী ক্যাম্প .... প্রবেশ নিষেধ।'

আমারেস্কা হতে মানজেকা ক্যাম্পের দূরত্ব মাত্র ৩৫ মাইল। কিন্তু এ দূরত্বটি পার হতে পাক্কা ছয় ঘন্টা লেগেছে। ড্রাইভাররা ক্যাম্পের গেটের সামনে একটি সংকীর্ণ ও লম্বা সারিতে বাসগুলো পার্ক করলো। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, বন্দীদেরকে রাতে বাসের ভিতরেই কাটাতে হবে,

কারণ, অন্ধকারের ফলে কয়েদীদের ভালমত তল্লাশী সম্ভব নয় এবং ক্যাম্পে বিদ্যুতেরও কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ এখনো কয়েদীরা আঁচও করতে পারেনি যে, সমাগত এই রজনী তাদের জন্য কি কি ভয়ানক মুসীবত বহন করে আনতে যাচ্ছে। প্রথমে বাসের জানালাগুলো শক্তভাবে বন্ধ করে হিটারগুলো পূর্ণ বেগে চালিয়ে দেওয়া হল। কয়েদীরা ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, পরিশ্রান্ত ও অসহায়। কারোর মাঝে এতটুকু সাহসও নেই যে, নিজের মৃতপ্রায় শরীরটাকে একটু নাড়াচাড়া দেবে। তবে তাদের মধ্য হতে কিছু লোক অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে সেপাইদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজেদের ঘামে ভেজা পুরাতন কাপড়ের অংশ দিয়ে শুকিয়ে পড়া ওষ্ঠগুলো ভিজিয়ে নিচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর ড্রাইভাররা আসলো এবং বাসের ইঞ্জিন ও হিটার বন্ধ করে চলে গেল। সাথে সাথে পাহারারত ফৌজীরাও গায়েব হয়ে গেল। প্রায় দশ মিনিট পর্যন্ত একটা আতঙ্কভরা নিরবতা ছেয়ে রইল।

নরপিশাচের হুংকার

জিমুর একেবারে কাছ থেকে একটি শব্দ এ নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল—“এখানে কি দাউদ কারনালক নামের কোন লোক আছে?”

জিমুর সামনের সিটেই বসা ছিল দাউদ কারনালক। তিনি প্রেজডোরের একজন সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। একটি রেষ্টুরেন্টের মালিক। প্রসিদ্ধ এথলিট। একসময় তিনি স্থানীয় পৌর কর্পোরেশনের বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যখন বাস থেকে নামছিলেন, ঠিক তখন একজন নরপাষণ্ডের কণ্ঠ ভেসে এলো ঃ এক্ষুণি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে, বার্গারের ভিতর দেয়ার জন্য গোশতের কীমা কিভাবে তৈরী করতে হয়..... !

এ কথা বলার সাথে সাথে একেবারে দরজার নিকটেই একটা তীক্ষ্ণ ছুরি দাউদের পাঁজরের গভীরে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল। রক্তের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হল। দরজার নিকটের কয়েদীরা ভয়ে আতঙ্কে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরল। সবাই দাউদের রক্ত প্রবাহ ও তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার খর খর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তার শরীরটি কিছুক্ষণ কেঁপে চির বিদায়ের সংবাদ দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যুর হীমশীতল নিরবতা। নিরবতা ভাঙতে দু' মিনিটও লাগল না।

সার্বসেনারা তিনজন বন্দীকে দাউদের মৃতদেহ বাসে রাখতে বলল। কিন্তু কেউ আগে বাড়ল না। একজন ফৌজি বাসে ঢুকল এবং দরজার সামনে বসা তিনজন কয়েদীকে উঠিয়ে বাইরে ছুঁড়ে মারল। মৃত্যুর ভয়ে কম্পমান এসব কয়েদীরা দাউদের রক্তাক্ত দেহটিকে বাসে উঠালো এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে একটা সিটের উপর রেখে দিল। বাইরে দাঁড়ানো নরপিশাচদের হুংকার বারবার ভেসে আসছে। এসব হন্তাদের রক্তপিপাসু চোখগুলো একটা অজানা হিংস্রতায় জ্বল জ্বল করছে।

ভয়ানক স্বপ্ন

"ও খোদা! এ ভয়ানক স্বপ্ন কবে খতম হবে?" জিমু তার মাথাটা সামনের সিটের নিচের দিকে নত করে নিয়ে ভাবতে লাগল। সামনের সিটটি খালি। কারণ, কেউই এসব নরপশুদের নিকটে বসার মত ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। সে হিসেবে জিমুই বাসের সবচেয়ে সামনের সিটে বসা। সামনের অংশের সবকিছুই সে দেখতে পাচ্ছে। একজন ফৌজিকে একটা শক্ত লাকড়ী হাতে নিয়ে বাসে চড়তে দেখল। লাকড়ীটা কেঁটে ছেঁটে সমানও করা হয়নি। সেই ডাণ্ডাটি প্রায় দেড় হাত লম্বা। সে দেখল, ফৌজিটি তারই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার বরাবর এসেই সৈন্যটি লাকড়ীটা শূন্যে উঁচু করলো। আর সাথে সাথে যেন তার মাথার উপর কিয়ামত এসে পড়ল। একটা প্রচণ্ড ব্যথা তার অস্তিত্বটাকে খিচিয়ে তুলল। সে একটি আওয়াজ শুনতে পেল.... এ আওয়াজটি মারজার। মারজা তাকে বলছে, "এটা তোমার জন্য, জিমু!..... ইতিহাসের সবক তো তুমি খুব পড়াতে....।"

এরপর সে জিমুর মাথা ও পাঁজরে একের পর এক প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগল। জিমু তার মাথাটি রক্ষার জন্য হাত দিয়ে আড়াল করে ধরল।

মারজা ডাণ্ডাটি একদিকে রাখল এবং পিস্তলটা বের করে তার নলটা জিমুর মাথার সাথে লাগিয়ে বলল ঃ "আবার যদি তুমি তোমার হাত দুটো আগে বাড়াও, তাহলে তোমাকে কুত্তার মত মারবো।"

এরপর সে জিমুর উপর পূর্বের চেয়েও বেশী হিংস্রতার সাথে ডাণ্ডা মারতে লাগল। ব্যথার প্রচণ্ডতায় জিমুর জ্ঞান লোপ পেতে লাগল। তার

মাথা, চেহারা ও মুখ রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেলো। ঘামে ভেজা নোংরা শার্টটি রক্তে লাল হয়ে গেছে। অবশেষে মাথাটি উপর দিকে উঠিয়ে মারজার হিংস্রতায় ভরা চোখের উপর চোখ রেখে বলল ঃ "তুমি আমাকে কেন মারছো, আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি?"

মারজা জিমুর এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়ল। সে এমন প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

তারপর সে জিমুর ডানে বসা প্রেজডোর রেডিওর প্রযোজক মুহরেম নাজিরোভিচ্‌কে দেখে একটি দানবীয় অট্টহাসি হেসে তাকে ডাণ্ডা মারতে মারতে বলল ঃ "ও আমার ছোট্ট পাখি! তুমি তাহলে এখানে বসে আছো, যুদ্ধের ময়দানের সংবাদ সম্প্রচারিত করতে তুমি তো অস্বীকার করেছিলে, তাই না?"

"আমি এ রকম করিনি।" মুহরেম ডাণ্ডার আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার মাথাটা সিটের আড়াল করে জবাব দিল।

"আমি জানি,তুমি অস্বীকার করনি। কারণ, তুমি এরকম করতেই পারো না..... কিন্তু ডাণ্ডা মারার চেষ্টা অবশ্যই করেছিলে, এখনই তুমি জানতে পারবে, সার্ব ফৌজ কাকে বলে? চলো, উঠে দাঁড়াও এখান থেকে।"

মুহরেম নিজের চেহারা ও মাথাকে বাহু দিয়ে আড়াল করে বাস হতে নেমে পড়ল। কিন্তু পেটে প্রচণ্ড লাথি ও মাথায় লাগা প্রচণ্ড ঘুষি মুহরেমের মাথা ঘুরিয়ে দিল।

"অনেক হয়ে গেছে..।" বাসের সামনে থেকে একটি নির্দেশসূচক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বললঃ"এধরনের কাজ তোমরা আমারেস্কা ক্যাম্পে করতে পারো, কিন্তু এখান তা হতে দেয়া হবে না... ছেড়ে দাও ওকে।"

পরে জানা যায় যে, এ নির্দেশটি ছিল মানজেকা ক্যাম্পের কমাণ্ডারের এবং তিনি এখানের সমস্ত কর্মকাণ্ডের দায়িত্বশীল। কমাণ্ডারের নির্দেশের ভরসায় মুহরেম তাড়াতাড়ি করে বাসে চড়ে পড়ল। মাথায় আঘাতের ফলে যখম থেকে রক্তের একটা সরু স্রোত তার চেহারার উপর ছড়িয়ে পড়ছে। এরপর ড্রাইভাররা বাসে চড়ে বাসের ভিতরের লাইটগুলো নিভিয়ে দিল এবং দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

খানিকের তরে বাসের ভিতরে যদিও শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অন্ধকার বিরাজ করছে কিন্তু তবু ভয়ে বিহ্বল বন্দীদের মধ্যে এতটুকু সাহস ও হিম্মত নেই যে, তারা নিজেদের শ্বাসটা পর্যন্ত ঠিকমত গ্রহণ করবে। তাদের শরীর জোরে জোরে কাঁপছে। যেন সেখানে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। বাসের ভিতর বাতাস চলাচল বন্ধ থাকার কারণে একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে কয়েদীদের সময় কাটছে। সকলের একটা বমি বমি ভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় ঠোঁটগুলো শুকিয়ে গেছে। এর মাঝে কোন সাহসী কয়েদী তার উপরে গাদাগাদি করে রাখা অন্য কয়েদীদের দেহ সরিয়ে হিম্মত করে দাঁড়িয়ে বাসের জানালার গ্লাসের উপর জমে থাকা আর্দ্রতার উপর আঙ্গুল ফিরিয়ে দু' একটি বিন্দু দিয়ে ঠোঁট ভিজাতে চেষ্টা করছে। বন্দীদের গলাগুলো অত্যন্ত কষ্টদায়ক শুষ্কতায় কাঠ হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় ঘুম আসার প্রশ্নই ওঠে না। জিমুর চেহারা, চুল ও গর্দানের উপরে লেগে থাকা রক্তগুলো জমে শুকিয়ে যাচ্ছে। নিজের আঙ্গুল দিয়ে সে কীমা বানানো নিজের চেহারাটিকে হাতিয়ে দেখল, মুখের ফেটে যাওয়া মাংস একটা গিলাফের রূপ ধারণ করেছে এবং জমাট রক্তগুলো শুকিয়ে ঝরঝরা মাটির মত হয়ে গেছে। হাত লাগলেই তা বিক্ষিপ্তভাবে কোলে ঝরে পড়ে। হাত ও মাথাটি রীতিমত ফুলে যাচ্ছে।

অতি প্রত্যুষে প্রায় পাঁচটার সময় তাদেরকে বাসগুলোর কাছেই একটি মাঠে নিয়ে যাওয়া হল। জিমুদের বাস থেকে দু'জন বন্দী নিচে নামল না। কারণ, তারা পরলোকগমন করেছে। গার্ডদের মধ্যে অনেক নতুন ফৌজ শামিল হল। কয়েদীদের নাম ডাকা হল এবং একশ' জনের গ্রুপ বানিয়ে ক্যাম্পের গেটের ভিতর পাঠিয়ে দেয়া হল। গতরাতে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের নাম হচ্ছে ঃ জোযেন, বাছেক, জীমা এবং একজন তরুণ–মানজা। আর এভাবে আমারেস্কা হতে মানজেকা ক্যাম্প পর্যন্ত সফরের প্রাক্কালে মোট নয়জন মুসলমান বন্দীকে শহীদ করে দেয়া হয়।

অষ্টম অধ্যায়
জাহান্নামের অষ্টম গহ্বর

মানজেকা ক্যাম্পে সর্বপ্রথম ডাক্তারী পরীক্ষার নির্দেশ দেয়া হল। পরীক্ষার পর জিমুর ফাইলে নিম্নোক্ত রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

"ডান বাহু ভাঙ্গা, একটি পাঁজর ভাঙ্গা, মস্তিস্কের ভাঙ্গা হাড়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত জমে আছে। ইমারজেন্সী চিকিৎসার প্রয়োজন।"

ডাক্তারী টেষ্ট পুরোদিন চলল। কয়েদীরা দু'দিন ধরে ভুখা। পানি ছাড়া তারা অন্য কিছু পেলো না। সন্ধ্যায় তাদেরকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হল। এ কয়েদখানাগুলো পূর্বে গোয়াল ঘর ছিল। সিমেন্টের ফ্লোরের উপর যে সব ঘাস ও খড় পড়েছিল এগুলোই বিছানার কাজ দিচ্ছে।

নতুন জিন্দানখানা

"এটা তোমাদের থাকার জায়গা। এখন তোমরা মানজেকা ক্যাম্পে অবস্থান করছো। আমি এ ক্যাম্পের লিডার।" গার্ডদের নেতা, এ কথাগুলো বলল।

"যতক্ষণ তোমরা এখানে থাকবে, তোমাদেরকে কিছু মৌলিক নীতি পালন করতে হবে। তার মধ্যে প্রথমটি হল, তোমাদেরকে মাথা নত করে রাখতে হবে এবং সাথে সাথে তোমাদের হাত দু'টো কোমরের পিছনে থাকা চাই। তোমাদেরকে আইন ও নির্দেশ মেনে চলতে হবে। যদি তোমরা এরূপ কর, তাহলে তোমাদেরকে কেউ কিছু বলবে না, এটা তোমাদের সাথে আমার পাক্কা ওয়াদা।"

পরে কয়েদীরা জানতে পারল, এই কারা প্রধানের নাম স্পাগা। বাস্তবেই সে বন্দীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এর সত্যতা সেসব বন্দীরাও স্বীকার করল, যারা কয়েকমাস পূর্ব থেকেই এ ক্যাম্পে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। মানজেকা ক্যাম্পের বন্দী সানসেকী মোহ্ত্, কালজুক, ডোবোভিচ্, বোসানকা ডোবেকা, গ্রেমোক প্রমুখ প্রেজডোর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা। সর্বমোট এ ক্যাম্পে প্রায় চার হাজার বন্দী।

এদেরকে ছয়টি বড় গোয়াল ঘরে রাখা হল। স্পাগা এসব গোশালাকে 'পিউলিন' বলতো। একটি ব্লকে তিনটি গোশালা এবং তার সাথে সাথে কিছু আবাসিক ঘর এবং সেখানে খানা পাকানো ও আহারের ঘরও

রয়েছে। প্রতিটি ব্লককে কাঁটাতারের বেড়ার দু'টি বেষ্টনী দিয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে। সেই বেষ্টনীর মাঝে মাইন পেতে কাষ্ঠ ফলকে ছেরী লক বর্ণমালায় 'মাইন' শব্দটি লিখে কাঁটাতারের বেড়ার সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সবদিকই মেশিন গানে সজ্জিত সার্ব আর্মির জোয়ানদেরকে সংরক্ষিত ঘরের বাইরে সর্বদা সতর্কাবস্থায় দণ্ডায়মান দেখা যায়। তাদের সাথে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুরও রয়েছে। কারারক্ষী সেনাদের বিশেষ উর্দির কারণে কয়েদীরা তাদেরকে 'পাইড পাইপার্জ' বলে ডাকে। বন্দীরা বিশেষ অনুমতি পাস ছাড়া (যা সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার) এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে যেতে পারে না। তাদেরকে বাবুর্চিখানায় রান্নার কাজও করতে হয়। কয়েদীদের প্রতিদিন দু'বার খানা প্রদান করা হয়। প্রথম কয়েকদিন খাদ্যগুলো আমারেস্কা ক্যাম্পের মতই নিম্নমানের ছিল। কিছুদিন পর শিবিরটিতে বিশ্ব রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করল এবং কয়েদীরা তাদের আনা খাদ্যও পেতে লাগল। ফলে খানার মানটা ক্রমেই উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

কয়েদীদের জীবনটা এ দু'বেলা খাবারের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তারা এ সময় পরিপূর্ণ নিরবতার সাথে আহার করতো। কৃশ ও দুর্বল শরীরে তারা যখন ছায়ার মত নিজ নিজ গোশালা থেকে আহারের জন্য বেরিয়ে আসত, তখন তাদের পাগুলো এলোমেলোভাবে উঠতো। লাঞ্চের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাদের দুর্বল পাগুলো নিস্ক্রিয় হয়ে পড়তো। তাদের অনেকেই মূর্ছিত হয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে আহাররত লোকদের পায়ের উপর পড়ে যেত। এসব মূর্ছিত হতভাগা বন্দীদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য চেহারায় পানির ছিটা দেয়া হত। হুঁশ ফিরে এলে তারা এমনভাবে আহারে ব্যস্ত হয়ে পড়ত, যেন তাদের কিছুই হয়নি। তারা প্লেটগুলো খুবই পরিস্কার করে চেটে খেতো, যেন খাদ্যের প্রত্যেকটি অণু তাদের পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়।

বুকে আশার ক্ষীণ আলো

বসনিয়ার এ মারাত্মক বিপর্যয়ের অন্যতম নায়ক 'ভুজু কিউপরস্লান' একদিন শিবিরটি পরিদর্শন করতে এলো। বন্দীদেরকে বলল, "অতিসত্বর তোমরা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হবে।"

সে আরো বলল, "সার্ব, মুসলমান ও ক্রোটরা পূর্বের ন্যায় আবার মিলেমিশে বসনিয়া হার্জেগোভীনাতে বসবাস করতে পারবে। কারণ, এটা তাদের সকলেরই মাতৃভূমি।"

সে এ বিষয়ের উপর একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিল। অনেকে তার কথা বিশ্বাস করলো, আবার কেউ ভুয়া মনে করলো। যা হোক, সবাই তার বক্তৃতা শুনে হাতে তালি বাজিয়ে তাকে বাহবা দিল। এই ধরনের ক্ষীন আশা বুকে নিয়ে বন্দীরা সময় অতিবাহিত করছিল।

ইতিমধ্যেই ত্রিশজন বন্দীকে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আধা ঘন্টা ঘাসের উপর পায়চারী করার অনুমতি দেয়া হল। ছাকের বেছিক নামের একজন ফৌজ জিমুদের কয়েদখানার ইনচার্জে ছিল। সবাই তাকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলে ডাকতো। তার সহযোগী সিমসোহালী লেজিক এবং ফাহেভ ফাদলাক। এ তিনজন মিলে এ গোশালার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

হৃদয়ের যখম শরীরের চেয়ে ভয়াবহ

আহত কয়েদীরা ব্যথায় উহ আহ করে। সব সময় গোংগানির আওয়াজ আসে। কিন্তু তাদের হৃদয়ের যখম তাদের শরীরের যখমের চেয়ে অনেক গভীর ও কষ্টদায়ক। দুশ্চিন্তা ও বেদনার ছাপ তাদের চোখে মুখে পরিস্ফুট। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে দুঃখ-বেদনা ও নৈরাশ্যের হাহাকার তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই অপরিচিত অঞ্চলের রাতগুলো ভীষণ ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিভরা। মেঘের গর্জনে মনে হয় যেন আসমান ভেঙ্গে পড়বে। আকস্মিক বিদ্যুত-ঝলকে গোশালার ঘাস ও খড়ের উপর পড়ে থাকা বন্দীদের মৃতপ্রায় শরীরগুলো এক লহমার জন্য আলোকিত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে অবিরাম বারিবর্ষণ হতে থাকে। এরপর মেঘমালা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেসব কয়েদী বাবুর্চিখানায় নাস্তা প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালন করতো, তারা রাত তিনটার সময়ই উঠে যায়। বাকী কয়েদীদেরকে ভোর পাঁচটায় জাগিয়ে দেয়া হয়। পানি পেলে তারা হাত মুখ ধুয়ে নেয়। এরপর নিজ নিজ বন্দীশালায় কোমরের পিছনে হাত বেঁধে, মাথা অবনত করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং দু'জন দু'জন করে নাশতা খাওয়ার জন্য চলে যায়।

পানির প্রকট সমস্যা

মানজেকা ক্যাম্পে পানির সমস্যাটাই প্রকট। ফৌজী ট্রাক দিয়ে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত কূপ থেকে পা ন করার পানি নিয়ে আসা হয়। অতঃপর সেই পানি প্লাষ্টিকের বড় বড় মটকা সদৃশ পাত্রে ঢেলে প্রতিটি কয়েদখানার সামনে কাঠের টেবিলের উপর রেখে দেয়া হত। সেখান থেকে ছোট্ট একটি গ্যালনে ভরে কয়েদীদের মধ্য হতে একজন সেটা ধরে রাখতো এবং অপরজন প্লাষ্টিকের ছোট্ট একটি কাপ ভরে ভরে পালাক্রমে সমস্ত কয়েদীদেরকে পানি পান করাতো। কয়েকদিন পর রেড ক্রস সোসাইটি কয়েদীদের মধ্যে প্লাষ্টিকের তৈরী পানির বোতল বিতরণ করল। এতে কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। এখন বন্দীরা লাইন ধরে বড় মটকা হতে নিজেরাই নিজেদের পানি নিয়ে নিতে পারে। কিছুদিন পর ক্যাম্পের অস্থায়ী দায়িত্বশীলরা ঘোষণা করল, ডিজেলের স্বল্পতার কারণে তাদের জন্য কূপ থেকে পানি আনা সম্ভব নয়। এরপর হতে সেনা প্রহরায় দু'শ জন করে বন্দীকে পানি পান করানোর জন্য নিকটস্থ ঝিলে নিয়ে যাওয়া হয়। জলস্থল উভয় পথে যুদ্ধে যেসব ট্যাংক ব্যবহার করা হয়, এ ঝিলটিতে তার প্রশিক্ষণও চলতো। ঝিলের পানি দুর্গন্ধময়, ঘোলাটে। বৃক্ষের ডালপালা ও সবুজ লতা-গুল্মও তাতে ভাসতো।

একবার একজন গার্ড কয়েদীদের একটি গ্রুপকে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে এলো। প্রথমে সে তাদের সামনে সেখানে পানির ভিতর প্রস্রাব করলো। তারপর তাদেরকে সে পানি বোতলে ভরার নির্দেশ দিল। খানা পাকানোর জন্যও এই পানিই ব্যবহার করা হতো।

ইতিমধ্যে রেডক্রসের প্রতিনিধিরা এ ঝিলের পানি পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিল যে, এই পানি মানুষ তো দূরের কথা, চতুষ্পদ জন্তুরও পান করার উপযোগী নয়। তাই ক্যাম্পের প্রশাসনকে কূপ থেকে পানি আনার অতিরিক্ত ডিজেল সরবরাহ করল। কিন্তু মাত্র দু'বার ট্রাকে করে সেই পানি আনা হয়। এরপর পুনরায় কয়েদীদেরকে দিনে দু'বার সেই ঝিলের পানি আনার জন্য বোতল সহ নিয়ে যাওয়া হত।

বৃষ্টির সময় কয়েদীরা পানের পরিস্কার পানির জন্য নিজেদের প্লাষ্টিকের পাত্রগুলো জলনালীর নীচে রেখে ভরে নিতো। সেই বৃষ্টিতে

তারা গোসলও করতো। কারণ, ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ মাত্র একবার তাদের গোসলের বন্দোবস্ত করেছিল। একশ' দিনের মধ্যে শুধু একবার বিশ জন করে কয়েদীর গ্রুপ বানিয়ে মাত্র দু' মিনিটের জন্য নিজেদের শরীর ভিজানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। বিশ্ব রেড ক্রসের সদস্যদের দেয়া সাদা পাউডার ও শ্যাম্পু ব্যবহার করে কয়েদীরা শেষ পর্যন্ত উকুন ও ছারপোকার আযাব থেকে মুক্তি লাভ করে।

রেডক্রস সোসাইটির তৎপরতা

তারা প্রতি বুধবার, আবার কখনো অন্যদিনেও এ ক্যাম্পটি পরিদর্শনে আসতো। প্রথমবার এসেই তারা সমস্ত বন্দীদের নাম লিপিবদ্ধ করে ফেলে। অতঃপর তারা কয়েদীদেরকে এমন ধরনের রেজিষ্ট্রেশন কার্ড প্রদান করে, যার উপর তাদের নামের প্রথমাংশ ও শেষাংশ উল্লেখ রয়েছে। কয়েদীদেরকে জানিয়ে দেয়া হল যে, তাদের নাম ও বিশদ বৃত্তান্ত জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় জেনেভার কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে এবং রেড ক্রসের নিকট প্রতিটি কয়েদীর পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি ও তাদের পরিপূর্ণ খবরাখবর রয়েছে।

জিমুর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ০০২০৭৮১৭। পনের দিন পরপর প্রতিটি বন্দীকে একটি করে সিগারেটের প্যাকেট দেয়া হয়। মানজেকা শিবিরে কয়েদীদের জন্য এগুলো মূল্যবান সম্পদ। কারণ, দু'টি সিগারেট দিয়ে কয়েদীরা একটি অতিরিক্ত লাঞ্চ পায়, দশটি সিগারেট দিয়ে একটি শার্ট খরিদ করতে পারে। সাধারণ জুতা (যেগুলো রেডক্রস কর্তৃকই তাদেরকে প্রদান করা হয়) সিগারেটের তুলনায় একটু বেশী দামী। ভাল একটি স্যুটের জন্য সিগারেটের কয়েক প্যাকেট দিতে হয়। কয়েদীরা একটি মামুলী জিনিসকেও কাজে লাগায়। নাজ্জাদ মুসলমোভিচ্ এ কাজে খুবই পটু।

আশার সূর্যোদয়

জিমুদের গ্রুপ আসার পনেরদিন পর আমারেস্কা ক্যাম্পের অবশিষ্ট ১৮৪ জন কয়েদীকে মানজেকা ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হল। খাদ্যের মান ও পরিমাণ উভয়টিই ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। কখনো কখনো আপেল ও

কমলালেবুও ভাগ্যে জুটতে লাগল। কংকালসার ফ্যাকাশে চেহারায় সজীবতা ও পুষ্টতা ফিরে আসতে লাগল। চোখে আশার দীপ্তির চমক খেলতে লাগল। কখনো কখনো মৃদু হাসির রেখা ওষ্ঠদ্বয়ে খানিকের তরে খেলে যেতে শুরু করল। কাঁটাতারের বেড়া ও মাইনের বেষ্টনীতে ঘেরা দিনগুলো খুবই মন্থরগতিতে অতিবাহিত হচ্ছে। সময়টা যেন একেবারে থেমে গেছে। এ এক বেদনা জর্জরিত অপেক্ষার জীবন। বিষন্ন ও দুঃখে দুঃখে দুর্বিষহ এ জীবনের আত্মায় ছড়িয়ে থাকা আশার কিরণগুলো অশ্রু হয়ে চোখের কোণে ঝিকমিক করতে লাগল।

আশার দুয়ারে নিরাশার ছায়া

এখন তারা নৈরাশ্যের গভীর গহবরে ছায়ার মত জীবন যাপন করছে। কাঁটাতারের বেড়া ও মাইনে ঘেরা তাদের এ বন্দীজীবন তাদের বিষাদ ও তিক্ততাকে হ্রাস করার পরিবর্তে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলছে। ভোর পাঁচটায় জাগ্রত হওয়া, ছ'টায় নাশতার জন্য লাইনে দাঁড়ানো, আবার গোশালায় প্রত্যাবর্তন, বিকাল তিনটায় আবার খানার লাইনে দাঁড়ানো, একদিন পর পর দিনে আধাঘন্টা করে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অবস্থান, আবার সেই সূর্যের অস্তমিত হওয়া, আর রজনীর ছড়িয়ে পড়া সেই ভয়াবহ অন্ধকার। এটাই এখন জীবনের রূপ!!

মানজেকার পরিবেশটা একটি উদাসীনতা ও ঔৎসুক্যহীনতায় ডুবে থাকতো। সবার মনেই একটি অনিশ্চিতভাব পরিলক্ষিত। যেন পাহাড়গুলোও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রাতের আঁধারে বাতাসগুলো এত ভারী মনে হয় যেন তাকে ছুরি দিয়ে কাটা যাবে। পাখিগুলো এতো উপর দিয়ে উড়তো যে, তাদের ডানার ফর ফর শব্দগুলো পর্যন্ত শোনা যেতো না। কারণ, যমীনে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত না কোন পাহাড় না কোন জলাশয় ছিল, না কোন ঘন ছায়াদানকারী গাছপালা ছিল, যা তাদেরকে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষা করতে পারে। এখানের পাহাড়গুলো পাহাড়ের মত লাগে না। মানুষগুলোও মানুষ মনে হয় না।

জিমু ছয় নম্বর গোশালায় থাকে। তার পুরাতন প্রতিবেশী ফাতকু ও রমিজ এখানেও তার প্রতিবেশী। মুহরেম ও মানেল সামনের গোশালায় থাকে। এ দু'টির দূরত্ব কয়েক ফুটের বেশী নয়। ফাতকু ও রমিজ

বাবুর্চিখানায় রান্নার কাজ করে এবং কখনো কখনো সেখান থেকে জিমুর জন্য কিছু খাবার চুপে চুপে নিয়ে আসে। জিমু গনীমতের এ মালে মুহরেম ও মানেলকে শরীক করতে কখনো ভুলে না। মুরছেলের ডিউটিও বাবুর্চিখানায় আছে। সে খানা বন্টনের সময় অবশ্যই জিমু ও তার অন্যান্য বন্ধুদের প্লেটে নির্ধারিত খোরাক থেকে কিছু বেশী পরিমাণ খানা ঢেলে দেয়। আর পাউরুটির স্লাইস করার সময় কিনারার মোটা টুকরোগুলো জমা করে সেগুলো তরকারীর শুরার মধ্যে ভিজিয়ে রাখে এবং তা দিয়ে নিজেদের সাথীদের ক্ষুধা হ্রাস করার চেষ্টা করে।

শেষের মাসগুলোতে খানা আরো ভাল হতে থাকে। নাশতায় দুধ বা কাপ ভরা চা, রুটির এক চতুর্থাংশ এবং মাছের একটি মুখ বন্ধ ডিব্বাও পেতে লাগল। দুপুরবেলার আহারে রুটির এক চতুর্থাংশ, মটর, আলু এবং কখনো কখনো গোশতের সালুনও জুটতে লাগল। দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় প্রহরের প্রথম ভাগেই সূর্যটি সবচেয়ে উঁচু চূড়ার আড়ালে মাথা লুকাতে লাগল। সেই পাহাড়ে একটি বৃহৎ সার্বিয়ান পতাকা উড্ডীন। পার্বত্যাঞ্চলের তীব্র শীতল হাওয়া চুপে চুপে গোশালায় ঢুকে পড়ছে। তাপমাত্রা এত নিম্নে পৌছে যাচ্ছে যা সহ্যের একেবারে বাইরে। গরমের মাঝামাঝি দিনগুলোতে কোন না কোন ভাবে রাতটা কেটেই যেত। কিন্তু শীতবস্ত্রহীন এ দীর্ঘ রাতগুলো মোটেই কাটছে না। জিমুর বেশী সময় মুহরেমের সঙ্গে দাবা খেলে কাটে। এর ঘর ও ঘুঁটিগুলো সে নাজ্জাদের সঙ্গে মিলে তৈরী করেছে। সেমাকও এ খেলায় কখনো কখনো অংশগ্রহণ করে কিন্তু তার মধ্যে স্পোর্টসম্যানের সেই স্প্রীট পাওয়া যায় না। তাই সে পরাজয় বরদাশত করতে না পেরে অধিকাংশ সময় নারাজ হয়ে যায়। কখনো কখনো জিমু একা বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। ছাদের দূর কোন প্রান্তে তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায়। তার হলুদ চেহারায় বিষাদময় এক গভীর রেখা ঘনীভূত হয়ে যায়। ডান হাতের সাহায্যে ভেঙ্গে যাওয়া বাম হাতের ব্যাণ্ডেজকে পুনরায় ঠিক করে বেঁধে দেয়। কখনো কখনো পকেট থেকে নিজের বাচ্চাদের ছবিগুলো বের করে দেখে। ছবিগুলো তার স্ত্রী ইলমা আমারেস্কা ক্যাম্পে অবস্থানের প্রাক্কালে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ছবিগুলো দেখে জিমুর চোখ দু'টি বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বিরহীনীর চিঠি

কয়েকদিন পূর্বে সে রেডক্রসের মাধ্যমে তার স্ত্রীর একটি চিঠি পেল। ইলমা সে চিঠিতে লিখেছে ঃ

"আমি জানি, আমারেস্কা ক্যাম্পে এবং মানজেকা যাওয়ার পথে তোমার উপর নৃশংসতা চালানো হয়েছে! আমার জান! তোমাকে আমাদের জন্য, বিশেষ করে তোমার স্নেহের ডেনীর জন্য এসব কষ্টকে সহ্য করতে হবে। আমি কখনো ভাবতেও পারিনি, ডেনী তোমার বিরহ যাতনা এত বেশী অনুভব করবে। ও উঠতে বসতে সর্বাবস্থায় তোমারই কথা বলে। যখন আমরা খাওয়ার জন্য বসি, তখনও নিজেরই সাথের একটি খালি চেয়ারের সামনে টেবিলের উপর প্লেট ও কাঁটা চামচ ছুরি ইত্যাদি সাজিয়ে বলতে থাকে ঃ "এটা আমার আব্বুর জন্য।" ওর এমন অবস্থা নিয়ে প্রতিদিন পুরো সময়টা কাটানো আমার পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু এক দিন মুসীবতের এ ঘনঘটা অবশ্যই শেষ হবে। ডেনী তোমার চিঠি উচ্চস্বরে পড়ে আমাদেরকে শুনায় এবং কাঁদায়। ও আমাকে বার বার বলে, আমি যেন তোমাকে বলি, পহেলা অক্টোবরের ঠিক বেলা একটার সময় ওর জন্ম। তুমি যেন ঠিক সে সময় ওর ছবিটিতে চুমো খাও। এটাই হবে ওর জন্য তোমার পক্ষ থেকে জন্মদিনের সবচেয়ে বড় উপহার এবং ওও প্রত্যুত্তরে তোমার ছবিকে মহব্বতভরে চুমো খাবে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করবে।

ও আজ আমাকে বলেছে, "আম্মু! আমাকে রেড ক্রসের কর্মীদের কাছে নিয়ে চলো, আমি তাদেরকে বলব, যেন তারা আমার আব্বুর সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। যদি একবার তারা এমন করে, তাহলে তকদীরও আমাদের একজনকে আরেকজন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।" ও ঠিকমত খানা খায় না, ফলে ওর ওজন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ও খুবই সামান্য খায়, আর তাও যখন আমি ওকে তোমার দোহাই দেই। আজ আমি ওর কামরায় একটা পত্র পেলাম। সে পত্রটা লেখা হয়েছে বানজালুকা টিভির নামে। ও সে পত্রটি যেভাবে লিখেছে, তা দেখে মনে হয় না যে, এত ছোট্ট একটি বালক এ চিঠি লিখেছে। সেখান থেকে কয়েকটি লাইন উদাহরণ স্বরূপ লিখে দিলাম ঃ

"এমন কেউ কি আছে, যে আমাকে আমার আব্বুর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবে, কিংবা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে! সৃষ্টিকর্তার দোহাই দিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি, তারা যেন সামনে অগ্রসর হয় এবং আমাকে সাহায্য করে। আমি আমার জানের কসম খেয়ে বলছি, আমার আব্বুর এই অনর্থ যুদ্ধ, এসব অস্ত্রশস্ত্র ও এসব রাজনীতির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই।"

আমাদের গৃহ তল্লাশীর সময় ও অনুসন্ধানকারীদের কাছেও বারবার অনুরোধ করেছে, তাদেরকে সব কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছে। ওর চোখ দুটো সে সময় অশ্রুতে টলটল করছিল এবং ভয়ে ছিল আতঙ্কিত। আমরা অতিসত্বর প্রেজডোর ত্যাগ করে চলে যাবো। এছাড়া উপায় নেই, কারণ, এখন আমাদের জন্য এখানে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। প্রতিদিন তদন্তের নামে লোকদের নিয়ে যাচ্ছে, এরপর তাদের আর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এরির ব্যাপারটি নিয়ে বেশী শঙ্কিত। কারণ, ও এখন যুবক হয়ে গেছে, আর সবচেয়ে বেশী যুবকদেরই গ্রেফতার হচ্ছে। আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদের সামনে কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নেই। আল্লাহর উপর ভরসা করেই চলে যাচ্ছি। তবে এখন থেকে তোমার ভাই তাওফীকের মাধ্যমে তোমার সাথে আমাদের যোগাযোগ হবে। আরেকটি কথা না লিখলে চিঠিটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তা হল, এরির সাথে সাথে ডেনীও নামায পড়তে শুরু করেছে। ওরা নামাযের পর তোমার জন্য ও বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে থাকে।

পরিশেষে ইলমা, ডেনী ও এরির পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ছালাম ও অনেক অনেক ভালবাসা।"

ইতি—
তোমার ইলমা

জিমু পত্রখানা অনেকবার পড়ল। একবার তার মনে হল যেন তার কণ্ঠনালীতে কোন গোলা আটকে গেছে। শ্বাস রুদ্ধ হতে লাগল। বেদনার একটা প্রচণ্ড লহর তাকে চিৎকার করতে বাধ্য করছে। রেডক্রসের মাধ্যমে মাসে একবার কয়েদীদের নিকট তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বার্তা

আসতো। এগুলো ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করা হতো। দশদিন পর্যন্ত পত্রগুলো তাদের কাছেই পড়ে থাকতো। ভালমত যাচাই-বাছাই করে, তার পরেই সে পত্রগুলো তারা কয়েদীদের হাতে তুলে দিত। এরূপভাবে কয়েদীদেরকে তাদের প্রেরিত পত্রের উত্তর পেতে পেতে মাসখানেক সময় লেগে যেত। চিঠি বন্টনের দিন কয়েদীদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করা হতো। তারা গভীর মনোযোগ সহকারে নাম ডাকা শুনতো। যার নাম ডাকা হতো, তার চেহারাটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। বাকীরা খুবই নিরবতা পালন করে আগামীবার তাদেরও চিঠি আসবে এ প্রত্যাশা নিয়ে সেখান থেকে উঠে নিজ নিজ বন্দীশালায় ফিরে যেত।

গতকাল কিছুলোকের চিঠি এলো। তাদের মধ্যে আসেফ এবং ডাক্তার ছাদেকোভিচ-এর নামও ছিল। ঈসার স্ত্রী সীকা লিখেছে—

"ঈসা! তুমি যদি এই আসমানের নীচে কোথাও জীবিত থেকে থাকো, তাহলে আমাদেরকে সংবাদ দাও। তোমার পরিবারের সবাই তোমার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে।"

ইতি—

সীকা......

আর আসেফের নামে যে পত্রটি এসেছে, অজানা কারণে আসেফকে তা দেয়া হয়নি। ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ জানেন, এখন তার আত্মীয়-স্বজনরা তার তালাশে কোথায় কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরাফেরা করবে!!

জিমু এরি ও ডেনীর ছবিগুলো অশ্রুভরা চোখে আবার দেখল। নিজের চেহারাটিকে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত আস্তিন দিয়ে সাফ করলো এবং আরেকবার পড়তে লাগল 'ঠিক একটার সময়' ওহ! আজই তো হচ্ছে পহেলা অক্টোবর, ডেনীর জন্মদিন! এখন হতে আধা ঘন্টা পর একটা বেজে যাবে এবং ডেনীর এগারো বছরের হয়ে যাবে। আর এটাই হবে প্রথম দিন যে জন্মবার্ষিকীর দিনে ওর বাবা ওর কাছে থাকবে না। এ ভেবে পুনরায় জিমুর চোখ বেয়ে বন্যার স্রোতের মত অশ্রু প্রবাহিত হতে

লাগল। মুহরেম জিমুর কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ

"আমি জানি দোস্ত! এমন মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করা কত মুশকিল, কিন্তু তবুও আমাদেরকে এ দুঃখের পথ অতিক্রম করেই যেতে হবে। নিরাশ হয়ো না, কাঁদতে চাও তাহলে মন খুলে কাঁদ। এতে মন হালকা হবে। তুমি তোমার ছেলের কথা চিন্তা করে কাঁদছো, আমার দিকে তাকিয়ে দেখো, আমিও ভারাক্রান্ত, সজল.....। তোমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকার দরকার যে, তোমার বেটা তোমাকে নিয়ে গৌরব করে। ও ভাল মত জানে, তুমি নির্দোষ! তুমি কোন অন্যায় করনি।"

মুহরেমের নয়ন দু'টিও অশ্রুতে ছলছল, জিমুর কাঁধে মহব্বতের সাথে চাপ দিল। কথাগুলো তার শুষ্ক ঠোঁট দিয়ে যেন জলপ্রপাতের ন্যায় গড়িয়ে পড়ল।

ঠিক একটার সময় জিমু ডেনীর সেই ছোট্ট ছবিটিকে দেখল। তাতে চুমো খেলো। তরা গলায় পুনরায় কোন জিনিস আটকে যাওয়া অনুভব করল। জমিন থেকে কিছু শুকনো ঘাস উঠালো এবং মর্দন করে পিষে ফেলল, অতঃপর একটা চিঠি কাগজের ভিতরে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত জ্বলন্ত ঘাস হতে উত্থিত আগুনের কুণ্ডলী দেখতে লাগল। অতীত স্মৃতির আলোকে ডেনীর ছবিটা পুনরায় তার সামনে ভেসে উঠল। তারপর গত বছরের জন্মবার্ষিকীর দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। টেবিলে রাখা একটা বড় কেক, সাজানো অনেকগুলো মোমবাতি, বিভিন্ন সুস্বাদু পানীয় দ্রব্য দিয়ে তা ভরা। তাজা ভুনা গোশতের সুঘ্রাণ.... বন্ধুদের সমাবেশ.... সঙ্গীত.....

অনেক কথা, অনেক চেহারা তার মানসপটে ভেসে উঠলো।

দুঃখের সময় ধীরে চলে

দিনগুলো অনেক ধীরগতিতে অতিবাহিত হচ্ছে। সন্ধ্যার রক্তিমাভা গোশালার কাঠের দেয়ালের ফাঁক অতিক্রম করে জিমুর চেহারার উপর বিভিন্ন ধরনের রং ছড়াচ্ছে। জিমুর কাছে তার বন্দী সাথীরা চলন্ত প্রতিবিম্ব মনে হচ্ছে। তাদের চিন্তাশক্তি যেন অতীত দিনের গণনা এবং যোগ, বিয়োগ নিয়ে ব্যস্ত। নিজেদের কম্বলগুলোর মধ্যখানে ছিদ্র করে কাঁধের উপর জুব্বার মত ঢেলে রেখেছে। এ পার্বত্য অঞ্চলগুলোর ন্যায়

পৃথিবীর কোথাও রাতের অন্ধকার মানুষকে এত গভীর নিস্তব্ধতার জালে আবদ্ধ করে না। রাতের আঁধার আগমনের সাথে সাথে চারদিকে গভীর নিরবতা ছড়িয়ে পড়ে। শীতের প্রচণ্ডতা থেকে পরিত্রাণের জন্য কয়েদীরা একজন আরেকজনের সাথে গা লাগিয়ে রাখে। নিজেদের বিশেষ চিহ্নযুক্ত কম্বলগুলোকে মজবুতভাবে নিজেদের চতুর্পাশে পেঁচিয়ে নেয়। দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে বাতাস ঢুকে তৈলের ছোট্ট হারিকেনের আলোকে এমনভাবে ঝাপটা দিতো, মনে হতো যেন হারিকেনটি একেবারেই নিভে যাবে। ছাদে লাগানো প্লাষ্টিকের যে সব শীট আলগা হয়ে গেছে, সেগুলো বাতাসে বাজতে থাকে। দরজার কাছে কোন ছায়া খুব কমই নড়তে দেখা যায়।

রাতের বেলায় পায়খানা, প্রস্রাবের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি বড় টিনের ড্রামকে কেটে অর্ধেক করে নেয়া হয়েছিল। কয়েদীরা নিজেদের অসুস্থ ও যখমী পাকস্থলীর উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য সেটাকে টয়লেট হিসেবে ব্যবহার করতো। অথচ তার সাথীরা সেখান থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে শুয়ে থাকতো। এ কারণে বাতাসে একটা অসহ্য দুর্গন্ধ সবসময় বিরাজ করতো। অনেক কয়েদী নিজেদের জুব্বা সদৃশ কম্বলগুলো আরো সংকুচিত করে নিজেদের মাথাও তার মধ্যে লুকিয়ে নেয়। কিছু লোক তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তো এবং পুরো রাত বিভিন্ন আওয়াজে নাক ডেকে গভীর নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকতো। আবার কিছু কয়েদী ঘুম আসবে আসবে করে সমস্ত রাত ছটফট করে কাটিয়ে দেয়, তবুও তাদের চোখে ঘুম আসে না।

দুঃখের দিনের নতুন শত্রু

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে দেয়ালের ফাঁকা জায়গা দিয়ে ডজন ডজন জংলী ইঁদুর ভিতরে ঢুকে পড়ে। এবং মাঝে মাঝে দুর্বল ছাদের সিমেন্টকে নখ দিয়ে খোঁচাতে থাকে। আবার কখনো কখনো কয়েদীদের কম্বলের উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। এমনকি কম্বলের ভিতর ঢুকে তাদেরকে উৎপাত করে। একবার ফাতকু নিজের বিস্কুটের ডিব্বায় একটি ইঁদুর দেখতে পেয়ে সেটাকে ধরে ফেলল এবং রমিজকে ভয় দেখানোর জন্য তার কম্বলের নিচের খড়ের স্তূপে ছেড়ে দিল। গ্লেমিকের খলিল একটি

গর্ত থেকে ইদুরের চারটি নবজাত বাচ্চা পেলো। বাচ্চাগুলোর এখনো চোখ ফোটেনি। অনেক কয়েদী মানজেকা ক্যাম্পে এসেই প্রথমবার জানতে পেলো যে, ইদুর দেয়ালের সোজা উপরেও চড়তে পারে। কয়েদীরা এসব ইদুরের সাথে এতই পরিচিত হয়ে পড়েছিল যে, প্রায়ই তারা খোরাকের উচ্ছিষ্ট অংশ আলাদা করে একদিকে ইদুরের জন্য রেখে দিত। কিছুলোক রাতে শীতের তীব্রতার কারণে ঘুম থেকে জেগে উঠে কম্বলগুলো ভালমত শরীরের চার পাশে জড়িয়ে নিয়ে গরম করার জন্য এক হাত অন্য হাতের সাথে দ্রুত ঘষতো এবং গোশালার একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত হাঁটতো। এরপর হামাগুড়ি দিয়ে নিজের খড়ের বিছানায় ঢুকে পড়তো। ডিউটিতে নিয়োজিত গার্ডরা তাদেরকে ভোর পাঁচটায় জাগিয়ে দেয়। তারা রাতভর বন্ধ থাকা দরজার শিকলগুলো খুলে দেয় এবং দশজনের গ্রুপ বানিয়ে বন্দীদেরকে টয়লেটে নিয়ে যায়। এ টয়লেটগুলো আসলে দশ ফুট লম্বা কাঠের মজবুত তক্তা। যেগুলোকে একটি গর্ত খনন করে উপরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার উপরে কিছু টালি বিছিয়ে ছাদের মতো বানানো হয়েছে। মানজেকা ক্যাম্পে অবস্থান কালে কয়েদীদের প্রতি দু' সপ্তাহ পরপর একটা নতুন গর্ত খনন করতে হত। ফলে, অস্থায়ীভাবে প্রয়োজন পূরণের জন্য পুনর্বার নতুন টয়লেট প্রস্তুত হয়ে যেত। গর্ত খননের জন্য যেসব বেলচা ও কোদাল ব্যবহার হত, সেগুলো প্রতি রাতে ব্যবস্থাপনার অফিসে জমা দিতে হয়। এই নিয়মটি বাবুর্চিদের ব্যবহারের ছুরির বেলায়ও প্রযোজ্য ছিল।

নবম অধ্যায়
জাহান্নামের নবম গহ্বর

একটি আঁকাবাঁকা কাঁচা সড়ক বাবুর্চিখানার ডান দিক অতিক্রম করে বানজালুকার দিকে চলে গেছে। খানা খাওয়ার সময় কয়েদীরা বারবার এমন আশাভরা দৃষ্টিতে সে সড়কটির পানে তাকিয়ে থাকে। যেন তারা ওদিক থেকে কোন সুসংবাদ পাওয়ার প্রত্যাশা করছে। এ সড়কটি ক্যাম্প পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। সামান্য দূরেই সড়কের একটি মোড়ের কাছে বালুর সামান্য উঁচু এক টিলা। ক্যাম্পে কারোর আগমনের পূর্বে কয়েদীরা টিলার কাছে ধুলোবালির একটা বাদল উঠতে দেখে, তার পরে পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে এসব গাড়ি কিংবা ট্রাক এগিয়ে আসে। এরপরই ইঞ্জিনের শব্দ স্পষ্টভাবে কানে ভেসে আসে। সাধারণতঃ এ সব গাড়ী রেডক্রস কিংবা ক্যাম্পের অফিসারদের। যখন সাপ্লাইয়ের ট্রাক আসে তখন ধুলোবালি অধিক পরিমাণে উড়তে থাকে।

নিরাশ হয়ো না

"হায় সেইদিন কি আর আসবে না, যেদিন আমাদের বন্দীশিবির থেকে মুক্ত করার জন্য বাসগুলো ধুলো উড়াবে....।'

রায়েক জোকোনোভিচ্ বাবুর্চিখানা থেকে আশাভরা দৃষ্টিতে সেই টিলা ও সড়কটি বারবার দেখে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ঃ

"এখনো সে দিনটি আসতে অনেক দেরী।" রেশনের লাইনে নিজের পালার অপেক্ষায় দাঁড়ানো মুহরেম উত্তর দিল।

"এত বেশী নিরাশ হয়ো না, মুহরেম! আমার মনে হয় না যে, আমরা প্রচণ্ড শীতের দিন পর্যন্ত এখানে থাকবো।" জিমুর এ কথাটির আশাব্যঞ্জক সমর্থন চতুর্দিকে থেকে আসতে শুনা গেল।

কিন্তু মুহরেম উত্তরে বলল ঃ "আমরা এখানে বসে শীত ও দেখবো, তারপর বসন্তও দেখবো।"

কোযারকের অধিবাসী ঈসা, মুহরেমের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে মুহরেমের কথা খণ্ডন করে বলল ঃ

"আমার তো প্রবল ধারণা, আমরা বেশীদিন এখানে থাকবো না।

আজ আমি ঘটনাক্রমে গার্ড ও ক্যাম্পের কমাণ্ডারের কথা শুনে ফেলি। ডাক্তার ডিংগার বলছে, যে সব গবাদি পশুকে তারা এসব গোশালা থেকে বের করে পাহাড়ে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে রেখেছে যদি এসব পশুকে নিরাপদ ছাদের নিচে না আনা হয় তাহলে মরে কাঠ হয়ে যাবে।"

"তার অর্থ এটাই যে, হয়তঃ সে সব গরু, মহিষই আমাদের মুক্তির কারণ হতে যাচ্ছে", মুহরেম পুনরায় মুচকি হেসে তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলল।

জিমু একটু জোড়াতালি লাগিয়ে বলল ঃ "কাউকে তো সে ভূমিকা পালন করতেই হবে। যদি মানুষ সে যিম্মাদারী পালন না করে, তাহলে গরু মহিষরাই সে দায়িত্ব পালন করবে।"

"আমি শুনেছি, কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক এসেছে।" রায়েফ বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে বলল।

সে আরো বলল, "ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ বলেছে, সেসব সাংবাদিকরা আবার আসবে এবং আমাদের সবার ছবিও নিবে।"

বাস্তবেও সেদিন ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বর্নার্ড কোশিয়ার একটি টেলিভিশন টিমকে সাথে নিয়ে মানজেকা ক্যাম্পে এসেছিল। সে কয়েকজন বন্দীর সাথে কথাও বলেছে এবং কর্তৃপক্ষের কড়া তত্ত্বাবধানে তাদের কিছু সাক্ষাৎকারের ভিডিও ফিল্ম বানিয়েছে। যার প্রত্যেকটি শব্দ ক্যাম্পের রেকর্ডে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশী ছবি নেয়া হয় 'গোরেঞ্জাছানেকা' অঞ্চলের উসামা ডেডোভিচ্–এর। তাকে জীবন্ত লাশের মত দেখাতো। তার ওজন বড় জোর ৬৫ পাউণ্ড হবে। তাকে তার ঘর থেকে গ্রেফতার করে 'কালজাগ' থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। দু'দিন পর কালজাগ থেকে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত মানজেকার স্কুল অডিটোরিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখান থেকে তাকে তার এলাকার চারশ' লোকের সাথে পায়ে হাঁটিয়ে মানজেকা ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়েছে।

তবুও মুক্তির ক্ষীণ আশা

সাংবাদিকদেরকে মাত্র দশ মিনিট বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হয়। এরপর ক্যাম্প অফিসার তাদেরকে সেখান থেকে

বহির্গমন গেটের দিকে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যেসব সাংবাদিক প্রতিনিধিদল মানজেকা শিবির পরিদর্শন করতে আসে তাদের অনেকেই কয়েদীদেরকে বলেছে, এখন বিশ্ব তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে এবং মানজেকা ক্যাম্পে বন্দীদের যে ভিডিও ফিল্ম প্রস্তুত করা হয়েছে তা দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। কতক টেলিভিশন টিমের লোকেরা সাথে সিগারেটও নিয়ে আসে। তারা মাথাপিছু একটি করে সিগারেট বিতরণ করে। কয়েদীদের করুণ কাহিনী শুনে চোখে অশ্রু সংবরণ করা খুবই মুশকিল। বিখ্যাত টিভি চ্যানেলগুলোর প্রতিনিধিরা এবং প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের রিপোর্টাররা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে পৌঁছতে শুরু করেছে। রেডক্রসের প্রতিনিধিরা প্রতি বুধবার রীতিমত আসছে। তাদের নিকট থেকে জানা গেছে, বসনিয়ার অচলাবস্থার নিরসনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনপক্ষই (বসনিয়ান মুসলমান, সার্ব ও ক্রোট) বন্দী শিবির তুলে নেয়ার ব্যাপারে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে। যদিও আলোচনা খুবই ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, তবুও তারা আশাবাদী, সমস্যাটি বেশী দীর্ঘায়িত হবে না। বন্দীদেরকে তারা এ কথাও বলেছে যে, মুক্তির পর তারা সরাসরি নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। প্রথমে তাদেরকে কোন নিরপেক্ষ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তারা তাদেরকে বসনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করবে।

শুভসংবাদ (?)

"একটি শুভ সংবাদ, জার্মানী, হল্যাণ্ড, আমেরিকা, নরওয়ে, নিউজিল্যাণ্ড সহ আরো কয়েকটি রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় তোমাদেরকে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছে।"

"তোমরা যদি আমাদের অর্ধ পৃথিবীও দিয়ে দাও, আমরা তা চাই না, আমাদের শুধু বসনিয়াই দরকার।" জিমু বিড় বিড় করে বলল। শব্দগুলো তার গলায় আটকে যাচ্ছে। নিদারুন দুঃখে তার গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। মুহরেম তার মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করে উৎসাহিত করার জন্য বলল ঃ "আমার মনে চায়, আমি আমার গলায় পূর্ণ জোর

লাগিয়ে গাইতে শুরু করি—হে আমার বসনিয়া, আমার মাতৃভূমি! তুমি হিম্মত হারিও না।”

কিন্তু শব্দগুলো তার গলায় আটকে গেল। তার শরীর শিহরিত হয়ে উঠল এবং কম্বলের নীচে তার পাঁজরকে জোর করে চেপে ধরল।

হিজরত

কিছুদিন পর জিমু তার ভাই তাওফীকের একটি বার্তা পেল, “তার স্ত্রী এবং ছেলেরা একটি কাফেলার সাথে প্রেজডোর থেকে ভেলাছক, ট্রেভেংক এবং ছাপলটের পথ দিয়ে জাগরেব অভিমুখে চলে গেছে। সেখান থেকে হাল্লাদ মুসলেমুভিচ্ তাদেরকে অষ্ট্রিয়ায় নিজের ঠিকানা ক্লেগান ফোর্টে নিয়ে গেছে। হাল্লাদ মুসলেমুভিচ্ জিমুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, অত্যন্ত দূরদর্শী। পরিস্থিতির ব্যাপারটি পূর্বেই উপলব্ধি করে অনেক আগেই পরিবারসহ প্রেজডোর থেকে হিজরত করে অষ্ট্রিয়ায় চলে গেছে। সে জিমুকেও দেশ ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু জিমু তার কথায় কর্ণপাত করেনি। পরিবারের সদস্যরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারায় জিমুর মনোবল অনেকটা বেড়ে গেছে। সে এখন পূর্বের তুলনায় বেশী সহজে নিজের বন্দীজীবনের কষ্ট সহ্য করতে পারে। ‘বসনিয়ার সূর্যটা পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত’ হয়তঃ গণহত্যার ব্যাপকতা বুঝানোর জন্যই মুহরেম সূর্যের নামটি উল্লেখ করতো।

ধীরে ধীরে কয়েদীদের অনুভূতিশক্তি লোপ পেতে লাগল। অথচ, এই অনুভূতিশক্তিরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। বর্তমান দূরাবস্থা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীন জীবনধারা, তাদের জীবনশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে। কোমরের পিছনে হাত রাখা, আর মাথা অবনত করে রাখা—এই মানহানীকর অনুভূতি তাদের শীর্ণ ও দুর্বল দেহের প্রতিরোধ শক্তিকে দিন দিন নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে।

বিশ্বস্ততার পুরস্কার

চল্লিশ বছরের কম বয়সী প্রতিটি বন্দীকে প্রতিদিন বেগার খাটতে হয়। সকালে নাশতার পরপরই তাদেরকে গেটের সামনে লাইন ধরে দাঁড়

করানো হয়। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে সশস্ত্র সেনাদের প্রহরায় কাজে পাঠানো হয়। কিছুলোক গবাদিপশুগুলোর দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করে। অনেকে নিকটেই অবস্থিত ক্ষেত হতে আলু সংগ্রহ করে। আবার কেউ কেউ ভুট্টার ছাল তুলে সেগুলোকে পরিস্কার করে। আর বাকী কয়েদীদেরকে ট্রাকে করে পাঁচ ছ' মাইল দূরে অবস্থিত জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েদীরা লাকড়ী কেটে ট্রাকে ভরে। সাধারণতঃ ফৌজরা এসব লাকড়ী ভরা ট্রাকগুলো নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যায় বা বাজারে নিয়ে এগুলো বিক্রয় করে। কয়েদীদের ধারণা সার্বরা তাদের থেকে এভাবে যে বেগার নিচ্ছে এটা সার্বদের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার পুরস্কার।

একবার গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাঠ কাটার নির্মম পরিশ্রমের প্রাক্কালে অনেক কয়েদীকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে দেয়া হয়। কোযারকের একজন বন্দী লাকড়ীভরা এমন একটি ট্রাক চালানোর দায়িত্ব পালন করতো। সে ট্রাকটি কিছুদিন পূর্বেও তারই মালিকানাধীন ছিল। সার্বরা কোযারকের উপর আক্রমণকালে তার থেকে তা জোর করে নিয়ে নেয়।

আনিস এবং ফিকু ব্যবস্থাপনা অফিসের সাথে অবস্থিত গ্যারেজে কাজ করতো। কখনো গার্ডরা তাদের থেকে দূরে চলে গেলে তারা মেরামতের জন্য গ্যারেজে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ীর রেডিও চালিয়ে খবর শুনে নিতো এবং পরে তাদের সাথী–সঙ্গীদেরকে এসব খবরাদি অবহিত করতো। যেসব কয়েদীরা ভুট্টার ছুলতো, তারা যখন দেখতো, গার্ডরা কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে গেছে কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছে তখন তারা কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে পাকা ভুট্টা ছুড়ে সাথীদেরকে দিতো। পরে তারা এসব ভুট্টা বাবুর্চিখানার আগুনে পুড়ে খেতো, কিংবা এসবের বদলে এক–দুটি সিগারেট হাসিল করতো।

সিটু হাসবাক নামের এক গার্ড একবার এক বন্দীকে এভাবে ভুট্টা ছুঁড়ে মারতে দেখল। সে কয়েদীদের সবার সামনে তাকে কঠিন শাস্তি দিলো। তাকে মারাত্মকভাবে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। এরপর তাকে নিয়ে ছয় নম্বর গোশালায় গেল। এই কয়েদখানাটি গেটের সবচেয়ে কাছে ছিল। সিটু সে কয়েদীকে ছয় নম্বর গোশালার সমস্ত

কয়েদীদেরকে যত শক্তি আছে তা ব্যয় করে ডাণ্ডা লাগানোর নির্দেশ দিল। কয়েদীরা নিরুপায় হয়ে তার হুকুম পালন করতে বাধ্য হল। কমজোর ও দুর্বল কয়েদীরা যখন আঘাতের পর আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তখন সিটু কুত্তার মত ঘেউ ঘেউ করে উঠত।

একবার প্রেডোজেভিচ্ নামের এক কারারক্ষী ছয় নম্বর গোশালায় এক বন্দীকে খোঁজ করল। তার ব্যাপারে অভিযোগ ছিল যে, সে সিগারেটের বদলে নিজের কম্বলখানা বিক্রয় করে দিয়েছে। যখন কেউই এ অপরাধ স্বীকার করল না, তখন কারারক্ষীটি জিমুসহ প্রথম ও দ্বিতীয় সারির বিশজন কয়েদীকে একটানা তিন ঘন্টা পর্যন্ত নিরবে দাঁড় করিয়ে রাখল। এ কারণেই বন্দীরা গার্ডটিকে 'আলী বাবা' আখ্যায়িত করেছিল এবং জিমু ও তার সাথীদের নাম পড়েছিল 'চল্লিশ চোর'।

একজন ভাল মানুষ

বানজালুকার এক সৈনিক নাম জুকা। সে একবার দু'জন বৃদ্ধ কয়েদীকে শুধু এজন্য শাস্তি প্রদান করল যে, তারা তার অনুমতি ছাড়া গোশালার বাইরে পা রেখেছিল। সে পালাক্রমে উভয়ের পেটে হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে অন্তত দশটি করে আঘাত হানল। ক্যাম্পের প্রধান পরিচালক স্পাগা ঘটনাক্রমে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। এ করুণ দৃশ্য দেখে সবার সামনেই সেই সৈনিককে ধমক দিয়ে বলল ঃ "এ কেমন কাজ করছো তুমি! তুমি কেন এসব বেচারাদেরকে মারছো.... অথচ এরা তো তোমার বাবার বয়সের। চলো, এক্ষুণি বানজালুকা শহর ত্যাগ করতে হবে। আসবাবপত্র গুছিয়ে নাও।"

সকলেই জানে এ নির্দেশের অর্থ কি! এখন তাকে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়া হবে। দু'দিন পর সংবাদ এলো, সে বানজালুকায় আত্মহত্যা করেছে। সে নিজ গৃহেই পিস্তলের নল মুখের ভিতর ঢুকিয়ে ট্রিগার চেপে দিয়েছিল।

স্পাগারের জীবনে এ ধরনের পদক্ষেপ বহু। বিভিন্ন সময়ে সে মযলুম কয়েদীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। সে স্কুটারে আরোহণ করে ক্যাম্পের চারদিকে টহল দেয়। কখনো গোশালায় ঢুকে পড়ে।

একবার সে জিমুদের গোশালায় ঢুকে ভেস্পার উপর বসেই মৃদু মৃদু হেসে ছাদের আংটাগুলোতে লাগানো জালের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ "বাহ্! বেশ ভালো তো, তোমরা তো এ জায়গাটিকে খুবই সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছো। এখন তোমাদেরকে নববর্ষ উদযাপনের জন্য মাত্র একটি সান্তাক্লোজের প্রয়োজন।"

এ সবই খেল-তামাশা

একদিন মুহরেম তার নৈরাশ্যজনক কথার বরাত দিয়ে বলল ঃ "আমি তোমাদেরকে বলি নাই, আমাদেরকে শীতের মৌসুমও এখানেই কাটাতে হবে।"

প্রেজডোরে বেকারীর ডিরেক্টর টারনোছেক তার প্রত্যুত্তরে বলল ঃ "এমন হবে না মুহরেম! কারণ, এমতাবস্থায় আমাদের শীতের কষ্ট সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। কারণ তখন পাহাড়গুলো দশ ফুট বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যাবে। বাইরে কোন রসদ এখানে আসতে পারবে না। যদি ক্যাম্পওয়ালাদের কাছে খাদ্যভরা গুদামও থাকে, তবুও শীতের প্রচণ্ডতায় আমাদের কেঁপে কেঁপে মরতে হবে।"

"আচ্ছা, তাহলে এতসব ষ্টোভের ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে? এগুলো কি ব্যবহার করা হবে না?" মুহরেম ক্যাম্প প্রশাসনের আবেদনে রেডক্রস কর্তৃক সরবরাহকৃত কেরোসিন তেলের চুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

জিমু বলল ঃ রাখ, এসব বাজে কথা। তুমিও তো জানো যে, কুতুজিনাকার ষ্টিল মিলের চুল্লিও যেখানে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যায়, সেখানে এসব গুটিকয়েক খেলনার মত ষ্টোভ কি কাজে আসবে? বলো তো দেখি!"

মুহরেম বলল ঃ "হাঁ, আমি এসব ভালভাবেই বুঝি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এ মুহূর্তে এসব ষ্টোভ কেন সরবরাহ করা হয়েছে?"

মিরোভিয়াহ জানে যে, মুহরেমের নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিকোণ বদলানো মুশকিল, তবুও আলোচনায় শামিল হয়ে বলল ঃ "ভেবে দেখো, এরা পানি সাপ্লাই করার জন্য কতগুলি পাইপ বিছিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এখানো তো আমাদেরকে পানি সরবরাহ করেনি। তাদের কাছে

ডিজেল আছে, কিন্তু তবুও আমাদেরকে কেন ঝিল থেকে ময়লা পানি বোতলে ভরতে হবে? ..... এসবই হচ্ছে একটা খেল-তামাশা....। এরা শুধুই সময় ব্যয় করছে।"

পশ্চাৎদিক থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এলো ঃ বলল—

"আমি শুনেছি, আজ পুনর্বার তলব হবে। শুনেছি, আমাদের কিছু লোককে বন্দী বিনিময় হিসেবে মুক্তি দেয়া হবে।"

ফিহুছার হাতলিক, একসময় সে সারায়েভো রেডিও'র প্রতিনিধি ছিল। সবার সামনে এসে বসে সিগারেট টান মারতে মারতে এ কথাটি বলল। আরো বলল—

"আমাদের প্রহরায় মোতায়েন শামছেভ নামের কারারক্ষী আমাকে বলেছে, সে স্বয়ং জেলকর্তা স্পাগাকে একজন ফৌজী অফিসারের সাথে এসব কথা আলাপ করতে শুনেছে।"

ঠিকই সেইদিন তৃতীয় প্রহরে চব্বিশজন বন্দীকে তলব করা হলো। তাদের মাঝে ফিহুও ছিল। ফিহু নিজের যৎকিঞ্চিৎ আসবাবপত্র গুছিয়ে নিল এবং দুঃখভরে নিজের মাথাটি ডান-বাম দিকে ঝটকা মারল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার পাঁচ বছরের ছেলের ছবিটিকে গভীরভাবে দেখল। চোখটি তার অশ্রুতে ছলছল। আস্তিনের কোণ দিয়ে ছল ছল করে উঠা চোখটি মুছে নিল এবং ছবিটি নিজের সামানের মধ্যে রেখে দিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াল। আনুমানিক আধাঘন্টা পর একটি মেটে রঙের সামরিক বাস বাবুর্চিখানার কাছ দিয়ে চলে গেল এবং দূর পর্যন্ত আঁকা বাঁকা কাঁচা সড়কে ধুলোবালি উড়িয়ে বালুর টিলার কাছ দিয়ে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে দৃষ্টি হতে উধাও হয়ে গেল।

খাম-খেয়ালীপনা

পরের দিন সকালবেলা নাস্তারও পূর্বে সমস্ত ক্রোয়েশিয়ান বংশোদ্ভূত বন্দীকে তলব করা হল। তাদের সবাইকে নির্দেশ দেয়া হল, তারা যেন পনের মিনিটের ভিতর নিজ নিজ আসবাবপত্র গুছিয়ে গেটের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। চারটি বাসে তাদেরকে উঠানো হল। আমারেস্কা হতে মানজেকা ক্যাম্প সফরের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে

সমস্ত বন্দীরা পানির বোতলগুলো ভরে নিজেদের কাছে রেখেছে। কারণ, কেউই জানে না, এ সফর কতো দীর্ঘ হবে। বাস যাত্রা শুরু করলে এক সৈনিক তার আসন হতে উঠে দাঁড়াল এবং প্রতিটি বন্দীর কাছে গিয়ে তাদের প্রত্যেককে মুষ্টি ভরে ভরে লবণ প্রদান করল এবং সবাইকে লবণগুলো ভালমত খেতে নির্দেশ দিল। সাথে সাথে হুমকিও প্রদান করল যে, যদি লবণের একটি কণাও তাদের হাতে কিংবা সিটে দেখা যায়, তাহলে তাদের সারাজীবন অনুশোচনা করতে হবে। এই বলে বেহায়ার মত খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

এসব বন্দীর মাঝে প্রেজডোর হোটেলের ডাক্তার নুনুও আছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও সবার প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব। নুনু লবণগুলো জিহ্বা দিয়ে সামান্য চেখে দেখলো, এগুলো এত তিক্ত ও বিস্বাদ লাগল যে, সঙ্গে সঙ্গে থুথু নিক্ষেপ করে তা ফেলে দেয়ার ইচ্ছা হলো। কিন্তু তা করতে সাহস পেলো না। সৈনিকটির হুমকিতে তিনি বাস্তবিকই আতঙ্কিত। এজন্যই তিনি এহেন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গার্ডের দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্যদিকে নিবদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে অতি সতর্কতার সাথে লবণগুলো মোজার ভিতর এমনভাবে ঢেলে দিলেন যেন একটি ক্ষুদ্র কণাও বাইরে কোথাও পড়লো না। তবে কিছু লবণ হাতে লাগানো থাকতে দিলেন, যা চেটে খাওয়ার সময় তার মুখটির অবস্থা খুবই করুণ হয়ে যাচ্ছে। সার্ব সৈনিকটি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণাভাব নিয়ে বন্দীদের মধ্যখান দিয়ে চলার সময় কখনো কখনো বিনা কারণেই বন্দীদের উপর প্রবলবেগে লাঠি বর্ষণ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাসগুলো বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে ডারভার পৌঁছল। ডারভার হতে আরো দু'জন সৈনিক বাসে আরোহণ করল। তারা এসেই লোহার ডাণ্ডা দিয়ে নির্দয়ভাবে বন্দীদের মাথায় ও পিঠে আঘাত করতে লাগল। তাদের মধ্য হতে আরেকজন সৈনিক সিটের উভয় পাশে আসবাবপত্র রাখার বক্সের উপর হাত রেখে দাঁড়াল এবং এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কয়েদীদের পাঁজরের উপর প্রচণ্ডবেগে লাথি মারতে মারতে সামনে অগ্রসর হলো এবং সে বললো ঃ

"আমি জানি, তোমরা এখান থেকে অক্ষত দেহে ফিরে যেতে চাচ্ছো,

তাই আমি তোমাদের মাথা ও চেহারা ছেড়ে দিচ্ছি। তবে আমি তোমাদের গুর্দা বের করে দিতে চাচ্ছি।" এই বলে সেই উন্মাদ সৈনিকটি পাগলের মত হো হো করে হাসতে হাসতে আবার সেই বর্বর খেলায় মত্ত হয়ে গেল।

আশার আলোতে নিরাশার ছায়া

তৃতীয় প্রহরের সময় তারা 'নান' নামক স্থানে পৌঁছল। এ স্থানটি সমুদ্র তট হতে আনুমানিক ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এখন এ জায়গাটি তথাকথিত সার্ব প্রজাতন্ত্র কারাজিনার রাজধানী।

আনুমানিক আধাঘন্টার মধ্যে জাতিসংঘের প্রতিনিধি সহ আমরা ক্রোয়েশিয়ান সৈনিকদের দখলকৃত অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছব। ওখানে তোমাদেরকে ক্রোটদের ক্যাম্পে বন্দী সার্ব আর্মিদের মুক্তির বিনিময়ে পেশ করা হবে। আমরা ওখানে পৌঁছলে তোমরা দু'জন দু'জন করে তাদের বাসে সওয়ার হয়ে পড়বে। কেউ ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে না। নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবে না। এতে তোমাদের প্রাণও যেতে পারে। এটা যুদ্ধ, খেল–তামাশা নয়।"

বন্দীদেরকে এসব কথা একজন সার্বসেনা অফিসার বলল। যার টুপি ও উর্দির আস্তিনে অনেক পদক ও চিহ্ন রয়েছে, যা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, সে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রয়েছে।

বাসগুলো নানে কোন ধরনের বিরতি না করে তা অতিক্রম করে গেল এবং 'ডারনাছ' পেরিয়ে সেখান থেকে আরো পাঁচ মাইল এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল। বন্দীরা নিজ নিজ আসনে মস্তক অবনত করে নির্দেশের অপেক্ষায় বসে রইল। তাদের এই অপেক্ষাকাল প্রায় দু' ঘন্টা দীর্ঘায়িত হল।

"এদেরকে পুনরায় 'নান' নিয়ে যাও, দ্বিতীয় পক্ষ থেকে বন্দী বিনিময়কারীরা আসেনি। আমরা আগামীকাল আবার চেষ্টা করে দেখবো।"—সেই অফিসারটি বাসগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল।

হিংস্র খেলা

তাঁদেরকে পুনর্বার 'নান' নিয়ে যাওয়া হল এবং মিলিটারী ব্যারেকের জেলকুঠরীতে বন্ধ করে রাখা হল। তাদের সঙ্গে যে সকল ফৌজী গার্ডরা

এসেছিল তারা বিশ্রাম নেয়ার জন্য প্রস্থান করল। এখন বন্দীদের দায়িত্বভার গ্রহণ করল স্থানীয় লোকদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ গ্রুপ, যাদেরকে 'নান বয়েজ' বলা হয়। যারা বর্বর কর্মকাণ্ডের জন্য কুখ্যাত। তারা সবাই ছিল মার্শাল আর্টে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এরা সবসময় নিজেদের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য অস্থির। মার্শাল আর্টের লোহার বিশেষ ডাণ্ডা তাদের নিষ্ঠুরতার বিশেষ উপাদান। অসহায় বন্দীদের পেয়ে তারা তাদের হিংস্র খেলা শুরু করে দিল। বেশ কিছু সিভিল বন্ধুদেরকেও তারা ডেকে আনল। আঘাতের সাথে সাথে তারা ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা ও প্রেসিডেন্ট তুজমান ও ক্রোয়েশিয়ান জাতিকে অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা করছে। তারা কয়েদীদের মাতাদেরকে নটী, ব্যভিচারিণী এবং তাদেরকে নাৎসী জার্মানীদের জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করতে লাগল। তাদের নির্যাতন অর্ধরাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। তারা মারতে মারতে অবসন্ন হয়ে পড়লে বন্দীরা তাদের বর্বর আচরণ থেকে অব্যাহতি পেল।

সকালবেলা বন্দীদেরকে জঙ্গলঘেরা একটি উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হল। তাদেরকে সার্ব জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত 'চিটানিক' পরিবেশন করতে বাধ্য করা হল।

দুপুরে সার্ব রক্ষীরা এসে বলল, বন্দী বিনিময় হবে না, কারণ, ক্রোটরা নিজেরাই তাদের স্বজাতিদের ফেরত নিতে চায় না। তাই নির্দেশ হল যেন তাদেরকে এ বাসগুলোতে করেই পুনরায় মানজেকা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা যখন গারানিসানিসকো গারাহোড এবং দারওয়ার অভিমুখে যাচ্ছিল, তখন একজন ফৌজ আওয়াজ করে বলল—

"তোমাদের কেউ কি গান গেতে পারে?"

"হাঁ, আমি পারি।" পিছন দিক হতে একজন উত্তর দিল।

"তুমি কে..... সামনে এসে কথা বল.... এবং নিজের মুখখানা একটু দেখাও।"

এ 'ম্লোটন ডিমাক' নামের এক যুবক। বসনিয়ার বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে সে গান পরিবেশন করে বেড়াতো। যদিও সে এমন পরিবেশে গাইতে চাচ্ছে না,তবুও একথা ভেবে ইচ্ছে করল যে, হয়তঃ তার গান পরিবেশনের

কারণে সঙ্গীরা গার্ডদের বর্বরতা থেকে উদ্ধার পাবে।

"এখানে.... এদিকে আমার সামনে এসো।" সৈনিকটি সামনের আসনে বসা একজন বন্দীকে পিছনে স্লোটনের স্থানে বসার নির্দেশ দিল, যেন স্লোটন সামনে তার আসনে বসে গান পরিবেশন করে।

"তুমি কি এ গানটি জানো.... সৈনিকরা সার্বিয়ার রণাঙ্গনে নৃত্য করছে।"

"হাঁ, অবশ্যই জানি।" স্লোটন বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শুরু করে দিল।

তার কণ্ঠে মৃদু মৃদু কম্পন অনুভব হলেও সে সুর ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখলো। মানজেকা পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পুরো পথেই সে গান পরিবেশন করে শুনাতে থাকল। তবে সিগারেট পান করা, সৈনিকদের দেয়া আলু বুখারার ব্রাণ্ডির দু–এক ঢোক পান করার কিছুটা অবকাশ পাচ্ছে।

"তুমি খুবই ভাল গান শুনালে..... মনে হচ্ছে যেন কোন সার্ব গাইছে।" একজন গার্ড ব্যঙ্গভরে হেসে তাকে বাহবা দিল।

তারা রাত নয়টায় মানজেকা শিবিরে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছেই পুরো দিনে এই প্রথমবার তাদের যৎসামান্য খানা জুটলো। পরে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, এ বন্দী বিনিময় প্রোগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, মানজেকা ক্যাম্পে একজন ক্রোয়েশিয়ান সামরিক অফিসার বন্দী আছে। তার নাম বন্দী বিনিময় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাই ক্রোয়েশিয়ানরা তা জেনে তার জবাবে পুরো প্রোগ্রামটাই খতম করে দিয়েছে।

পরের দিন ফিহু ছারহাতলাক এবং তার সঙ্গে গমনকারী পুরো গ্রুপটাই বন্দী বিনিময়ের কয়েকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় মানজেকা শিবিরে ফিরে আসে। তাদেরকে লাসেক পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে নীচে অবস্থিত ট্রাভেংক উপশহরটি ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে। তাদের উপর কেউ হাত তুলেনি, বরং তাদেরকে সময়ে সময়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। কিছুদিন পর ফিহু, নুনু, এডেন সেকালজা (যে গ্লেমোকের একজন ফটোগ্রাফার) এবংতাদের সাথে আরো আটজন

মুসলমান বন্দীকে তলব করা হল। তারা আর ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করেনি। পরে কয়েদীরা জানতে পেরেছে, তাদেরকে লাছেকের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিয়ে বসনিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আর এভাবেই পরিশেষে এ বন্দী বিনিময় প্রোগ্রামটি কার্যকর হয়।

নিভু নিভু আশার প্রদীপ

মানজেকার আকাশ সব সময় মেঘমালার বড় বড় খণ্ডে ছেয়ে থাকে। মানজেকা দুঃখ-বেদনার একটা আস্তানায় রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। কাঁচা সড়ক থেকে উড়ন্ত ধুলোবালির মেঘমালাকে বিদীর্ণ করে যেসব গাড়ী দৃষ্টিগোচর হয় তার প্রতিটি গাড়িই বন্দীদের নিভু নিভু আশার প্রদীপকে যেন পুনরায় দীপ্তমান করে দেয়।

জিমু মাঝে মাঝে দু'হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলে ঃ "হে আল্লাহ! এসব নিরীহ কয়েদীদের দিকে ফিরে দেখো, এদের আতঙ্কিত চোখগুলো এদের শুকিয়ে পড়া চেহারাগুলোর প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এদের ক্ষত-বিক্ষত ধ্বংসপ্রায় অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করো, ইয়া আল্লাহ! এরা তোমার দয়ার ভিখারী নয় কি.... !"

জিমুর গণ্ডদেশের উপর দিয়ে একটি নিঃশব্দ অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে গেল।

"কেউ কি কখনো এদের দুঃখ-বেদনার কথা জানতে পারবে! যা তাদের চোখগুলোকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চেহারাগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছে। আতংক ও ভয়ের কারণে চুলগুলো সময়ের পূর্বেই সাদা হয়ে গেছে। বিগত দিনের লোমহর্ষক দৃশ্যগুলোর কল্পনা করে ঘুমের ঘোরে তারা চিৎকার করে উঠে। এ কয়েদীরা কি সেসব ভয়াবহ লোমহর্ষক স্মৃতিকে ভুলে যেতে পারবে? নিরীহ মুসলমানদের মৃত্যু ও শাস্তির লক্ষ্যে সার্ব হায়েনাদের জুলুমের নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন এবং কষ্টের অনুভূতিকে তীব্র করার লক্ষ্যে সেসব লোমহর্ষক নির্যাতনের দৃশ্যাবলী তাদের চোখ প্রত্যক্ষ করেছে, তারা কি তা ভুলতে পারবে? এই নিকষ আঁধারে কবে আলোর কিরণ উদ্ভাসিত হবে?

জিমুর চোখ দু'টো সবসময় এসব কথা ভেবে অশ্রুসজল হয়ে থাকে।

চতুর্দিকে ঘেরা উঁচু নিচু পর্বতসমূহ এবং ক্যাম্পের সামনের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি দেখছে। হঠাৎ দূর থেকে বিস্ফোরণের একটা আওয়াজ তার কানে ভেসে এলো।

"মনে হচ্ছে, আবার বৃষ্টি বর্ষণ হবে, তোমরা কি মেঘ গর্জন শুনছো?" জিমু বলল।

"এটা বোমা বিস্ফোরণের শব্দ" মুহরেম তার কথা খণ্ডন করে বলল।

"আজ সার্বরা আমাদের কিছু লোককে ব্যারেকে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তাদেরকে মর্টার তোপের গোলা ট্রাকে রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা বলছে, ব্যারেকে প্রচুর পরিমাণে গোলা বারুদ রয়েছে।" একজন বলল, তলোয়ারের সংস্পর্শে যারা থাকে তারাও কোনদিন তার শিকার হয়।

দুঃসাহসী দুই মুজাহিদ

এরপর রাত এল। বৃষ্টি হল।

সে রাতে ক্যাম্পের নিরবতা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে ভেঙ্গে গেল। কখনো দূর থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। সকালবেলায় জানা গেল, কয়েকজন বন্দী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গেছে। এবং অনুসন্ধানকারী দলগুলো তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। ফলে রাতের আঁধারে এ ধরনের শব্দ শুনা গেছে। প্রহরায় মোতায়েন গার্ডরা এ ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ। পুরো দিনে একজন বন্দীকেও কোথাও আসা-যাওয়ার অনুমতি দেয়নি।

পলায়নকারীদের একজন খলিল কৃষকের ছেলে এবং অপরজন তার বন্ধু। তাদের দু'জনকে সবসময় একই সাথে চলাফেরা করতে দেখা যেত। মুহরেম সাধারণতঃ সব ব্যাপারেই কিছু না কিছু খবরাখবর রাখার চেষ্টা করে। সে অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী। জিমুকে বলল, খলিলের ছেলে ও তার বন্ধু কাল রাত সাতটার সময় ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে ক্যাম্প হতে বেরিয়ে পড়ে। তারা মাইন বিছানো এরিয়াগুলো অতিক্রম করে যেতে সফল হয়। ইতিপূর্বে তারা শুকনো মাছের খালি ডিব্বা দিয়ে মাইন শনাক্ত করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। কাঁটাতারের বেড়া টপকিয়ে পার্শ্ববর্তী গোশালা থেকে দু'টি উন্নতমানের ঘোড়া চুরি করে, সেগুলোর

উপর জিন চড়িয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে চম্পট দেয়। পরে পাহারাদাররা ব্যাপারটি জানতে পারলে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য একটি সশস্ত্র টিম গঠন করে। গতরাতে ফায়ারিং ও কুকুরের যে ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে আসছিল, সেটা এই টিমেরই কাণ্ড। কিন্তু, সৌভাগ্যের ব্যাপার তারা সার্ব টিমের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। প্রথম কারণ তো সার্বদের টিম গঠন করতে করতে তারা পেয়ে গেল অনেক সময়, ততক্ষণে তারা ঘোড়ায় চেপে অনেক দূরে চলে গেল। দ্বিতীয়তঃ খলিলের ছেলে এ এলাকায় ভেড়া দুম্বা চরাতো। এখানকার অলিগলি সম্পর্কে সে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ওদের কাছে খাদ্যের মজুতও ছিল প্রয়োজন মাফিক। এগুলো বাবুর্চিদের কাছ থেকে সিগারেটের বদলায় খরিদ করে রেখেছিল। তিনটি কম্বলও তারা জোগাড় করেছিল। পরে সার্বরা কৃষক খলিলকে তদন্তের জন্য অফিসে তলব করল। তদন্তকারী অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করল যে, সে ছেলের পলায়ন প্রোগ্রাম সম্পর্কে কিছু জানে কিনা এবং তার ধারণা অনুযায়ী তার ছেলে ও তার বন্ধু কোন্ পথে ও কোথায় যেতে পারে?

খলিল কসম খেয়ে তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করলো যে, সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। গত কয়েকদিন ধরে তার সাথে তার ছেলের কোন প্রকারেরই কথাবার্তা হয়নি। সে কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না যে, তারা কোন্দিকে যেতে পারে। খলিলের সাথে সার্ব অফিসার কোন কঠোর ব্যবহার করেনি। তবে তাকে জোর তাগিদ দিয়ে বলা হল যে, যদি এ ব্যাপারে কোন কথা জানতে পারে, তাহলে যেন অবশ্যই ডিউটিরত গার্ডদের মারফতে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে অবহিত করে।

অনেকদিন পর কৃষক খলিল জানতে পারল, পলাতক দু'জনই বসনিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল লেভেনু পৌছতে পেরেছে এবং বসনিয়ার ফ্রন্ট লাইনের মুজাহিদ গ্রুপে শামিল হয়ে সার্বদেরকে পর্যুদস্ত করে যাচ্ছে।

বেশ কিছুদিন পর খলিল তার বন্ধুদেরকে বলেছে ঃ "ছেলের পলায়নের আনুমানিক একমাস পূর্বে আমি বাস্তবেই ওর সঙ্গে কথাবার্তা পরিত্যাগ করি। একবার তো সমস্ত কয়েদীদের সামনে আমার এবং ওর

মধ্যে মারাত্মকভাবে বচসা ও কথা কাটাকাটি হয়। কিন্তু এসবই ছিল এক ধরনের নাটক। পূর্ব পরিকল্পনারই একটা অংশ। যেন ওর পলায়ন আমার জন্য কোন বিপদ বয়ে না আনে।

দুই হতভাগা

মানজেকা ক্যাম্প থেকে শুধুমাত্র এরাই পলায়নে সফল হয়। এর পূর্বে কোযারকের দু'জন অধিবাসী শাহবাজ ও বীছাক, অন্য বিশজন বন্দীর সাথে তারা লাকড়ী কাটার কাজ করতো। তারাও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করেছিল। তাদেরকে লাকড়ী সংগ্রহের জন্য গভীর জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু তারা সেখানে থামেনি। আরো সামনে অগ্রসর হতে লাগল। পাঁচঘন্টা পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি কেউ আঁচ করতে পারেনি। পাঁচ ঘন্টা পর গার্ডরা বুঝতে পারল যে, তারা পালিয়েছে। তাদেরকে গ্রেফতারের জন্য দ্রুত অভিজ্ঞ সেনাদের নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদেরকে রওয়ানা করে দেয়া হয়। শাহবাজ ও রীসাক মানজেকা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতো না। তবে এতটুকু আন্দাজ অবশ্যই করতে পেরেছিল যে, তাদেরকে কোন্ দিকে যেতে হবে। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে তারা অবশ্যই প্রেজডোরের কাছাকাছি পৌছে যাবে, যেটা তাদের সুপরিচিত এলাকা। প্রথম রাত তারা একটি সার্ব গ্রামের অদূরে অবস্থিত একটি গবাধিপশুর গোশালার খড়ের স্তূপের মধ্যে কাটায়। সেখানে তারা পুরো রাতের পরিবর্তে শুধু দু-তিন ঘন্টা থামল। উদ্দেশ্য, কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যে, পশ্চাদ্ধাবনকারী শিকারী কুকুরগুলো তাদের অনুসন্ধানে আছে কিনা। সূর্য উদিত হওয়ার অনেক পূর্বেই তারা জঙ্গল ও খোলা জায়গার মাঝামাঝি স্থান দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে 'সান্সকি মোষ্ট' পৌছে গেল। যেখানে সকলের নজর এড়িয়ে জনতার ভিরে মিশে গেল এবং একটি বাসে আরোহণ করে প্রেজডোর অভিমুখে অগ্রসর হল।

প্রেজডোর পৌছে তারা একটি সাধারণ ক্যাফে হাউসে বসে বিয়ার পান করল। এরপর সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করে পদব্রজে কোযারকের দিকে হাঁটতে লাগল। কয়েক রাত কোযারকের একটি বিধ্বস্ত গৃহে

অবস্থান করল। অতঃপর এ আশায় কোযারকের পার্বত্য অঞ্চল ও সীভা নদীর অভিমুখে যাত্রা শুরু করল, হয়তঃ এভাবে তারা ক্রোয়েশিয়ার কোন স্বাধীন অঞ্চলে পৌছতে সক্ষম হবে।

সীভা নদের পাশে অবস্থিত একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম বোছানিছকা ও হোভা পর্যন্ত পৌছে গেল। এখানে শাহবাজের এক খালা থাকে। এ গ্রামটির অধিকাংশ লোকজন এখন পর্যন্ত এখানেই রয়েছে। কারণ, তারা যুদ্ধ ছাড়াই সার্বদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং এখন পর্যন্ত সার্বরা এ গ্রামটিতে ধরপাকড় ও দমন অভিযান শুরু করেনি। রাতটি এ গ্রামে কাটানোর পর অতি প্রত্যুষে শাহবাজ ও বীসাক সীভা নদীতে সাতার দিল। শাহবাজ সকলের নজর এড়িয়ে নদীর ওপারে পৌছে গেল। বীসাক ভাল সাতার জানতো না। সে গভীর পানিতে সাতার কাটতে সাহস পেল না। শাহবাজ অন্যপারে পৌছে তার সাহস বাড়ানোর লক্ষে হাত দিয়ে ইশারা করতে লাগল। কিন্তু বীসাক পানিকে দারুন ভয় করে। নদীতে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায় তীরের দিকে সাতার কাটতে লাগল। শাহবাজ সাতার কেটে আবার তার নিকট পৌছল। সে তার বন্ধুকে একা ছাড়তে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

এর কয়েক দিন পরই সার্বদের একটি টহলরত টিম তাদেরকে ধরে ফেলল। একটি সামরিক গাড়ীতে চড়িয়ে তাদেরকে পুনরায় মানজেকা ক্যাম্পে নিয়ে এলো। সেখানে অনেকদিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তাদের উপর নৃশংসতা চালানো হয়। এক দিন, যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে রজনীর আঁধার চারদিকে ছেয়ে গেছে, কারারক্ষীরা তখন শাহবাজ ও বীসাককে লাথি ও ডাণ্ডা দিয়ে মারতে মারতে সমস্ত বন্দীদের সামনে দিয়ে ঘুরালো। গার্ডরা ওদের মাথা ধরে দরজার সাথে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো। ওরা ব্যথায় দুমড়ে গিয়ে জোরে জোরে চিৎকার করলো। এত মারাত্মক প্রহার সত্ত্বেও ওরা শুধু বেঁচেই গেল না, বরং পূর্ণ সুস্থ হল।

আরেকজন কয়েদী ক্যাম্পের নিকট অবস্থিত আলু ক্ষেত থেকে কাজ করার সময় পালিয়ে যায়। তার ব্যাপারে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। সে যদি ধরাও পড়ে থাকে তাহলে সার্বরা তাকে পুনরায় মানজেকা বন্দী শিবিরে নিয়ে আসেনি।

দশম অধ্যায়
জাহান্নামের দশম গহ্বর

প্রায় প্রত্যেক দিনই পড়ন্ত বিকেলে পাহাড়ের উপর দীপ্তমান সূর্যের প্রখরতা হ্রাস পেয়ে যখন অমানিশা আসি আসি করতে থাকে ঠিক তখনই প্রবল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ হয়। ফলে জায়গায় জায়গায় কাদা জমে যায়। এ সব কাদা লেগে কুঁজো বক্রদেহ কয়েদীদের জুতাগুলো মেটে রঙের হয়ে যায়। তাদের ক্ষীণকায় ও দুর্বল দেহগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মনে হয়, যেন তরল মোম দিয়ে তাদের দেহ প্রলেপ দেয়া হয়েছে। অতিশয় শীর্ণ চেহারায় বেরিয়ে আসা চোখসমূহে শোক-দুঃখ ও পরিতাপের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

বিরামহীন অসহায়ত্ব

সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছে তাদের আশা-আকাংখাও ততই নৈরাশ্যে পরিণত হচ্ছে। রহমত ও করুণার বুকভরা আশায় আসমানের দিকে হাত উত্তোলনকারীদের সংখ্যাও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। কোমরগুলো নুইয়ে পড়ার কারণে তাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ মাটির দিকেই স্থির হয়ে থাকে। কিছুলোক চোখ খোলা রেখেই শুয়ে ছাদের ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে আসা বরফগুলো দেখতে থাকে। দরজার নিকটে অবস্থানকারীদের চেহারার উপরে হারিকেনের আলো পড়ে বিভিন্ন প্রতিকৃতি সৃষ্টি হচ্ছে। তারা মণ্ডিত মস্তকে পরিহিত হেটগুলো শক্তভাবে ধারণ করে আছে। খাওয়ার জন্য তাদের যে আপেল দেয়া হয়, মনে হয় যেন সেগুলো গলাধঃকরণের সময় হলকে আটকে যাবে। একটা বিরামহীন অসহায়ত্ব তাদের আত্মার উপর জেঁকে বসেছে। পাহাড়গুলোর উপরিভাগে এবং গোশালার ছাদের উপর সাদা ধবধবে বরফের স্তর ধীরে ধীরে মোটা হয়ে চলছে। একটা গভীর কুয়াশা বন্দীদের গোশালা কয়েদখানার মাঝে সব সময় বিরাজ করছে।

হতাশার দুঃস্বপ্ন ও কবিতার খৈ

"আমি বলেছিলাম না যে, আমাদেরকে শীতের মৌসুমটাও এখানেই কাটাতে হবে।" মুহরেম বলল।

বাইরে বিরামহীন বরফপাত হচ্ছে। শোকে কাতর বাতাসের শিশি

গুঞ্জন ভগ্ন দেয়ালের ছিদ্রপথে ভিতরে প্রবেশ করছে।

"তোমাদের তো একেবারেই আন্দাজ নেই, মানজেকার আসল শীত কি!" তার কাছে বসা আলীজাহ্ নিজের ঠাণ্ডায় অবশ হাত দুটি একটা আরেকটার সাথে ঘষতে ঘষতে বলল।

"এটা তো কেবল সূচনামাত্র। কিন্তু তোমরা অশুভ লক্ষণের কথা মোটেও মুখে এনো না, এমনিতেই আমাদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।" হারিছ সত্যিকারভাবেই একজন হিতাকাংখী ও নরমদীল মানুষ। পাশের গোশালায় থাকে, আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এ কথা বলল।

সান্স কি মোষ্টের প্রাক্তন মুসলমান পুলিশ অফিসার বায়েম বলল ঃ

"রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমি ঘরে পৌঁছে গেছি ; তবে স্বপ্নটি তেমন ভাল মনে হল না। কারণ, আমি ঘরে পৌঁছে একটি জনপ্রাণীও সেখানে পেলাম না।

রাতে আকাশে একটি উল্কাপিণ্ড দেখলাম। পিছনে পিছনে একটা লম্বা ঝলমলে আলোকরশ্মি ছুটে চলছে। এরপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার চোখে আর ঘুম এলো না। আমি ভাবনার সমুদ্রে ডুবে গেলাম। তখন আমার মানসপটে কবিতার খৈ ফুটছিল। আমি আমাদের এই অবর্ণনীয় করুণ অবস্থা সম্পর্কে একটা দীর্ঘ কবিতা তৈরী করে ফেললাম। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সবই যেন ভুলে গেলাম। শুধুমাত্র শুরুর প্রথম লাইনটি মনে আছে, যা এ রকম ঃ

"পরিশেষে এমন একটি মুহূর্তও এলো যে, আমার অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ একমাত্র আমার পথটিই অবশিষ্ট রয়ে গেল।"

"জেনেভা চুক্তির শর্ত মোতাবেক যা কিছু হচ্ছে, সব ঠিকই হচ্ছে, তাই না।" মুহরেম একটা বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল।

হারেস বায়েমের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ "যখন তুমি ভাবনার জগতে কবিতা প্রস্তুত করছিলে, তখন সে মুহূর্তে ব্যবস্থাপনা ব্লকে আমার উপর পিটুনী পড়ছিল।" একথা শুনে সেখানকার সকলেই হারিসের দিকে মনোযোগ দিলো।

হাজার বার অভিশাপ

হারিস তার কথার ধারা জারি রাখল ঃ "তাঁরা গতকাল সন্ধ্যায় সূর্য অস্তাচলে যাওয়ার পরপরই আমাকে তলব করে এবং ব্যবস্থাপনা ব্লকে

অবস্থিত একটি কক্ষে নিয়ে যায়। আমার সাথে মাত্র একজন কারারক্ষীই ছিল। কিছু সময় অতিবাহিত হতে না হতে আরেকজন সেপাহী সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করে ঃ "তুমি এখানে কি করছো?"

কণ্ঠটা কেমন যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। আমি মাথা উঠিয়ে তাকালাম। আমি সত্যিই হতবাক হয়ে পড়লাম, ও যে আমার বড় ছেলে দানেশ। আমি কিছুক্ষণ পর্যন্ত কথাই বলতে পারলাম না। হয়রান পেরেশোন হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। পরে আমি প্রশ্ন করেই বসলাম ঃ "এ আবার তুমি কোন্ ধরনের ফৌজীতে যোগদান করেছো?"

আমি বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত ওর উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু ও আমার সঙ্গে চোখ মিলাতে সাহস পেলো না। মস্তক অবনত করে খামোশ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। যদিও গভীর দুঃখ ও বেদনায় আমার মুখ চিরে চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু তবুও একথাটি ওকে না বলে পারলাম না ঃ "বেটা আমার! তোমাদের এই বর্বর ফৌজদের উপর লা'নত বর্ষণ করে এখান থেকে কেটে পড়ো, ওদের হাতগুলো নিরীহ নিরস্ত্র মুসলমানদের রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হয়ে আছে।"

কিন্তু এরপরও দানেশ কোন কথা বলল না, খানিক পরেই ও সেখান থেকে প্রস্থান করলো। আর অন্য সেপাইটি আমাকে মারতে শুরু করল। পাশের কক্ষ থেকেও একজন কয়েদীর চিৎকার ধ্বনি ভেসে এলো ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত এসব বদমাশ বখাটে হায়েনাদের উর্দিপরা অবস্থায় আছো, মোটেও আমার সামনে এসো না, আমি তোমার চেহারা দেখতে চাই না। এমন ছেলের উপর একবার নয়, হাজারো বার অভিসম্পাত দিচ্ছি।"

হারেস তার উত্তেজনা ও বিরক্তিকর দাস্তানের এখানেই ইতি টানলো। কারণ, সেখানে আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এবং পরিবেশটা একদম গম্ভীর হয়ে গেছে। হঠাৎ একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কানফাটা শব্দ সবদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং তাদের সম্মুখভাগে অবস্থিত গোশালার উপর ধুলোবালু, পাথরকণা ও মাটি বর্ষণ হতে লাগল। সবাই হতবাক, ব্যাপারটা কি। খবর ছড়িয়ে পড়ল, কোটরদেরোসের একজন বন্দী যখন তার ধোলাইকৃত জামা শুকানের জন্য কাঁটাতারের বেড়ায় মেলে দিচ্ছিল তখন তার পা ঘটনাক্রমে মাইনের উপর গিয়ে পড়েছে।

এ দুর্ঘটনায় তার দুটি পা নষ্ট হয়ে গেছে। একটি পা হাঁটুর নিচ থেকে জুতাসহ ছিড়ে উড়ে গিয়ে কাছের একটি গোশালার ছাদে পড়েছে। ক্যাম্পে মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রহরারত সিপাহীরা কয়েদীদেরকে গোশালার মধ্যে বন্ধ করে রাখল এবং তাদেরকে দরজা খুলতে কড়াভাবে নিষেধ করে দিল। দরজার নিকটে অবস্থানরত বন্দীরা ডাক্তার মনসুরকে দু'জন কারারক্ষীর সাথে মারাত্মকরূপে আহত বদনসীব কয়েদীর রক্তাক্ত দেহকে ব্যবস্থাপনা ইমারতের দিকে নিয়ে যেতে দেখল। কয়েদীটির দ্বিতীয় পা ফেটে যাওয়া হাঁটুর চামড়ার সাথে ঝুলছে। তাকে গাড়ীতে করে বানজালুকা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু দু'দিন পর তার মৃত্যুর সংবাদ এলো। বেশী রক্তক্ষরণের ফলে তার দুর্বল শরীর যখমের ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি।

আরো পাঁচজন কয়েদীকে জঙ্গলের ভিতর বেগার খাটার সময় বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়ার ফলে সেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পরিবর্তনের হাওয়া

নভেম্বরের শুরুর দিকে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধিরা এখন প্রতিদিনই ক্যাম্পে আসে। কয়েদীদেরকে বারবার নিশ্চয়তা প্রদান করে যাচ্ছে, অতিসত্বর মানজেকা শিবির খতম করে দেয়া হবে। নরখাদক গার্ডদের ব্যবহারেও এর একটা স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এখন তারা আবহাওয়া ভাল থাকলে দিনের বেলায় যে কোন সময়ে কয়েদীদেরকে গোশালার বাইরে বেরুবার অনুমতি প্রদান করে। বন্দীরা গোশালার বাইরে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার অবকাশ পায়। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তাদেরকে পুনরায় কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। দিনের পর দিন আসছে, যাচ্ছে। পরিবেশের এ নিরবতা ও নিস্তব্ধতাকে শুধুমাত্র সার্ব জঙ্গী বিমানের কানফাটা শব্দই ভেঙ্গে ফেলছে। যেগুলো গোশালার ছাদের একেবারে কাছ দিয়ে একদিকে কাত হয়ে শা করে উড়ে যায়। যুদ্ধ বিমান সম্পর্কে যেসব কয়েদীরা ওয়াকিবহাল ছিল তাদের ধারণা অনুযায়ী, এভাবে সার্ব বৈমানিকরা মানজেকা ক্যাম্পের আকাশ সীমানায় শব্দের গতিসীমাকে অতিক্রম করার মহড়া করছে। যে-ই কানফাটা শব্দ ভেসে আসতো, অমনি গার্ডরা মাথা উপর করে আকাশের দিকে তাকাতো এবং

এ অসাধারণ বিমান মহড়া উপভোগ করে মিটমিটিয়ে হাসতে থাকতো। বিমানগুলো নিজেদের পশ্চাতে ধোঁয়ার একটা সরুরেখা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেত।

সপ্তায় দু'বার 'মারহামাত' নামক মানবাধিকারের একটি ইসলামী সংগঠনের প্রতিনিধিরা বানজালুকা হতে কয়েদীদের আত্মীয়–স্বজনের পাঠানো খাদ্য ও কাপড়ের প্যাকেট পৌঁছে দিতে আসতো। ক্যাম্পের নিয়ম অনুসারে এক সময়ে পঞ্চাশের অধিক প্যাকেট গ্রহণ করা হতো না। এ প্যাকেটগুলো সর্বপ্রথম ডিউটিরত গার্ডদের কাছে পৌঁছতো। তারা গভীরভাবে প্যাকেটগুলো যাচাই করতো। সিগারেট, ফল, চকলেট ও ভাল কাপড় একদিকে স্তূপ করে রাখতো এবং তা তারা পরস্পরে বন্টন করে নিতো। এছাড়া যে সব সাধারণ ও কম মূল্যের জিনিস অবশিষ্ট থাকতো। কেবলমাত্র সেগুলোই সংশ্লিষ্ট কয়েদীদেরকে দিতো। চিঠিপত্রগুলো ভালমত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হত। বেশীর ভাগ চিঠিই ছিঁড়ে ফেলে দিতো। এ রকম ব্যাপার একেবারেই কম হতো যে, বন্দীদের মধ্য হতে কারো চেহারা আগত সংবাদে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ক্যাম্প খতম করার ব্যাপারে আলোচনা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, স্বয়ং রাদোভান কারাজিক এ ধরনের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

মুক্তির প্রভাত রশ্মি

কয়েদীরা খুব ভোর হতেই অস্থিরভাবে রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধিদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে।

১৩ই নভেম্বরের প্রভাতটি কুয়াশাচ্ছন্ন। ক্যাম্পে বয়ে যাচ্ছে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ। পূর্বের দিনগুলোর ন্যায় আজও সময় কাটানো ছাড়া অন্য কোন কাজ হয়নি। এখন পর্যন্ত কোথা থেকেও কোন বার্তা আসেনি। দুপুরবেলা বন্দীদেরকে নিজ নিজ কয়েদখানায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল। কয়েদীদের ধারণা হল, হয়তো তাদের সাথে সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের সাক্ষাৎ করানোর প্রস্তুতি চলছে। যারা সব সময় তাদের সাথে কথা বলার এবং তাদের দুর্বল ক্ষীণকায় কংকাল দেহগুলোর ফটো নেওয়ার জন্য উদগ্রীব।

কিন্তু ঠিক মধ্যাহ্ন ভোজের এক–দু' মিনিট পূর্বে একজন ফৌজ

বন্দীদের নিকট এসে ঘোষণা করল ঃ

"আমি যেসব কয়েদীদের নাম ডাকবো, তারা জলদী করে বাইরের গেটের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে যাবে। কেউ যেন বিলম্ব না করে।"

"আমরা কি নিজেদের আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাবো?" একজন কয়েদী জানতে চাইল।

"না.... সবকিছু এখানেই থাকবে, সাথে কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারবে না।" সেপাহী উত্তর দিল। সে এ নির্দেশও জারি করল, "যে সকল বন্দী ১৯৫০ সালে কিংবা তার পূর্বে এবং ১৯৭২ সালে কিংবা তারপরে জন্মগ্রহণ করেছে তারা যেন প্রস্তুত হয়ে যায়।"

তার কাছে একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, সিরিয়াল অনুযায়ী সে তা পড়তে লাগল।

"মনে হচ্ছে কোন বন্দী বিনিময় হবে! কিন্তু যদি তা নাও হয়, তবুও এখানে যেভাবে আমরা ভবিষ্যত সম্পর্কে একেবারে বে-খবর পড়ে আছি, এর চেয়ে তো অবশ্যই উত্তম হবে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হওয়া।" মুহরেম বলল। অতঃপর সে জিমুকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "জিমু! তোমার জন্ম কোন্ সালে?"

"১৯৪৯ সালে।" জিমু উত্তর দিল।

"বেশ, ভালই হল। অন্তত পক্ষে আমরা এক সাথে তো থাকতে পারবো! কি জানি ... কাল কি হয়? ...." এ কথা বলার পর এই প্রথম মুহরেমের মুখে একটি মুচকি হাসির ঢেউ খেলে গেল।

জিমুর নাম প্রথম ভাগেই ডাকা হল। সে বাইরে বেরিয়ে গেটের সামনে জমায়েত কয়েদীদের ক্ষুদ্র গ্রুপটিতে শামিল হল। গার্ডরা তাদেরকে লাইন ধরে দাঁড় করাচ্ছে। এখানে আবার নাম ডাকা হল। তারপর তাদেরকে পঞ্চাশ জনের গ্রুপ বানিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। প্রতিটি সারিতে পাঁচজন করে দাঁড়াল। কয়েদীদেরকে জোর তাগিদ দিয়ে বলা হল, তারা যেন তরতীব দেয়া গ্রুপে তাদের নির্ধারিত স্থানের খেয়াল খুব ভালোভাবে রাখে। একজন উচ্চপদস্থ অফিসার তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"আগামীকাল তোমরা মানজেকা ক্যাম্প হতে বিদায় হয়ে যাবে। তোমাদের দায়-দায়িত্ব আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির হাতে অর্পণ করা হবে। তোমাদেরকে আপাততঃ কারলোভিক এর অস্থায়ী শিবিরে নিয়ে

যাওয়া হবে। সেখান থেকে তোমাদেরকে কোন তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানে তোমরা এ যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত থাকবে। কাল রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তোমাদেরকে একটি সম্মতিসূচক ফরমে স্বাক্ষর করতে হবে। এ সময় তোমরা যেভাবে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছো, কাল তোমাদেরকে এভাবেই বাসে আরোহণ করতে হবে। এখন তোমরা নিজ নিজ গোশালায় চলে যাও।"

এ আওয়াজটি কয়েদীদের নির্জীব হৃদয়ে একটি আশাব্যঞ্জক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হল। মনে হল যেন নিরাশার কালো পাখি বন্দীদেরকে ছেড়ে মুহূর্তে কোথাও উড়ে পালিয়ে গেছে। চেপে পড়া নিরুদ্যম আশাগুলো যেন হঠাৎ জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। চেহারায় আনন্দ ও আশংকার এমন একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠল, যেন তারা জাহান্নামের অতল গহবর থেকে এখনই বেরিয়ে এসেছে। তারা নরকের মর্মন্তুদ নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়েছে। জিমুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত আনন্দ ও প্রশান্তির একটা স্নিগ্ধময় শিহরণ খেলে গেল। মুহরেম তো তার মিটিমিটি হাসি থামাতে চেয়েও থামাতে পারছে না।

প্রসিদ্ধ ফুটবল রেফারী ছেকরেজা পেটালোভিচ্ সময় কাটানোর জন্য প্রায়ই জিমুর সাথে তাস খেলতো, সে গোশালায় ফিরে এসে জিমু ও মুহরেমের পৃষ্ঠে মহব্বত ও হৃদ্যতার সাথে চাপড় মেরে অশ্রুভরা চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ

"বন্ধুরা আমার! যদিও এ ব্যাপারে আমার দুঃখ রয়েছে যে, আমি এখনো পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারিনি, তবুও তোমাদের মুক্তির কথা শুনে আমি কতটুকু আনন্দ অনুভব করছি তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ আমাদের মুক্তির পালাও অতিসত্বর এসে যাবে। কারণ, অবস্থাতো দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করেছে।"

মুহরেম আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে কাঁদতে বলল ঃ

"আমার এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস হচ্ছে না যে, বাস্তবেই কি এসব কিছু হচ্ছে, আমি স্বপ্ন তো দেখছি না? আমার মনে হচ্ছে, যেন আমার অন্তরটা আমার শরীর থেকে তীব্রগতিতে বেরিয়ে পড়বে।"

সে রাতে তাদের চোখে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুম আসেনি। রমিজ ও ফাতকু বাবুর্চিখানা থেকে বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণকারীদের জন্য অনেক

খানা ও ফলমুল নিয়ে এসেছিল। তারা দু'জন এখনো পর্যন্ত এসব সৌভাগ্যবান লোকদের মাঝে শামিল হতে পারেনি। তবে সবাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে ক্ষীণ সুরে গুণ গুণ করে দীর্ঘক্ষণ গান গাইল।

ভোরে নাস্তার পরক্ষণেই যারা চলে যাবে তারা নিজেদের আসবাবপত্র গুছিয়ে নিল। জিমু পরিচিত সকলের সাথে এক এক করে করমর্দন করল। আল্লাহ হাফেজ বলে বিদায় নিল। ফাতকু হতে বিদায় নেয়ার পালাটি ছিল তার পক্ষে একটা ভীষণ পরীক্ষা। মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের করতে পারল না। প্রকম্পিত শরীর ও দর দর করে বেরিয়ে পড়া অশ্রু তার মনের ভাবকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করছিল।

জিমু ভারাক্রান্ত মুখটি ফিরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। যেখানে লোকেরা পূর্ব দিনের সিরিয়াল মোতাবেক লাইন ধরে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবাই এসে উপস্থিত হলে ক্যাম্প কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল বুজিদার পাপুভিচ্ তাদেরকে সম্বোধন করে বলল ঃ

মুক্ত কাফেলার যাত্রা

"আমি প্রত্যাশা করছি, আমরা ভবিষ্যতেও সাক্ষাত করবো। তবে সে সাক্ষাত হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তখন আমাদের সবার হাতে থাকবে কফির পেয়ালা, কিংবা সুস্বাদু পানীয় দ্রব্যের জাম। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, যেন তোমাদেরকে এখানে পুনর্বার আসতে না হয়। তোমরা এখন কোন ভিন দেশে চলে যাচ্ছো। তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এই অর্থহীন যুদ্ধের সমাপ্তির পর কোনদিন তোমরা অবশ্যই মাতৃভূমিতে পৌছতে সক্ষম হবে। যুদ্ধ খুবই অনর্থ জিনিস। কিন্তু এটা সদা সর্বদা থাকতে পারে না.... সৃষ্টিকর্তা তোমাদের সহায় হোন।"

তাদের তদারককারী অফিসার স্পাগা একজন একজন করে পুনরায় নাম ডাকতে শুরু করল। যার নাম ডাকা হয়, সে ক্যাম্পের মেইন গেটের বাইরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো বাসগুলোতে সওয়ার হয়ে যায়। জিমু ছয় নম্বর বাসে আরোহণ করল, আর মুহরেমদের বাসটি সে বাস থেকে আরো চারটি বাস পিছনে। মোট বাস চৌদ্দটি। আনুমানিক সাতশ' কয়েদী এসব বাসে আরোহণ করল। এসব লোক খানিক পরেই 'প্রাক্তন বন্দী' হিসেবে পরিগণিত হবে।

জিমু একটা উৎকণ্ঠাভরা ভাব নিয়ে নিজ সিটে বসলো। যেন এখনো

পর্যন্ত তার বিশ্বাস হচ্ছে না এ বাসটি সত্যিই তাকে মুক্ত হাওয়া ও মুক্ত পরিবেশে নিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে এক একটি সিগারেটের প্যাকেট, খাদ্যের ডিব্বা এবং কিছু ফলমুল রাস্তায় খাওয়ার জন্য প্রদান করা হল। এছাড়াও ফাতকু ও রমিজ তাদেরকে পাথেয় হিসেবে অনেক কিছু দিয়েছিল। বেশী দুর্বল লোকদের গায়ে দেয়ার জন্য নতুন কম্বল ভাজ করে আসনের উপর রেখে দেয়া হয়েছিল।

রেডক্রস কর্মীদের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তাদের নৈপুণ্যতার কথা শুধু বাসের আরোহীরাই নয়, বরং সেসব কয়েদীরাও স্বীকার করলো যারা এখনো কাঁটাতারের বেষ্টনী দেয়া ক্যাম্পে আবদ্ধ রয়েছে। তারা অশ্রুভরা চোখে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে গোশালার ভিতর থেকেই হাত নেড়ে 'আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ,ফি আমানিল্লাহ' ইত্যাদি বলে বিদায় জানাচ্ছে। জিমুদের বাসে মাত্র একজন সৈনিক রক্ষী হিসেবে ড্রাইভারের ডান পাশের সিটে আসন গ্রহণ করল। তার বয়স বিশেরও কম। আরামে পা ছড়িয়ে সে বসল। তার কাছেই পড়ে আছে তার বন্দুকটি। বাস চলতে শুরু করলে, জিমু ও অন্যান্য লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

"কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে, তবে আমার পক্ষ হতে তোমরা এখন হতেই মুক্ত। তোমরা মন মত বসে আলাপ-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব করতে পারো। সিগারেট পান করতে পারো। তবে তোমাদের মধ্য হতে কারো নুভেস্কার পূর্বে অবতরণ করার অনুমতি নেই।"

বাস যখন কেন্টিনের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন ফাতকু, রমিজ ও আরো কয়েকজন হাত দুলিয়ে জিমুকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

"আমার দু'জন ছেলে এখনো ওখানে রয়েছে।" জিমুর পিছনে বসা একজন লোক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল। আরো বলল ঃ "আমি ক্যাম্প কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম, তারা আমাকে রেখে দিয়ে ওদেরকে ছেড়ে দিক, কিন্তু তারা আমার কথা মানল না।"

জিমু পিছন দিকে তাকিয়ে ক্যাম্প ও সেখানে রয়ে যাওয়া সমস্ত লোকদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বাসগুলো জঙ্গল ও গাছপালা অতিক্রম করে সেই কাঁচা সড়কের উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে, যে সড়কটি আমারেস্কা ক্যাম্প হতে তাদেরকে

এখানে নিয়ে এসেছিল। এ সড়কটি পাহাড় ঘেঁষে চলতে চলতে সেই কেন্দ্রীয় মহাসড়ক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যা বানজালুকা অভিমুখে চলে গেছে।

বাসের এই কাফেলার আগে আগে চলছে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির গাড়ী। তার ছাদের উপর দোল খাচ্ছে লাল রঙের বড় পতাকা।

বড় সড়কটি হতে কয়েক গজ পূর্বে একটি সামরিক চেকপোষ্ট। সেখানে এসে বাসগুলো থেমে গেল। সেখানে একটি ঘরে কিছু লোক মেশিনের সাহায্যে গম পিষার কাজ করছে। তাদের চেহারা দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছে যে, তারা এসব বাসে আরোহিত মুসাফিরদের দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

"সার্ব সেনাদের মরে যাওয়াই সমীচীন ..... মানুষ মাছির মত মরে সাফ হয়ে যাচ্ছে..... কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুক, এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল?" জিমুদের বাসের নওজোয়ান রক্ষী সেনাটি বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছে।

আরোহীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, বাস আবার কখন ছাড়ে। তাদের মাঝে বেশ কিছুটা উৎকণ্ঠা ভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ আল্লাহ করে বাসগুলো আবার চলতে শুরু করল। কিছু বুঝার পূর্বেই বাসগুলো একটা ক্ষুদ্র সড়ক দিয়ে বানজালুকা শহর অতিক্রম করে যাচ্ছে।

বাজার লোকে লোকারণ্য। অনেক লোকের চেহারায় ফুটে উঠছে আতংকের ছাপ। বেশীর ভাগ লোকই সামরিক উর্দিপরা, তারা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত। এতেই বুঝা যাচ্ছে যে, শহরটির উপর সার্ব সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

রক্ষী সেনাটি সীভা নদের ব্রিজের কিছু পূর্বে অবস্থিত 'বোমানেস্কা গ্রেডেস্কা' নামক স্থানে এসে বাস থেকে নেমে পড়ল। এখানেই সবগুলো বাসে জাতিসংঘের বিশেষ ফোর্স আরোহণ করল। তাদের মাথায় নীলবর্ণের হেলমেট। উর্দিতে লাগানো জাতিসংঘের বিশেষ চিহ্ন। প্রায় বিশ মাইল পর্যন্ত, ক্রোয়েশিয়ার অধিকৃত বিধ্বস্ত গ্রামগুলো অতিক্রম করে তারা নুভেস্কা শহরে গিয়ে উপনীত হলো। সেখান থেকে জাতিসংঘের বিশেষ ফোর্সের তত্ত্বাবধানে এসব বাসকে বড় সড়কটির সাথেই অবস্থিত একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে প্রায়

পঞ্চাশ গজ দূরে সড়কের সাথেই বাসের আরেকটি লম্বা লাইন দেখা গেল। তাদেরকে রেডক্রস কর্মীদের তত্ত্বাবধানে গ্রুপ গ্রুপ বানিয়ে পূর্বের বাসগুলো থেকে নামিয়ে এসব বাসে উঠানো হলো।

প্রাণখোলা মুক্ত হাসি

"এখন তোমরা সত্যিকার অর্থেই মুক্ত" জাতিসংঘের গার্ডরা তাদের তত্ত্বাবধানে আগমনকারী এ সকল মুসাফিরকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘোষণা করল। এ শুনে সবার ঠোঁটেই হাসির একটা ঝলক দেখা গেল এবং জাতিসংঘের সেনারাও তাদের সে খুশীতে শামিল হলো।

"অথচ আমি এসব ফোর্সদেরকে কখনো দেখিনি, তবুও আমার ইচ্ছে হয়, এদের সবাইকে জড়িয়ে ধরি।" জনৈক ব্যক্তি বলল।

অবশেষে তারা সীমাহীন নির্যাতনের সরহদ পেরিয়ে, সার্বদের বানানো জাহান্নামের অতল গহবর থেকে মুক্তি পেয়ে এক নবজীবনে পদার্পন করল। তারা আনন্দে খুশীতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে করে একজন আরেকজনকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরছিল যেন অনেক বছর ধরে হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে পেয়েছে। আনন্দ ও খুশীর একটা বিদ্যুত প্রবাহ তাদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করছিল, যার কারণে তাদের চেহারাগুলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। আনন্দ অশ্রুর সমুদ্রে শোক ও বেদনার চিহ্নসমূহ ডুবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। আনন্দের আতিশয্যে জিমুর শরীরখানা কাঁপছিল। তার এমন হচ্ছিল যেন হৃদয়টা পাঁজরের হাড়কে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে পড়বে।

জিমু নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে লাফ দিয়ে একটি বাসে সওয়ার হল। বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি এবং বিশ্বের প্রসিদ্ধ টিভি চ্যানেলের কর্মী ও সাংবাদিকবৃন্দের একটা ভীড় সেখানে দেখা যাচ্ছে। বাসে লাগানো রেডিও'র ভাষ্য জিমুর কানে ভেসে এলো, সে সদ্য তাজা খবর শুনতে পেলো, "আজ সার্ব কর্তৃপক্ষ কুখ্যাত মানজেকা ক্যাম্প থেকে সাতশ' চল্লিশজন বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে।"

জিমু বাস হতে নেমে পড়ল। মুহরেম নিজের বাহু দু'টি প্রসারিত করে আলিঙ্গন করে বলল ঃ "জিমু! আমরা কোন স্বপ্ন দেখছি না তো?..... আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার দেই, যেন আমার আওয়াজ সীভানদ অতিক্রম করে অপর পারে ওরোনা পর্যন্ত .... বরং

তার চেয়েও অনেক দূরে পৌঁছে যায়।"

জিমু ডুকরে কেঁদে উঠল। সে পিছন ফিরে কোযারা পর্বতমালার পানে তাকালো। তার চোখ দু'টো বেশী দূরত্বের কারণে উদভ্রান্তের মত এদিক–ওদিক্ক দেখছে। তাতে একটা গভীর নৈরাশ্যের ছাপ ফুটে উঠছে। সে বিড় বিড় করে বলছে ঃ

জিহাদ জিহাদ আর জিহাদ

"ওই তো আমার প্রিয় প্রেজডোর, হয়তঃ কেউই এ জায়গাটিকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারে না.... হে আমার জন্মভূমি! আমি তোমার কোলে অবশ্যই ফিরে আসবো.... আমি তোমার সাথে ওয়াদা করছি, আজ হতে আমার শ্লোগান, আমার মুখের বুলিই হবে জিহাদ, জিহাদ আর জিহাদ। মানবতার শত্রু এসব অসভ্য হায়েনাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন, আমরণ জিহাদ.....।"

সে একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে গণ্ডদেশে গড়িয়ে পড়া অশ্রু মুছে নিল। তারপর মাথা উত্তোলন করে হাত দু'টো আসমানের দিকে উঠিয়ে দু'আ করল ঃ

"হে আল্লাহ! হে মাবুদ! তুমি এসব জালেমদেরকে কখ্খনো ক্ষমা করো না।"

এরপর আর কি হবে?

এসব সার্ব খৃষ্টান মৌলবাদীরাই তো রাতকে করেছে রক্তাক্ত, আর দিনকে রূপান্তরিত করেছে ভয়াল মৃতপুরীতে!

এসব লোকেরা নামেমাত্রই হোক.... কখনো কি অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবে?

সে সময় কি আসবে, যখন তারা নিজেদের বড় হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসবে?

কিন্তু তাদের এই স্বপ্ন, এই কল্পনা, এই অহমিকার কি পরিণতি ঘটবে?

যেসব বালককে তারা আহত কিংবা পঙ্গু করেছে, বা যেসব নিরীহ শিশুরা তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের মুখোমুখী হওয়ার কি এসব হায়েনারা সাহস পাবে কখনো?

যখন মারণাস্ত্র তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, তখন কি

তাদের এই অর্থহীন বিদ্বেষ ও হিংসা তাদের অনুভূতিকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে?

তারা কি জানতে পারবে যে, যেসব মুসলমান বীর যুবকদেরকে তারা হত্যা করেছে, তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে? তাদের মাতম, তাদের শোক ভবিষ্যত প্রজন্ম কীভাবে পালন করবে?

তারা কি সেসব মৃত্যুবরণকারী, শাহাদাতবরণকারী জোয়ানদের ভাই-বন্ধু এবং ছেলে-সন্তানদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে? পারবে কি তাদের অন্তরের দাবানলকে নির্বাপিত করতে?

ইনসাফ ও ন্যায়ের গুণ প্রতিটি বিবেকবান মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, এদের মধ্যে কি সেই ইনসাফের বিন্দুমাত্র আছে? না... না... এরা জালেম.... এদের মাঝে মানবতার কোন গুণই বিন্দুমাত্র পাওয়া যাবে না।

আমি সেসব হাজার হাজার লাখ লাখ লোকদের মধ্য হতে একজন, যারা একটা বিরামহীন নির্যাতন, নৃশংসতা ও নিপীড়ন সকাল-বিকাল সহ্য করেছে, যার অন্তর সার্ব হায়েনাদের বন্দুকের নলের আঘাত বরদাশত করেছে, যার শরীরের চামড়া বারবার তাদের লোহার ও কাঠের শক্ত ডাণ্ডা দ্বারা দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে ফেলা হয়েছে, আর রক্তাক্ত করা হয়েছে পুরো অস্তিত্বটাকে।

আমি সেসব হাজার হাজার লোকদের মধ্য হতে একজন, যে নিজের হৃদয়ের অত্যন্ত গভীরে একটা মহাভারী বোঝা বহন করে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করছে, যার যখমের নিশানগুলো অত্যন্ত ভয়ানক ও সদা তাজা থাকবে, যা কখনো শুকাবে না।

মনের এ আশা নিয়ে ক্ষত-বিক্ষত অস্তিত্ব নিয়ে বিচরণ করছি, হয়তঃ কোন এক সময় এমনও আসবে, যখন এই দাগগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, চিহ্নগুলো মিটে শেষ হয়ে যাবে, আর বিজয় হবে মানবতার।

সমাপ্ত

ঈমানদীপ্ত জিহাদী দাস্তান

মূল
খাওলা বেগোভিচ

অনুবাদ
শেখ নাঈম রেজওয়ান

আগুন.... !

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে এ আগুন। যে আগুনের ইন্ধন হলো, মানবদেহ। এ ভয়াবহ আগুনের বিশাল কুণ্ডকে রক্তের প্রবল বর্ষণও ভরতে পারছে না। এর স্ফূলিঙ্গ আমার শিরা-উপশিরাগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

এটা আবার কোন্ মৌসুম?

এ আবার কেমন উত্তাপ? যার প্রখরতা ক্রমেই বেড়ে চলছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বাকশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এই আগুন আমার সবকিছুকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে। আমি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও কিছুই বাঁচাতে পারব না।

কিন্তু কেন?

পরিস্থিতিটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের আকৃতি ধারণ করে আমার সামনে নৃত্য করছে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, এসবই যেন অন্য জগতের, কোন অস্তিত্বহীন শব্দকোষের পরিত্যক্ত শব্দ।

আশ্রয়ের সন্ধানে

আমি আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড়াচ্ছি, আর দৌড়াচ্ছি। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? সে তো অদৃশ্য উদ্যানের মত পাতালপুরীর কোন গভীরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে। এখন হয়তঃ বাঁচার কোন উপায় নেই। ভাবতে লাগলাম, যদি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে মৃত্যুবরণ করাটাই আমার তকদীরের লিখন হয়, তাহলে বুযদীল ও কাপুরুষের মত কেন দৌড়াচ্ছি? মনসূর হাল্লাজের ন্যায় আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে কেন ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে পড়ছি না? কিংবা সক্রেটিসের মত স্বহস্তে কেন বিষের পেয়ালা পান করবো না? এটাই তো হবে আমার জন্য উত্তম পথ। এটা ভেবেই

আমি দৌড় পরিত্যাগ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ধাবমান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একেবারে আমার কাছে এসে পড়ল। মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাপার! কিন্তু, তবুও আমি অনড় রইলাম।

দুঃখের পুলসিরাত

হঠাৎ কারো কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠলাম। দূর থেকে, অনেক দূর থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে, নাড়া দিচ্ছে ও হেলাচ্ছে ঃ

"খাওলা, খাওলা, আল্লাহর ওয়াস্তে জ্ঞান ফিরিয়ে আনো, খা—ওলা।"

মৃদু ডাক ছাড়াও সে আমার হাত ও মুখ ঝাকাচ্ছে। অবশেষে আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। জীবনের জাহান্নামে পুনরায় ফিরে এলাম। আমি চোখ দুটো মেলে ফ্যালফ্যাল করে চতুর্দিকে তাকালাম। আগুন কোথাও ছিল না। কোথাও তা নজরে আসছে না। যে আগুন সব কিছু জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়, তা দেখাও যাবে এটা জরুরী নয়। দৃশ্যহীন আগুন তো দৃশ্যমান আগুনের চেয়েও বেশী যন্ত্রণাদায়ক, বেদনাদায়ক।

"খাওলা বেটী! কথা বল, সম্বিৎ ফিরিয়ে আনো!" কমাণ্ডার তাহের বেগোভিচ্ এর কণ্ঠস্বর শুনে আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম।

"শুয়ে থাকো বেটী! শুয়ে থাকো। তুমি আবারো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। তোমার যখম তো এখন সেরে উঠছে, আল্লাহর উপর ভরসা রাখো, বেটী! নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করো। যদি তোমার এমনই অবস্থা হয় তাহলে তোমাকে লুকিয়ে রাখা, বরং আমাদের নিজেদের পক্ষেও লুকিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তোমার এমনভাবে ছটফট করাতে তোমার মুজাহিদ ভাইরাও হীন মনোবল হয়ে পড়বে। দুঃখ-বেদনা তো এখানে রোদের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রত্যেকেরই নিজের আপনজনের কথা, দুঃখ বেদনার কথা মনে পড়বে। এতে আমরা সকলে শোকে মুহ্যমান হয়ে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিল করতে অনেক পিছিয়ে পড়বো।" তিনি খুবই স্নেহভরে মৃদুকণ্ঠে আমাকে বুঝাতে লাগলেন।

"যদি.... যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, তাহলে আপনি আমাকে চলে

যেতে অনুমতি দিন তাহের আংকেল। আমি আমার ভাই সফদর, বোন ছামারা ও আলীকে তালাশ করবো.... কিংবা আমি নিজেও তাদের মত কোথাও হারিয়ে যাবো। অন্ততঃপক্ষে দুঃখের এই পুলসিরাতের সফর থেকে তো মুক্তি পাবো। আমি প্রতিটি মুহূর্ত দুশ্চিন্তার এক মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।" যেসব অশ্রু অগ্নি সফরের প্রাক্কালে বেঁচে গিয়েছিল, সেগুলো এখন আমার চোখের পলকের সীমানা পেরিয়ে গণ্ডদেশে পৌঁছে গেছে।

"না, বেটী! না...। আমার উপর তোমার বাবার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। মুসলিম বসনিয়ার কন্যাদের রক্ষা করার দৃঢ় শপথ করেছিলাম আমি ....। কিন্তু, কাকে বাঁচাতে পেরেছি .... স্বয়ং নিজের মেয়েকেও রক্ষা করতে পারিনি ....." তার কণ্ঠস্বরটা অশ্রুর স্রোতে ভিজে যাচ্ছে।

"এখন আমি যতটুকু করতে পারি, আমাকে তা করতে দাও। তুমি শুধু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো, এতটুকুই যথেষ্ট। এ কথাটি অবশ্যই স্মরণ রাখবে যে, তুমি হচ্ছো বসনিয়ার শহীদ মুফতী আযম ইসমত বেগোভিচ (রহঃ)–এর বংশের কন্যা।" এ কথা বলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে কামরা হতে বেরিয়ে পড়লেন।

একটি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

আমি কামরায় একা ছিলাম। পাথরের তৈরী এই ছোট্ট কক্ষটি একটি ইমারতের ভূগর্ভস্থ অংশ। কামরায় ফার্নিচার বলতে কয়েকটি স্টুল, আর বড় দুটি কার্টন। কার্টনের ভিতর কিছু ঔষধ–পথ্য, অস্ত্রোপচারের যন্ত্র ও সিরিঞ্জ ইত্যাদি। এসব দিয়েই কয়েকদিন পূর্বে কমাণ্ডার তাহির চাচা স্বয়ং আমার শরীরে বিদ্ধ গুলিগুলো বের করেছিলেন। সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে আমার পুরো শরীরটা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলো। এই কামরা, এখানে বিদ্যমান প্রতিটি জিনিস, অতীত মুহূর্ত, এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত একটি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। শুধু একটি আশা, একটি ভরসা যে, হয়তঃ কেউ আমাকে এ দুঃস্বপ্নের জীবন থেকে উদ্ধার করবে, জাগিয়ে তুলবে, এরপরই সব ঠিক হয়ে যাবে।

চোখ মেললে অবস্থার ভয়াবহ রূপ আমাকে আরো আতংকগ্রস্ত করে দেয়। কিন্তু চোখ বন্ধ করলে ঠিক একই রকম তেলেসমাতি শুরু হয়ে

যায়। মা, বাবা, আলী, রায়হান, ছামারা ও সফদর—সবার সহাস্য চেহারা ও তাদের পরস্পরে কথাবার্তা বলার সে দৃশ্যাবলী আমার মানসপটে ভেসে উঠে।

শৈশবের স্মৃতি

আম্মা প্রতিটি জিনিস খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। আমাদের ভাইবোনদের মধ্য হতে কেউ যদি এসব জিনিস একটু এদিক-সেদিক করতো, তাহলে তাকে তিরস্কার করতেন। আমি বড় মেয়ে হওয়ার কারণে তার অতি আদুরে ছিলাম। আলী তো আমাকে হোম সার্ভিসের গোয়েন্দা বলে অভিহিত করতো। আমার প্রতিটি স্মৃতিকে আম্মা খুব যত্ন করে সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন। আমার দুগ্ধ দাঁত, হাসপাতালে পরিধেয় পরিচিতি রং, প্রথম কাপড় জোড়া, ঝুনঝুনি, প্রথমবার মুণ্ডিত চুলের ঝুটি, এমনকি আকীকার বকরীর একটি ছোট্ট হার—এসবগুলোকে তিনি একটি খুবসুরত কৌটায় অতি যত্নসহকারে সেন্ট মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। আমার জীবনের পুরো অতীতকে আমার আম্মা ভালভাবে হিফাজত করে রেখেছিলেন। কিন্তু আমি নিজে ভেঙ্গে পড়েছি, এমন মারাত্মকভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি যে, নিজকে নিজে চিনতে কষ্ট হচ্ছে।

ইলম ও কিতাব প্রেমিক

চোখ বন্ধ রাখা সত্ত্বেও যে দৃশ্য আমার সামনে ভেসে উঠছে, তাহলো একটি উঁচু খুবসুরত গৃহ—যার দ্বারগুলো সব সময়ই সবার জন্য সেই ঘরে বাসিন্দাদের খোলা মনের মতই থাকতো উন্মুক্ত। আমার বাবা মুফতী ফারাছাত বেগোভিচ পুরো সারায়েভোতে ছিলেন অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। কারণ, শহরের প্রতিটি এলাকায় ছিল তার অগণিত ছাত্র ও ভক্ত। বাবা 'কারছা মালিবাহা মাদরাসা'য় শিক্ষকতা করতেন। মাদরাসাটি পুরো দেশে মুসলমানদের প্রধান ও সবচে' বড় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। কিতাব, ইলম—এ দু'টোই ছিল বাবার জীবন। তার কাছে তিন হাজার অত্যন্ত দামী ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অমূল্য ভাণ্ডার ছিল। এ কিতাবগুলো অন্যান্য লাইব্রেরী হতে ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। যেগুলোকে তিনি গভীর চিন্তা

ভাবনার পর বিশেষভাবে নিজের শাগরেদদের জন্য তরতীব দিয়েছিলেন।

আনুমানিক বিশ বছর পূর্বে এ লাইব্রেরীটি তার সদিচ্ছার ছোট কূপ ছিল। এখন তা সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। যেসব ছাত্র এখান থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন, তারা স্বেচ্ছায় সানন্দে অনেকগুলো গ্রন্থ বর্ধিত করে যেতেন, যেন এ লাইব্রেরীটি একটি সম্মিলিত মালিকানাধীন লাইব্রেরী। তার একটি প্রত্যয়, একটি অঙ্গিকার ছিল যা বাস্তবায়িত হতে চলছিল। বাবা এটাকে 'প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বালানো' বলে আখ্যায়িত করতেন। মনে হয় এ কারণেই এ লাইব্রেরীটির নাম পড়ে যায় 'জ্বলন্ত প্রদীপ'। জানি না, কত লোক এই চেরাগের আলো হতে নিজেদের অন্তর মস্তিষ্ক ও বক্ষকে আলোকিত করেছেন। এ লাইব্রেরীটি আমাদের গৃহের আঙ্গিনার এক পাশে অবস্থিত। বিদ্যানুরাগী ছাত্রদের কাফেলা রীতিমত এখানে আসতে থাকতো। বাবার ছাত্ররাই এ লাইব্রেরীটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতো। প্রাচীন কিতাবসমূহের প্রতি দুর্বল ছিলেন শহরের ওলামাগণ। তাদের কয়েকজন বাবার সহপাঠী। কিতাবের আলোচনা চলাকালে বাবা প্রায়ই আবেগময় হয়ে যেতেন। আব্বাকে কেউ অধ্যয়নের জন্য নতুন কিতাব দিলে তাকে ভাবাবেগে এত উত্তেজিত দেখা যেত যে, মনে হত যেন তিনি স্বয়ং এ কিতাবটি লিখেছেন। ঘন্টা ভরে এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। নির্বাচিত অংশ পাঠ করে শুনানো হত, মনে হত যেন কোন ধর্মীয় উৎসব চলছে।

এদিক দিয়ে বাবা ও মা উভয়ই সৌভাগ্যবান ছিলেন। তারা দু'জনই গ্রন্থপ্রেমিক ছিলেন। এসব তারা উত্তরাধিকার সূত্রেও পেয়েছিলেন। যদি এমনটি না হত তাহলে নিঃসন্দেহে দু'জনের পক্ষেই দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হয়ে যেত। আম্মা পড়ার সাথে সাথে খুব সুন্দর লিখতেও পারতেন। মাসিক ম্যাগাজিন 'গ্লাছাং' (আল বালাগুল ইসলামী)তে তার রচনাবলী ধারাবাহিকভাবেই প্রকাশিত হত। এটা বসনিয়ার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইসলামী ম্যাগাজিন। তিনি বাবার কিতাবসমূহকে নিজের সন্তান বলে অভিহিত করতেন। তিনি এগুলোর যত্ন ও খেয়াল এমনভাবে করতেন যেমন কোন মা তার সন্তানদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যের প্রতি খেয়াল রেখে থাকেন।

চন্দ্র ও সূর্যের বন্ধন

বাবা আম্মাকে অনেক অনেক ভালবাসতেন, আর আম্মাও ছিলেন খুবই ছিপছিপে, পাতলা ও স্মার্ট। আম্মাকে লোকেরা সাধারণতঃ আমার বড় বোন ভাবতো। মনে হত যেন আল্লাহ তাআলা তাকে হাসির জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যত বড় সমস্যাই আসুক না কেন, কোন সময় তার মুখ থেকে হাসি গায়েব হতো না। সব জিনিসকেই তিনি সহজ ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের কাছে যারাই বেড়াতে আসতেন, তারা আব্বা আম্মাকে 'চন্দ্র ও সূর্যের বন্ধন' বলে আখ্যায়িত করতেন।

বাবা অধিকাংশ সময় বলতেন, আম্মার সাথে বিবাহের জন্য তার কতই না পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমার নানা–নানী কিতাবের অনুরাগী শিক্ষকের সাথে কন্যার বিবাহ দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল, বাবা যা কিছু উপার্জন করবেন, সেগুলো কিতাব ও ছাত্রের পিছনেই ব্যয় করে দিবেন, এতে তাদের একমাত্র কন্যা আনন্দে থাকতে পারবে না। কিন্তু অবশেষে আব্বা তাদেরকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হন। বাবার বক্তব্য অনুসারে, 'সত্যিকারের প্রেমিক' এমনই হয়ে থাকে ঃ বিয়ের প্রস্তাব ও কথাবার্তা স্থির হওয়ার পর থেকে শাদীর পূর্ব পর্যন্ত যদিও তারা মেলামেশা করেননি, তবুও বাবা প্রতিদিন ভোরে সাইকেল চালিয়ে ছয়মাইল অতিক্রম করে আম্মাদের বাড়ী চক্কর লাগাতেন এবং আম্মাও খিড়কী দিয়ে চুপে চুপে তাকে দেখতেন।

বাবা যখন এসব কথা বলতেন, তখন আম্মা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে নিতেন। এরপর বাবার কথাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু বাবা তার কথার সমর্থনে আরো তথ্য পেশ করতেন যেগুলোকে 'নতুন আবিষ্কার' বলতেন, এ সবই আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো।

একটি সুখী পরিবার

মোটকথা, আমাদের জীবনটা হাসি–খুশী ও আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। আমি ছিলাম আমাদের ঘরের সকলের বড়, আর এজন্যই আমি ছিলাম সবার কাছে সবচেয়ে বেশী আদুরে। সবাই বলতেন, যেভাবে কিসসা কাহিনীতে যাদুকরের জান কোন চড়ুই পাখীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ঠিক

তদ্রূপ বাবার প্রাণটা আমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রবল স্নেহ, অফুরন্ত মায়া-মমতায় পূর্ণ হৃদয়, হাস্যমুখ-বাবা বাল্যকাল থেকেই ছিলেন আমার আইডিয়াল বা আদর্শ। রায়হান ছিল আমার থেকে দু' বছরের ছোট। তারপর ছামারা এবং সর্বকনিষ্ঠ ছিল সফদর। এটুকুই ছিল আমাদের জগৎ। আমাদের সবার কাছে বাবার শুধু একটাই দাবী ছিল, মন লাগিয়ে, মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করা। ঘরের পরিবেশ সন্তানদের উপর প্রভাব ফেলবেই। আর আমাদের ঘরখানা তো ছিল একটা কিতাব ঘর। এজন্য বাল্যকাল থেকেই আমাদের খেলাধুলার চেয়ে বেশী মনোযোগ ছিল বইয়ের প্রতি। আমি একেবারে শৈশবকালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমিও বাবার ন্যায় শিক্ষকতা করবো।

ঈমানের দুর্বলতা

রায়হান এডভোকেট, আর ছামারা হতে চেয়েছিল ডাক্তার। সফদর আম্মার মত লেখার প্রতি ছিল বেশী আগ্রহী। আমার বয়স যখন চৌদ্দ, আলী আমাদের ঘরে থাকতে এলো। আলী আমার চাচার ছেলে। চাচাজান পরলোকগমন করলে চাচীর অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়। পরে চাচী ও বাবার খাহেশ মোতাবেক আলী আমাদের ঘরে চলে আসে। আলী আমার চেয়ে দু' বছরের বড় কিন্তু ও যখন কথা বলতো তখন মনে হত অনেক বড় দার্শনিক। মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, তার জন্য রক্ত দেয়া এবং এ ধরনের আরো অনেক কথা ওর মুখ থেকেই আমি সর্বপ্রথম শুনতে পাই। ব্যাপারটি এ রকমও নয় যে, আমি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই, কিন্তু আলী যেভাবে জিহাদ, সংগ্রামের কথা উপস্থাপন করতো, আলোচনা করতো, তা শুনে আমার অন্তরাত্মাটা কেঁপে উঠতো। "ক্ষান্ত করো, আলী! ক্ষান্ত করো, আমরা যেমন আছি, তেমনই ভাল" আমি ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলতাম।

"এটাই তো হল ঈমানের দুর্বলতা। আল্লাহর নামে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে, তাদেরকে মৃত বলে না, তারা হল জীবন্ত। আর এ জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলমানদের উজ্জীবিত রাখা সম্ভব, অন্যভাবে নয়, পাগলী! কিন্তু তোমাদের মেয়েদের মনটা একেবারেই চড়ুই পাখীর মত

ছোট্ট।” ও সব সময় এ ধরনের কথা বলতো। আলী পড়ালেখায়ও ছিল খুবই অগ্রসর। তাছাড়া ও অনেক ভাল ভাল বিপ্লবী জিহাদী কবিতা আবৃত্তি করতে পারতো। বাবা তো ওর কয়েকটা কবিতা শুনেই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ওর বন্ধুরা আমাদের গৃহে আসলে তাদেরকেও এসব কবিতা শুনাতো, এতে করে কবিতার একটা আসরও জমে যেত। অনেক সময় এমনও হত যে, ওর বন্ধুরা কবিতার কোন একটি পংক্তি বলতো, আর অমনি ও ফর ফর করে পুরো কবিতাটাই শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ ও হতবাক করে দিত।

পরিণত জীবনের প্রস্তুতি

আলী আমাদের ঘরে আসার কিছুকাল পরেই বাবা আমার এবং ওর কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে আমরা একজন অপরজনের জীবনসঙ্গী হবো। হয়তঃ এজন্য হলেও আমার কাছে ওর প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি অভিনয় ভাল লাগত। আমরা একজন আরেকজনকে বাল্যকাল থেকেই জানতাম। কিন্তু দিবা–রাতের সঙ্গী হওয়াতে সেই জানা, সেই পরিচিতি এখন ভালবাসায় রূপ নেয়। আমাদের দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর হাসি ও আনন্দের মধ্যে কেটে যাচ্ছিল। আমি আমার শিক্ষা পরিপূর্ণ করলাম। আলীও শিক্ষা সমাপন করে বাবার সাথে মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করে দিলো। রায়হান এল.এল.বি–র প্রথম বছরের পরীক্ষার্থী, আর আমাদের ছোট্ট মুন্নী পুতুল ছামারা ডাক্তারীতে ভর্তি হওয়ার অপেক্ষায়। আমাদের বাড়ীতে প্রতিদিনই একটা উৎসবের পরিবেশ লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু কয়েকদিন হতে বাবা মার মধ্যে কিছুটা উচ্চবাচ্য চলছিল। আম্মার বক্তব্য, এখন আমার ও আলীর বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। বাবার মতও আম্মার মতের অনুরূপই। তাই বিয়ের প্রস্তুতি চলল।

আমাদের বিশেষ খান্দানী রেওয়াজ অনুযায়ী, যে কন্যার বাগদান হবে, তাকে লবঙ্গ, এলাচী ও বিভিন্ন শুষ্ক ফলফলাদি দ্বারা হার বানিয়ে তা তার গলায় পরিয়ে দেয়া হত। এজন্যই আম্মাকে অবসর সময়ে শুষ্ক ফল ও সুই সুতা নিয়ে মশগুল থাকতে দেখা যেত।

তুফানের পূর্বাভাষ

সে দিনগুলোতে সারায়েভো শহরে, বরং পুরো দেশটিতে একটা আজব ধরনের আবহাওয়া বইতে শুরু করেছিল। পরিস্থিতিতো কোন সময়ই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না। মারপিট, নির্যাতন, যুলুম সব সময়ই মুসলমানদের উপর চলতে থাকতো। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক শ্লোগান তো একটা জাতীয় শ্লোগানের রূপ নিয়েছিল। মুসলমানগণ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায়ও নিম্নশ্রেণীর নাগরিক বলে পরিগণিত হত। অধিকাংশ নাগরিক অধিকার থেকেও তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। এমনকি কোন মসজিদ নির্মাণ কিংবা নামায পড়ার জন্যেও সরকারের অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা বাহ্যিকভাবে শান্ত মনে হলেও এটা যেন প্রলংয়করী তুফানের পূর্বাভাষ। একটা থমথমে ভাব সব জায়গায় বিরাজ করছিল। বাল্যকাল থেকে যাদের সাথে খেলাধুলা করেছি, তাদেরকে কেমন কেমন অপরিচিত ও শত্রু মনে হচ্ছিল। মহব্বতভরা হাসি ও মানবতাবোধ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। মস্তিষ্কে লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষ যেন প্রতিটি লোকের ব্যক্তিত্বকে চরম হিংস্র ও হায়েনায় পরিণত করেছিলো। একটা ভয়াবহ অবস্থার পরিপূর্ণ পূর্বাভাষ সবদিকেই ছেয়ে যাচ্ছিল। সব দিকেই শুনা যাচ্ছে, আমাদের বসনিয়া হার্জেগোভিনা একটা ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। এ সংবাদটি অবশ্যই আনন্দের এবং প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ের স্পন্দন। একদিকে যেমন আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, ঠিক অন্যদিকে ভয় ও আতংকের কালো মেঘ প্রতিটি বস্তুকে গ্রাস করে ফেলার জন্য অস্থির মনে হচ্ছিল। মুসলমান যুবকদেরকে বেশ তৎপর দেখা যাচ্ছিল, আর বয়স্কদেরকে মনে হচ্ছিল যেন সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত রয়েছে এবং বক্ষ পেতে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মনে হচ্ছে যেন বসনিয়ার তৌহিদী জনতা 'বাঁচার মত বাঁচতে চায়, সমস্ত অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়' তাঁরা এই ইস্যুটি অর্জন করেই তবে দম নেবে।

আজকাল আলী ও রায়হান অনেক দেরীতে ঘরে ফিরে।

আব্বাজানকেও বেশ উৎসাহিত দেখা যাচ্ছে। দেশপ্রেম ও ইসলামপ্রেম কিভাবে অন্তর ও আত্মাকে পাগল করে দেয়, তার বাস্তব দৃশ্য এ সব দিনগুলোতেই দেখা যাচ্ছিল।

আমরা স্বাধীন

আমার বাগদান অনুষ্ঠানের দু'দিন পূর্বে বসনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। সে দিনটি ভয়, আতঙ্ক, সংশয় ও দ্বিধান্বিত অবস্থা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে ঈদের দিনের মত আনন্দ ও খুশির দিন মনে হচ্ছিলো। সবদিকই 'মোবারকবাদ, আশির্বাদ–এর আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছিলো। আমার বেশ মনে আছে, আমি ঘুম থেকে সবেমাত্র উঠেছি, আলী চিৎকার করতে করতে ঘরে প্রবেশ করল ঃ "আব্বু, আব্বু, আম্মী, আম্মী! মোবারকবাদ গ্রহণ করুন, আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। রেফারেণ্ডমে (গণভোটে) সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে; বসনিয়া যুগোশ্লাভিয়া থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন আমরা স্বাধীন বসনিয়া হার্জেগোভিনার নাগরিক।"

উত্তেজনায় আলীর কণ্ঠটি কাঁপছিল। শুধু কণ্ঠ কেন, ও নিজেও কাঁপছিল। খানিকের মধ্যে বাড়ির সবাই ওকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। ও দ্রুত শ্বাস নিয়ে নিয়ে সবাইকে বিস্তারিত ঘটনা বলে যাচ্ছে। যদিও আমরা সবাই জানতাম যে, এটা হবেই। কিন্তু তবুও একটা আশংকা ছিলো তাই নিজের কানে এসব শুনতে খুবই ভাল লাগছিল।

"হে আল্লাহ! তোমার অনেক অনেক শোকরিয়া আদায় করছি, এখন ইনশাআল্লাহ, এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে" আম্মা বললেন। কিন্তু বাবার চেহারা যেন অন্য কোন চিন্তায় ডুবন্ত মনে হল।

"আপনি কি ভাবছেন আব্বু! আপনি কি এ সংবাদে সন্তুষ্ট নন?" রায়হান জিজ্ঞেস করল।

মুসলিম রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস

"বেটা! আমি তো এত আনন্দিত যে, ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কিন্তু, বেটা! এটা উৎসব করার সময় নয়, বরং মুসলিম বসনিয়ার

নাগরিকদেরকে এ স্বাধীনতা রক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের সময়। ইতিহাস তার পাঠককে আগামীতে কি পরিস্থিতি ঘটতে যাচ্ছে তারও শিক্ষা প্রদান করে। আমি যা কিছু অনুভব করছি, আল্লাহ করুন আমার অনুমান যেন ভুল প্রমাণিত হয়, কিন্তু ইতিহাস তো কারোর তোয়াক্কা করে না, সে তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। আমাদের এ অঞ্চলের ইতিহাস মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত, জুলুম নির্যাতনে ভরা ইতিহাস। শতাব্দী পূর্বে এখানে প্রথমবার মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। এরপর কম্যুনিষ্টদের হাতে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে যায়। সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টান সম্প্রদায় শুধু এ আশংকায় যে, এখানে মুসলিম শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে! কতবার যে গণহত্যা চালিয়েছে, এগুলোতো তোমরা অনেকটা দেখছো বা জেনেছো। আর এখন তো মুসলমানরা একটি ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়েছে, এটা তো সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মুখে জোরদার চপেটাঘাত সমতুল্য, এটা তারা কিভাবে সহ্য করবে।"

"আমরাও তো চুড়ি পরে বসে রইনি। আমরাও তাদেরকে এমন মজা চাখাবো যে, অনেকদিন পর্যন্ত তারা তা অনুভব করবে।" সফদর চরম উত্তেজিত হয়ে বলল।

"বেটা! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। এ কারণেই আমরা সর্বস্থানে পেরেশান। যে জাতি পৃথিবীর সব জায়গায় এক দেহের ন্যায় হওয়া উচিত ছিল, তারা আজ বহুধা বিভক্ত। পক্ষান্তরে অমুসলিম কাফের সম্প্রদায় অন্য কোন ব্যাপারে একমত না হলেও মুসলিম বিদ্বেষ ও মুসলিম নিধনে সবাই ঐক্যমত।" বাবা অবসাদভরা কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন।

তিনি আরো বললেন ঃ "আল্লাহ করুন, এমন না হোক এবং আমার ধারণাটি যেন ভুল প্রমাণিত হয়। আচ্ছা, এখন আমি মাদরাসায় রওয়ানা হচ্ছি। কিছু জানাতো দরকার যে, কি হচ্ছে, খবর কি?"

"কিন্তু ... আজ যদি আপনি না যান.... তাহলে ভাল হয় না.....?" আম্মা বলে উঠলেন।

"কেন জান.....। এখনই তো আমাদেরকে আরো বেশী উদ্যমী হয়ে সচেতনভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত, যেন আমরা

আমাদের এ দেশটিকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী ও অন্যদের জন্য আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হই। বিবি! সাহস ও হিম্মতকে জোয়ান রেখো, নইলে বার্ধক্যের অপবাদ লেগে যাবে। তুমি কি শুনোনি, মন জোয়ান থাকলে সবসময় জোয়ান থাকা যায়।" বাবা নিজের বিশেষ ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন।

নতুন কিয়ামত

কিছুক্ষণ পরই বাবা আলীকে সাথে নিয়ে মাদরাসায় চলে গেলেন। আমরা সবাই ঘরে ছিলাম। রায়হান টিভিতে খবর শুনছিল। আম্মা অভ্যাস অনুযায়ী নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু তার ঠোঁট দু'টো যেভাবে অবিরাম গতিতে নড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার পুরো অস্তিত্বটা যিকিরে মগ্ন হয়ে আছে। হয়ত তার হৃদয়ের কোণে কোন অশনিসংকেত বেজে উঠেছে। এজন্যই তিনি রায়হান ও সফদরকে বাইরে বেরুতে কড়া নিষেধ করলেন।

সেদিন আমাদের বাড়ী, মহল্লা ও শহরের উপর দিয়ে একটা নতুন কিয়ামতের তাণ্ডবলীলা বয়ে গেল। কয়েক যুগ ধরেই তো এমন হচ্ছে যে, কোন মুসলমান যদি কোন মহল্লা কিংবা সড়ক দিয়ে হয়তো একাকী যাচ্ছে, তাকে সুযোগ পেয়ে সে অবস্থাতেই জবাই করে ফেলে রাখা হয়েছে। সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টানদের কাছে এ ছিল সাধারণ খেলা। তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের প্রতিবাদ করার, না অধিকার আছে, না কণ্ঠ। আর যেখানের মৌলিক নীতিই হচ্ছে ঃ 'জোর যার, মুল্লুক তার' সেখানে অধিকারের ব্যাপারে কিছু বলা বেকুবি বৈ কিছুই নয়। পুরো যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলমানদের পক্ষে শুধু বেঁচে থাকাটাই কম বড় কথা ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে একটা শক্তিরূপে, স্বাধীন মানুষ হিসেবে দণ্ডায়মান হওয়াটা দুঃস্বপ্নই মনে হচ্ছিল। তথাপি অত্র অঞ্চলের মুসলমানদের সৎসাহস ও জযবার কারণে আল্লাহর মেহেরবানীতে সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল। তারা একটা শক্তি ও স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু তারপর.... তারপরই শুরু হয়ে গেল সত্য মিথ্যার লড়াই। কম্যুনিষ্ট ও আর্থোডক্স খৃষ্টান

মৌলবাদী সার্বরা সারায়েভো সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে দিল। গোলাগুলির শব্দে ও বিভিন্ন খবরাখবর শুনে আমাদের সকলের মনটা আশংকায় কেঁপে উঠল। ভয় ও আতঙ্কে সবাই চরম উৎকণ্ঠিত।

মৃত্যু শীতল ভয়

বাবা ও আলী এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসেনি। তারা না জানি কোথায়, কী অবস্থায় আছেন? তাদের কথা চিন্তা করে মৃত্যু শীতল ভয় আমার হৃদয়ে চেপে বসছিলো। প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল। এমন কি আমাদের গৃহটিও নিরাপদ ছিল না। তবুও কিছুলোক এক সাথে থাকার কারণে হৃদয়ে অনেকটা দৃঢ়তা অনুভব করছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আব্বা ও আলীকে নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তিত ছিলাম।

আম্মা দুপুর থেকেই জানালার কাছে বসে আছেন। মাঝে মধ্যে আব্বার পথের পানে উঁকি মেরে দেখছেন, তিনি আসছেন কিনা। দূর দিগন্ত পর্যন্ত আগুন ও ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পুরো শহরটাতেই আগুন লেগে গেছে, আর আগুনের লেলিহান শিখা আসমান ছুঁই ছুঁই করছে।

বিকাল চারটায় হঠাৎ আমাদের মহল্লায় গুলির প্রচণ্ড শব্দে, মযলুম মুসলমানদের আর্তচিৎকার ও আহাজারিতে এবং মানব নামের কলংক সার্ব হায়েনাদের বেপরোয়া আক্রমণের শব্দে আমাদের মনটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হতেই রায়হান আমাদের দু'বোনকে ঘরের সাথে বানানো একটি ষ্টোররুমে লুকিয়ে রাখল, যা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিগোচর হতো না। রায়হান কড়াভাবে আমাদেরকে সতর্ক করে দিল, যদি সার্বরা ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ে তবুও তোমরা কোনক্রমেই এখান থেকে বের হবে না। রায়হান আম্মাকেও সেখানে লুকিয়ে থাকতে বলল। কিন্তু আম্মা ওর কথা মানতে প্রস্তুত হল না। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও আম্মার দৃঢ়তার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ পেলো না। তাঁর পবিত্র চেহারা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা ঈমান ও ইয়াকীনের আলোতে উদ্ভাসিত ছিলো।

আমার কিছুই বুঝে আসছিল না। হঠাৎ করে এসব কি হয়ে গেল। ধর্মের নামে এসব বর্বরতা বোধগম্য নয়। কত আশ্চর্য কথা, বিশ্বের প্রতিটি ধর্মই তার অনুসারীদেরকে ভালবাসা ও মানবপ্রেমের শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের নামেই বেশী রক্ত প্রবাহিত করা হয়।

হায় স্বার্থান্ধ মানুষ

কত আশ্চর্য, যমিন ও দুনিয়ার বিভিন্ন নিয়ামতরাজী সৃষ্টিকারী আল্লাহ, যিনি তার সব মাখলুক সকল মানুষের জন্য সৃজন করেছেন, সেই মানুষ পার্থিব জগতের মোহে পড়ে নিজেরই মত আরেকজন জীবন্ত জাগ্রত মানুষের জীবিত থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে চায়। 'গ্রেটার সার্ব রাজ্যের' স্বপ্নে মাতাল হয়ে সার্ব খৃষ্টানরা মনুষ্যত্বের সব গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে আজ হিংস্র দানবের আকৃতি ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে যেন কোন যাদুকর যাদুর ছড়ি ঘুরিয়ে তাদের অন্তর থেকে মানবপ্রেম বস্তুটিকে বের করে দূরে কোথাও নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এখন হিংসা ও বিদ্বেষ সংক্রামক ব্যাধির মত এরূপভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যেন একটা মহাশক্তিধর হিংস্র দানব পুরো সমাজটাকে কেবলমাত্র নিজের বংশের আবাসস্থলে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে।

অন্যান্য জায়গার ন্যায় আমাদের আশেপাশেও বর্বরতার আঁধার ছেয়ে গিয়েছে। আর এ অন্ধকারে রক্তপিপাসু সার্ব হায়েনারা রক্তের হোলী খেলার হিংস্রতায় মেতে উঠছে। তাদের কাছে ছিল সবধরনের আধুনিক মারণাস্ত্র। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ মুসলমানের কাছে আত্মরক্ষার জন্য একটি পিস্তল পর্যন্ত ছিল না।

জ্ঞানের শত্রু

আমি এবং ছামারা দরজার ফাঁক দিয়ে পাশের কামরাগুলোর দৃশ্য দেখার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলাম। আতংক আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে নির্গত হচ্ছিল। আমি বড় বিধায় চেষ্টা করছিলাম, ছামারা যেন আমার চোখের অশ্রু না দেখে। শব্দের ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ডতা ও গুঞ্জন শুনে বুঝতে পারছিলাম যে, হিংস্র দানবরা আমাদের ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে।

ওদের প্রথম টার্গেট ছিল 'জ্বলন্ত প্রদীপ' অর্থাৎ বাবার কিতাবে ভরপুর লাইব্রেরীটি। ওরা পেট্রোল মেরে লাইব্রেরীর কিতাবগুলো জ্বালিয়ে দিল। আম্মা লাইব্রেরীটি এভাবে জ্বলতে দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন।

আম্মার এতটুকু শক্তি ছিল না যে, তিনি কোন প্রকারে এত বছরের সাথী কিতাবগুলোকে নিজের কোলে লুকিয়ে হেফাযত করবেন। বাবা বিন্দু বিন্দু করে গ্রন্থের যে সমুদ্র ভাণ্ডার গড়েছিলেন, ক্ষণিকের মধ্যেই লেলিহান অগ্নিশিখায় তা ভস্মীভূত হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের হলরুমটি সশস্ত্র লোকে ভরে গেল। তাদের হাতে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। সবাই মুখোশ পরা। সেই মুখোশ থেকে চেহারার যতটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে, তাতে হিংস্রতা ও পাশবিকতা ফুটে উঠছে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকে তারা ধ্বংসের তাণ্ডবলিলা শুরু করে দিল।

"থামো... আমার কথা শুনো.... তোমরা কি চাচ্ছো?" আম্মা রায়হান ও সফদরের হাত শক্তভাবে ধারণ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল।

"আমরা আর কি চাচ্ছি, চাচ্ছো তো তোমরা। আলাদা দেশ, নিজেদের পৃথক মর্যাদা, স্বাধীন মর্যাদা, ঠিক তাই না!" ওদের মধ্য হতে একজন বিষাক্ত কণ্ঠে বলল।

"আমরা বেচারারা মাত্র তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়ার চেষ্টা করছি, আর সে স্বাধীনতা হচ্ছে তোমাদের জীবন থেকে স্বাধীনতা, বুঝলে বুড়ী!"

"আরে হাঁ ভাই, তোমাদের তো এখনো খবরই হয়নি। তোমরা কি তোমাদের বুড়োর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, সে কোথায়?" অন্য একজন আম্মার একেবারে সামনে এসে দাঁতগুলো বের করে নির্লজ্জভাবে খিলখিল করে হেসে বলল।

"কি.... কি হয়েছে?" আম্মা আঁতকে উঠে বললেন।

"সুসংবাদ আছে... সুসংবাদ.....।"

"কি হয়েছে, বেটা! খুলে বলো.... !"

"বকবক করো না বুড়ী; আমি তোমার বেটা নই। যদি খবর শুনতেই চাও তাহলে দৌড়ে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে এসো!" সে খুবই গোস্তাখী কণ্ঠে বলল।

"তুমি কথা বলার আদব কায়দা শিখো নাই নাকি! তুমি নিজেকে কি

ভাবছো.... বদতমীজ কোথাকার।" রায়হান গোস্বায় নিজেকে সংযত করতে না পেরে বলল।

"মুখ চালাস, মুসলমান হয়ে আমাদের উপর দিয়ে কথা বলা, এত বড় স্পর্ধা, এখখুনি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" অন্য একজন চিৎকার দিয়ে বলল।

কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য

তারপরেই সে দু'জন রায়হানকে নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করল। কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য। আম্মা মার দেখে চিৎকার মেরে কাঁদছিলেন। রায়হানের শরীরকে ওরা ওদের ফৌজী বুট ও বন্দুকের বাট দিয়ে থেতলে দিচ্ছে। রায়হানের শরীর ও মাথা ফেটে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। ওর হৃদয় বিদারক চিৎকার ধ্বনিতে মনে হচ্ছে, আকাশ বাতাস ফেটে পড়বে। কিন্তু এখানে ওর চিৎকার কে শুনবে। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি গলি থেকেই এমন হৃদয়বিদারক চিৎকার ভেসে আসছে। আম্মা রায়হানকে বাঁচানোর জন্য আড়াল করে ধরে ওর রক্তাক্ত দেহটা কোলে তুলে নিলেন। ফলে বন্দুকের একটি বাটের আঘাত আম্মার মাথার উপর গিয়ে পড়ল। তার মাথা হতে ফিনকি দিয়ে রক্তের একটা চিকন স্রোতধারা বেয়ে চললো। সফদরকে দু'জন শয়তান প্রথমেই টেনে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল।

"তোমাদেরকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, ওকে ছেড়ে দাও, আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করেছি? কি শত্রুতা করেছি? আমার ছোট্ট ছেলেটিকে ফেরত এনে দাও, আল্লাহর ওয়াস্তে।" আম্মা কেঁদে কেঁদে বলছিলেন।

"এখন তো তোমাকেও আমাদের শাস্তিভোগ করতে হবে, হে বুড়িয়া! এখন এ এলাকায় একটি মুসলমানও বাঁচতে পারবে না। তোমাদেরকে পবিত্র যিশুর নামে কুরবানী করা হবে। এসব এলাকাই 'গ্রেটার সার্বিয়ায়' রূপান্তরিত হবে। সাফাই হবে, সাফাই, বড় ধরনের নিধন হবে, তোমাদের সবাইকে কীট-পতঙ্গের মত মরতে হবে বুঝলে।" তাদের মধ্য হতে একজন মাতালের মত বলল।

"তোমাদের মধ্য হতে একজনও এখানে থাকবে না। তোমরা তো পৃথক রাষ্ট্র কামনা করছো, তাই না, আমরা তোমাদেরকে অন্যজগতে

পাঠিয়েই তবে দম নেব।"

"কিন্তু.... কিন্তু.... তার পর কি হবে?" তোমরা যা কিছু বলছো, এসব যদি হয়েও যায়, তবে কি তোমাদেরকে কখনো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সামনে হাযির হতে হবে না? সেখানও কি তোমরা চেহারার উপর মুখোশ পরে যাবে? রক্তের এই দাগ কিভাবে লুকাবে তোমরা, বলো, জবাব দাও!" আম্মা তাদের চোখে চোখ রেখে বললেন।

"অনেক ঘেউ ঘেউ করছে এই বুড়ীটি, এখনই এর দফা ঠাণ্ডা করে দিতে হবে.....।"

কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে তারা তাদের যুলুমের হাত প্রসারিত করল। আমরা দু'বোন দরজার সাথে চুপ মেরে বসে কাঁপছিলাম। তাদের মধ্য হতে একজন আম্মার লম্বা খুবসুরত চুলগুলো মুষ্টিতে ধরে জোরে টান মারল, ব্যথায় আম্মার মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল।

"আর হাঁ, এখন তোমাকে একটি সুসংবাদও শুনাতে চাই, তাহল, তোমাদের জ্ঞানের মিনারটিকে আমরা লম্বা করে চিরদিনের মত শুইয়ে দিয়েছি। তাকে যিশুখৃষ্টের নামে বলি দিয়েছি, তুমি শুনছো নাকি বুড়িয়া, সে এখন পরজগতে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতে চলে গেছে।"

তাদের মধ্য হতে একজন জোরে অট্টহাসি হেসে বলল—

"বাহ্, কত সুন্দর ভাষায় বুঝিয়ে দিলে।"

আরেক হায়েনা তাকে সাবাস দিয়ে বলল—

"জ্ঞানপিপাসু পরিবারের সাথে এমনভাবেই কথা বলা উচিত।"

আম্মা নির্বাক দণ্ডায়মান ছিলেন। রায়হান তো পূর্বেই অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল। আমরা দু'বোন প্রথমে তার কথা বুঝতে সক্ষম হলাম না। কিন্তু যখন তার বক্তব্য নিজের পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ আমাদের মানসপটে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তখন বাবার মস্তক ছিন্ন টুকরো টুকরো দেহ রক্তের বন্যাসহ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমাদের দু'বোনের মুখ থেকেই চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল। ছামারা তো চিৎকার মেরে কাঁদতে কাঁদতে ষ্টোর রুম থেকে বেরিয়ে আসল এবং আম্মাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই রইলাম। আমার মনে

হচ্ছে, যেন দূর দূর পর্যন্ত বাবার রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পুরো জগৎটাই যেন তার রক্তে ডুবে গেছে। বাবার হাস্যমুখ চেহারাখানা আর মিষ্টি মিষ্টি কথা আমার কল্পনা জগতে ভেসে উঠলো। তাঁর কথা, তাঁর হাসি এবং হাত প্রসারিত করে বুকের সাথ টেনে নেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুই একের পর এক দৃশ্য আমার সামনে ভেসে উঠলো। ফলে ক্ষণিকের জন্য হলেও বর্তমান পরিস্থিতির উপর থেকে মনের দৃষ্টিটা সরে গেল। তিনি যে আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবেন, তা কখনো কল্পনাও করিনি। আমি যেন একটা অনুভূতিহীন ভূমিতে অবতরণ করছি। কিছুক্ষণ পূর্বের দর দর করে বেয়ে পড়া চোখ দু'টো এখন শুষ্ক কূপে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। আমি যেন একটা হৃদয়হীন রুক্ষ মরুপ্রান্তরে পরিণত হয়ে গেছি। হলরুমে একটা বিকট চিৎকার ধ্বনি আবার আমাকে বাস্তব জগতে নিয়ে এলো।

"ও হো, এ সুন্দরীকে তাহলে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল.... ভালই হল, তুমি একা একাই চলে এলে।" একজন সার্বসেনা আম্মার শরীর জড়িয়ে রাখা ছামারার কোমল বাহুকে জোরে টানতে টানতে বলল।

"হাঁ, তোমার চেহারাখানা একটু দেখাও। ছি ছি, একি, এত সুন্দর সুশ্রী চোখ দিয়ে এভাবে পানি ঝরানো শোভা পায় কি! প্রিয়া, মানুষদের তো কোন না কোনদিন মরতে হবেই, সেজন্য কি কাঁদতে হবে?" অন্য একজন ফৌজী বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলল।

ছামারা আম্মাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। ওর বড় বড় চোখগুলো ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিল।

"তোমরা ... ইতরপ্রাণী.... শয়তান লম্পট.....। আমার মেয়ের দিকে যদি নজর উঠিয়েও দেখো, তাহলে আমি তোমাদের চোখগুলো উপড়ে ফেলবো।" আম্মার যেন হুঁশ ফিরে এলো। একের পর এক মুসীবত তাকে শক্ত ও সাহসী বানিয়ে দিচ্ছে। উপরন্তু, সন্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে মার তুলনায় সাহসী আর কেউ হতে পারে না।

"হো, হো, এখনো প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে এ বুড়ীর।"

"তোমরা কেমন মানুষ? কেউ কি এমন দুর্ব্যবহার করতে পারে?

তোমাদের কি মা, বোন নেই?" আম্মা অসহায় হয়ে বললেন।

"চলো ভাই, আমাদের হাতে এত সময় নেই। উঠাও মা–বেটী দু'জনকেই এবং গাড়ীতে ছুঁড়ে মারো। পরে এদের সাথে বুঝাপড়া করে নেবো।" একজন সার্ব বর্বর সেনা আম্মাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল।

"না, না, আমরা কোথাও যাবো না।" আম্মা ভারী সোফাটি শক্তভাবে ধরে বললেন।

কয়েকজন সার্ব সেনা তাকে জোরপূর্বক টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ছামারাও আম্মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এই টানা হেঁচড়ার কারণে আম্মার কাপড়গুলো ফেটে গেল। তিনি কয়েক জায়গায় চোটও পেলেন, সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। আমি সবকিছুই দেখছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন এসব নজরে আসা দৃশ্য মস্তিস্কের স্ক্রীন পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে না। একটা আবছা আবছা ভাব আমার মানসপটে ছেয়ে গিয়েছিল।

"এ বুড়ী এভাবে মানবে না।" একটা শয়তান নিজের ফৌজী বুটের মাথা দিয়ে পুরো শক্তি ব্যয় করে আম্মার তলপেটে লাথি মারল। আমি এ দৃশ্যটি জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না, আম্মা তীরের ন্যায় তিন ফুট দূরে গিয়ে পড়লেন এবং এরপর চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

"আম্মা, আম্মা! উঠুন, আম্মা! আমাকে এসব হায়েনাদের থেকে উদ্ধার করুন।" ছামারা ক্রন্দন করছে, আর আম্মার শরীরকে নাড়া দিচ্ছে।

দু'তিন জন সার্ব শয়তান চিলের মত এসে ওর উপর ছোবল মারল। ও আম্মাকে ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু এতগুলো হিংস্র দানবের সামনে ও কিইবা করতে পারে। চিৎকার করে করে ক্রন্দন করছে, বাবাকে ডাকছে, রায়হানকে আওয়াজ দিচ্ছে।

শোক থেকে শক্তি

হঠাৎ আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। আমি কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই ষ্টোর রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার মাথায় শুধু একটি কথাই ছিল, একটা অদম্য স্পৃহাই আমাকে কর্মে আহ্বান করছে, তা হল, আমি এসব নরপাষণ্ড হন্তাদেরকে জগত থেকে বিনাশ করে দিতে চাই, মিটিয়ে দিতে চাই।

এসব সার্ব পিশাচরা ছামারার অসহায়ত্বকে নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করছে। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এখানে তাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত কেউ নেই। আমি বাইরে বেরিয়েই অতি সন্তর্পণে একদিকে দাঁড়ানো একটি সার্বসেনার মাথার উপর পিতলের ফুলদানী দিয়ে জোরে আঘাত করলাম। এই আচানক হামলার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল এবং সেও ঢলে ধরাশায়ী হল। আমি তড়িৎগতিতে তার রাইফেলটি উঠিয়ে নিলাম। কলেজে একাধারে তিন বছরের নেয়া সামরিক ট্রেনিং আজ কাজে আসছে। আমি এসব নরাধমদের উপর বিরামহীনভাবে গুলি বর্ষণ করলাম গুরুম.... গুরুম..... গুরুম.... শব্দে। স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি ধ্বংসের তাণ্ডব চালাচ্ছে। প্রথম আক্রমণেই চারজন পাষণ্ডকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিতে সক্ষম হলাম। কিন্তু এরপর তারাও যেন জ্ঞান ফিরে পেল। আমাদের ঘরখানা ফায়ারিংয়ের প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। হঠাৎ আমার মনে হল যেন আমার শরীরের ভিতর কয়েকটা আগুন ঢুকে পড়েছে যেগুলো আমার ভিতরটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমার অস্তিত্বটাকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। জানি না কখন আমার হাত থেকে রাইফেলটি ছিটকে পড়ল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। কি যে ঘটে গেল আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। বিস্মৃত হয়ে গেল সব ঘটনাবলী। তবে শেষ যে দৃশ্যটি আমার স্মৃতির পাতায় সংরক্ষিত হয়েছিল, তা আশেপাশে ছড়ানো ছিটানো রক্ত ও ছামারার অশ্রুভরা নিষ্পাপ চেহারা।

আমার পুনর্বার হুঁশ এলো একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে। সেখানে তাহের চাচা তার দু'জন সঙ্গী সহ উপস্থিত। তাহের চাচা বাবার পুরাতন বন্ধু ও আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। তাঁকে দেখে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে

উঠলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নড়াচড়া করতে, এমনকি কথা বলতে পর্যন্ত নিষেধ করলেন। এমনিতেও কষ্ট এত প্রচণ্ড ছিল যে, আমার পক্ষে নড়াচড়া করা সম্ভবও ছিল না। এরপর অনেকক্ষণ এমন চলতে থাকে যে, একবার জ্ঞান ফিরে আসে,আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ইতোমধ্যে তাহের চাচা ও তার সঙ্গীরা আমার শরীরে বিদ্ধ গুলিগুলো বের করে ফেলেছেন। আমাকে ঔষধ ইত্যাদি দেয়া হলো। তাদের কাছে অজ্ঞান করার কোন ঔষধ ছিল না, এ কারণে অস্ত্রোপাচারের অস্ত্রটি আগুনে গরম করে গুলি বের করা হয়। সেদিন আমার প্রথম বার অভিজ্ঞতা হয় যে, ব্যথার প্রচণ্ডতা কখনো কখনো সমগ্র জগৎকে গ্রাস করে ফেলে এবং কষ্টটা জীবনের চেয়ে বড় ও দীর্ঘ অনুভূত হয়। পরে আমি জানতে পেলাম যে, আমার কাঁধে,বাহু ও পায়ে চারটি গুলি বিদ্ধ হয়েছিল। তবে এছাড়াও অনেক জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। শরীরের যখমগুলো তো সেরে গিয়েছিলো কিংবা সেরে ওঠার কাছাকাছি, কিন্তু আত্মার উপর যে ঘা লেগেছে তা কখনো সারার মত নয়।

তাহের চাচাই আমাকে বলেছিলেন, আমার বাবাকে মাদরাসার ভিতরেই নির্দয়ভাবে জবাই করা হয়। তার হন্তারা মাদরাসার বৃহৎ লাইব্রেরীটিতেও আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই লাইব্রেরীটিতে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল। আলী সে সময় সেখানে ছিল না। তাহের চাচা যিনি স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের একটি বড় রেজিমেন্টের সিপাহসালার,তাকে কমাণ্ডার তাহেরও বলা হয়। তিনি সেখানে পৌছে সার্ব হামলাকারীদের মেরে তাড়িয়ে দেন। অবস্থা শোচনীয় দেখে, সেখান থেকে দ্রুত আমাদের গৃহের অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। বাড়ীতে একমাত্র আমাকেই পেলেন, তাও অজ্ঞান অবস্থায়।

জীবনটা বড় বিস্ময়কর

আম্মার সে সময় কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল না। তিনি আব্বার সাথে ওয়াদা পালন করার জন্য এ জগত থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আম্মা সবসময় বলতেন, "আমার ভূগোল অত্যন্ত দুর্বল।" তিনি এলাকা, বাড়ী স্মরণ রাখতে পারতেন না। কখনো একা কোথাও

যেতেন না। হয়তঃ এ কারণেই এ লম্বা সফরের জন্য রায়হানকেও সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলেন। জীবনটা কত বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য। আমরা যাদেরকে প্রাণের চেয়েও বেশী চাই, যাদের ছাড়া জীবনটা অর্থহীন তারাই থাকেন না। অনেক অনেক দূরে অন্য জগতে চলে যান। বাবা রইলেন না, আম্মাও চলে গেলেন। রায়হান, যার শাদী দেখার জন্যে আমরা কত উদগ্রীব ছিলাম, সেও চিরদিনের তরে হারিয়ে গেল। সফদর, আলী ও ছামারা কোথায় রয়েছে? কি অবস্থায় রয়েছে? কিছুই জানা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জীবিত। আপনজনের স্মৃতি মনে পড়লে আত্মসংবরণ করা খুবই মুশকিল হয়। আমি বুঝতাম, আমার এ অবস্থার কারণে তাহের চাচার স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমি কি করবো? আমার ভিতরে তো আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর আগুন যাই হোক না কেন, তার কাজ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া।

সমগ্র দেশটাই জ্বলছে

"তুমি কি কিছু খেয়েছো, নাকি চিন্তায় বিভোর হয়ে বসে রয়েছো?" তাহের চাচার কণ্ঠ শুনে আমি ভাবনা জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। কিন্তু পুনরায় সেসব ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, যা আমি দেখতে চাচ্ছি না।

"আমার ক্ষুধা নেই, চাচা!"

"ঠিক আছে, খেয়ো না, এভাবেই বসে থাকো..... আর একদিন নিরবে তুমিও খতম হয়ে যেও। আমি মুফতী ফারাসাত বেগোভিচের রক্ত হতে এতটা আত্মাভিমান কোন সময় আশা করছিলাম না।" তাহের চাচা অনেকটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন।

"আত্মাভিমান....? আপনি একি বলছেন চাচা! আমি অভিমানের কি করলাম....?" আমি তার কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লাম।

"এটা আত্মাভিমান নয় তো আর কি খাওলা! আমাদের দেশ জ্বলছে। হাজার হাজার যুবককে প্রতিদিন নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। সুসংহত ও সংঘবদ্ধ শত্রু সব ধরনের মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। আমাদের শিশু, আমাদের নারী, এমনকি আমাদের

জানাযা পর্যন্ত নিরাপদ নয়। মাতৃভূমি শোকে মুহ্যমান, আর তুমি.... তুমি এসব বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ব্যথার আগুনে জ্বলছো.... !"

"চাচা! আপনি কি আমার সাথে ঘটা এসব ব্যাপাগুলোকে তুচ্ছ মনে করছেন.... ?"

"আমি স্বীকার করছি, তোমার ব্যথা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু এখানে কোন্ মুসলমান দুঃখী নয়, কার বক্ষ ফেটে চুরমার হচ্ছে না, কার কলিজা রক্তাক্ত হয়নি! ফারুককে তো তুমি দেখেছো, তার একবছরের একমাত্র সন্তানটিকে সার্ব হায়েনারা তারই সামনে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছে। তার চোখের সামনে তার স্ত্রী ও বোনদেরকে ধর্ষণ করে নির্দয়ভাবে জবাই করেছে। কিন্তু সেই ফারুক কি শোকে ও দুঃখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে? না, সে দ্বীন ও ঈমানের, ইসলাম ও মানবতার এসব শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নাম নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খাওলা বেটী! মনে রেখো, আল্লাহর নামকে সমুন্নত রাখার জন্য যারা যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করে, তারা কিন্তু মুর্দা নয়, তারা শহীদ। তাদের নিয়ে গৌরববোধ করা উচিত। তাদের শোক পালন করা উচিত নয়। আমাকে দেখো, আমার তিনটি কন্যা ছিল, তাদেরকে সার্বরা ধরে নিয়ে গেছে। আমি জানি না, আমার বেটীরা কোথায়? কিন্তু আমি জেনেই বা কি করতে পারতাম। আল্লাহ আছেন এবং তিনিই সবার মালিক। তিনি সবকিছুই দেখছেন। তার চেয়ে উত্তম ইনসাফকারী আর কে হতে পারে? আমি ষাট বছরের বৃদ্ধ কিন্তু খাওলা! আমি তোমার সামনে কসম খেয়ে বলতে পারি, যদি আমার আরো দু'টি ছেলে থাকতো, তাহলে আমি তাদেরকেও নিজের মাতৃভূমি ও মুসলমানদের রক্ষার খাতিরে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতাম।"

হৃদয় মাঝে জেহাদী আগুন

তিনি উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন। তার চেহারা জযবায় লালবর্ণ ধারণ করছে। তার বৃদ্ধ চোখ দু'টো ঈমানের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। তার এক একটি শব্দ আমার অস্তিত্বের মাঝে একটা নতুন আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিল। আমাকে একটা নতুন পথের সন্ধান দিল। বাবার সেই কণ্ঠটা যেন আমার ভাবনার কানে বেজে উঠল ঃ "কিছু পেতে চাইলে, কিছু

বিসর্জনও দিতে হয়। আর স্বাধীন দেশের নেয়ামত তো কোরবানী ছাড়া হাসিল হওয়া সম্ভবই নয়।"

আলীর জেহাদী কবিতাগুলো, ওর ঈমান জাগানো কথাগুলো যেন আমার ব্যক্তিত্বের মাঝে বিকশিত হচ্ছে। আমি এখন নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হচ্ছি। সত্যিই তো! আমি এ যাবত নিজের বা দেশের জন্য কিইবা করতে পেরেছি? কিছুই তো নয়, এ পর্যন্ত তো আমি নিজের ব্যক্তিস্বার্থ নিয়েই বিভোর ছিলাম।

এটা তো সত্য যে, আমার হৃদয়টা তাদের জন্য স্পন্দিত হত যারা আমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। কিন্তু, আমার অস্তিত্বের উপর আমার দেশ ও জাতির ঋণও তো আছে। বাবা নিজের রক্ত দিয়ে যে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন, তার দীপ্তিকে আরো সমুন্নত রাখা এখন আমার মৌলিক দায়িত্বে পরিণত হয়েছে, নতুবা শহীদী রক্তের সাথে হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আমি বিছানা হতে উঠে দাঁড়ালাম। আমার ডান হাঁটুতে এখনো সামান্য ব্যথা আছে। পেটের নিচের অংশে বুলেটে ঘেঁষা যখমটা এখনো অনেকটা তাজা। কিন্তু প্রত্যয়ই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। যদি প্রত্যয়ের মাঝে দৃঢ়তা থাকে তাহলে পাথরের পাহাড় থেকেও দুধের নহর প্রবাহিত করা অসম্ভব ব্যাপার থাকে না। আর এখন তো আমার ভিতর আমার মাতৃভূমির ও আমার দ্বীনের মহব্বত টগবগ করছে। আমার যখমের জন্য যেন মহৌষধ পেয়ে গেলাম। তাহের চাচা নিজের কথা সমাপ্ত করে বের হয়ে গেলেন। আমিও কম্বলখানা ভালমত জড়িয়ে তার পিছনে পিছনে চললাম। আমার পদধ্বনি শুনে তাহের চাচা থমকে দাঁড়ালেন।

"ওখান থেকে কেন বের হয়ে এলে,এখনো তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে খাওলা বেটী!.... আমাকে কেন পেরেশান করছো?"

"আমি আপনাকে পেরেশান করতে চাচ্ছি না কমাণ্ডার সাহেব!"

"কমাণ্ডার সাহেব.....? খাওলা! তুমি তো আজ আমাকে হতবাক করে দিলে। তুমি আমাকে চাচা না বলে কমাণ্ডার বলে কেন সম্বোধন করলে বেটী?" কমাণ্ডার তাহের চাচা বিস্ময়ভরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"জ্বি .... এজন্য যে, এখন আমার ও আপনার প্রথম সম্পর্ক হচ্ছে কমাণ্ডার ও মুজাহিদের সম্পর্ক.....। আপনি ঠিকই বলেছেন, দুঃখ, বেদনা আমার চতুর্পাশকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারছিলাম না। শোক আমাকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল। এজন্য আমি আপনার কাছে খুবই লজ্জিত। বাবা, মা, আলী, রায়হান, সফদর ও ছামারা সবার কাছেই লজ্জিত। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন? আমি আপনার মিশনে শরীক হতে চাই, আপনার জিহাদী তৎপরতায় সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মানসে অংশ গ্রহণ করতে চাই। এসব জালেম, নরাধম, অসভ্য খৃষ্টান জবরদখলকারীদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, এ যুদ্ধ যতই দীর্ঘ হোক না কেন, আমরা ক্লান্ত হবো না ইনশাআল্লাহ, বিজয়ী হয়েই তবে দম নেব।"

"খাওলা.... আমার বেটী!" কমাণ্ডার তাহের বেগোভিচ্ আমার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে বললেন ঃ "যে জাতির মাঝে তোমার মত মেয়েরা থাকবে, তারা কখনো পরাস্ত হতে পারে না। ইনশাআল্লাহ,বিজয় আমাদের হবেই।"

নতুন জীবনের সূচনা

সেদিন থেকেই আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। তাহের চাচা আমাকে রীতিমত তার মুজাহিদ রেজিমেন্টে ভর্তি করে নিলেন। আমাদের কয়েকজন দিয়ে একটা ক্ষুদ্র বাহিনী গঠন করলেন। আমাদের মৌলিক কাজ শত্রুদের সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। তবে প্রয়োজন হলে আমাদেরকে সবধরনের কাজ করতে হতো। যুদ্ধও করতে হতো। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতা। আমাদের অস্ত্র ভাণ্ডারের একটা বড় অংশ হচ্ছে সার্বফৌজদের থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্র।

বিস্ময়কর ব্যাপার, সার্বরা কম্যুনিষ্ট হওয়ার কারণে রাশিয়ার পুরোপুরি মদদ পাচ্ছে। পক্ষান্তরে আমাদের হিস্সায় শুধু বিবৃতি, শ্লোগান ও ঘোষণা আসছে। সার্বরা অবিরাম অস্ত্রের চালান পাচ্ছে। অথচ এখন

আমাদের মুসলিম দেশগুলো আমাদের জন্য ঔষধ ও খাদ্যবহনকারী জাহাজগুলোকে সমুদ্র সীমানা অতিক্রম করার অনুমতি দিচ্ছে না। ইসলামী উম্মাহ্র মুবাল্লিগরা নির্লিপ্ত, নির্বিকার। তাদের কোন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। কুয়েতে মানবাধিকার রক্ষার নামে তড়িৎ বাহিনী প্রেরণকারী বাহাদুর (?) আমেরিকা বসনিয়াতে মুসলমানদের রক্তের নদী প্রবাহিত হতে দেখে নিরব দর্শকের কোন কোন ক্ষেত্রে গোপনে সার্বদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। সে আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা এখন আর মানবাধিকারের কথা বলে না। কারণ, এখানে তো তারই খৃষ্টান ভাইয়েরা মুসলমানদেরকে জবাই করছে। আর কুয়েতে ছিল তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। আর এখানে তো সার্বদেরকে কিছু বলার অর্থ হচ্ছে, নিজেদেরই স্বার্থের পরিপন্থী কিছু বলা। তবে বাহাদুর (?) আমেরিকা ও তার নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ যতটুকু ভূমিকা পালন করছে, তা হল—তারা সার্বদেরকে মাঝে মধ্যে একটা সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছে, সার্বরা যেন অমুক তারিখের মধ্যেই গণহত্যা বন্ধ করে দেয়। এটা তো আসলে গোপনে সার্বদেরকে পয়গাম দেওয়া যে, তোমরা এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের যত রক্তপাত ঘটাতে চাও তা স্বাধীনভাবে করতে পারো। তাদের রক্ত দিয়ে হোলী খেলতে চাও, খেলতে পারো, তার পূর্ণ অনুমতি তোমাদের রয়েছে।

নির্বিকার মুসলমান

যা হোক, অন্যদের ব্যাপারে আর কিই বা অভিযোগ করবো! আফসোসের কথা হচ্ছে, ইউরোপে আল্লাহর নামে প্রতিষ্ঠিত এ দেশটিতে রক্তের বন্যা বয়ে যেতে দেখেও মুসলমানরা নিশ্চুপ নির্বিকার। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালন করছে না। তারা হৃদয়ঙ্গম করছে না যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ এক দেহের ন্যায়। বিশ্বের যে কোন জায়গায় একজন মুসলমানও যদি মুসীবতে পতিত হয় তাহলে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানকে তার ব্যথায় ব্যথিত হওয়া দরকার। তার প্রতিকারের জন্য সবাইকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। তারা হয়তঃ ভাবছে, এই আগুন ইউরোপের এই সুন্দর উপত্যকাটি পর্যন্তই সীমিত থাকবে। এটা তাদের খামখেয়ালী বৈ কিছুই নয়। বসনিয়ার এই আগুনের

লেলিহান শিখা তাদের গৃহ পর্যন্তও পৌছতে পারে। সুযোগ বুঝে তাদেরকেও তাদের কাফের শত্রুরা আক্রমণ করে বসবে। যেমন যুগে যুগে হয়েছে, হচ্ছে। বসনিয়ার দুর্ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটা চপেটাঘাত, তারা এ থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

খুবসুরত শহরে ধ্বংসের তাণ্ডব

কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের খুবসুরত শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। লাখ লাখ লোককে এখান থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হল। হাজার হাজার নিরীহ মুসলমান সার্বদের নির্যাতন শিবিরগুলোতে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। চারদিকে এত বর্বরতা ও নৃশংসতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যে, নিজের অবস্থা ও নিজের দুঃখের দিকে তাকানের সুযোগই হচ্ছে না। আমরা প্রতিদিনই যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করতাম।

একসময় যে খাওলা সামান্য একটু রক্ত দেখলে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়তো, আজ সেই খাওলা সময়ের আবর্তনে সার্ব পাষণ্ডদের রক্ত পান করার জন্য মেতে উঠেছে। বিশেষ করে সার্বসেনাদেরকে দেখলে তো আমার অস্তিত্বের মাঝে একটা আজব হিংস্রতা জেগে উঠে। পুরুষ মুজাহিদ সাথীরা পর্যন্ত অনেক হামলায় আমার থেকে অনেক পিছিয়ে থাকে। মাত্র এ কয়েকটি মাসে আমরা ৭০ (সত্তর)টি স্থানে সার্বদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হই। আমাদের রেজিমেন্টটি সার্বদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী হাতিয়ার ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। পিস্তল, গ্রেনেড, বন্দুক, রাইফেল, হালকা মেশিনগান, ক্লাসিনকোভ, ফেরী ইত্যাদি, এখন এগুলো চালানো আমার বাম হাতের খেলা। এসব দিনগুলোতে আমি মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে যেতেও দেখেছি। আমরাও কাফের হায়েনাদের রক্তের নদী প্রবাহিত করেছি। তবে এমন একটি ঘটনা স্বচক্ষে দেখলাম, যা ভুলতে চাইলেও ভোলা সম্ভব নয়।

নির্মম বর্বরতা

সেদিন সারায়েভোর উত্তরাঞ্চলের একটি মুসলমান মহল্লা মাইন ও গ্রেনেডের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হলো। সার্বসেনাদের

নির্যাতনের এটাও একটা অন্যতম কৌশল। তারা মুসলমান মহল্লার কাছ দিয়ে যেতে যেতে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যস্ত এমন কোন মুসলমানদের ঘরে আচানকভাবে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারতো, কিংবা মাইন পুঁতে রেখে তা বিস্ফোরণ ঘটাতো। এগুলো সার্বদের কাছে মামুলী ব্যাপার। অহরহ তারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। ঐ মহল্লার অধিকাংশ লোক সেই দুর্ঘটনায় মারা যায়, তবে যারা বেঁচে যায় তাদেরকে আমাদের মুজাহিদ উদ্ধারকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। উদ্ধারকর্মীদের মাঝে আমিও শরীক ছিলাম।

এক জায়গায় একটি চার বছরের শিশুকে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করে চিৎকার করতে দেখলাম। আমি তড়িৎ গতিতে আহত শিশুটিকে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। ফেরেশতার মত চেহারা এই ছোট্ট শিশুটির কোমরে গ্রেনেডের টুকরা এমনভাবে বিঁধেছে যে, অপারেশন ছাড়া তা থেকে নাজাত পাওয়ার কোন উপায় নেই। যে অঞ্চলে ক্ষুধা দিবা-রাত্রির মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে জীবন ধারণের একটা সাধারণ উপকরণও পাওয়া মুশকিল, যেখানে পান করার পানি পর্যন্ত খুব কষ্টে পাওয়া যায়, সেখানে ঔষধের আকাল পড়াটা একটা মামুলী ব্যাপার। হাসপাতালে, বরং পুরো সারায়েভোর কোথাও অজ্ঞান করার ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই শিশুটিকে জ্ঞান থাকা অবস্থায়ই অপারেশন করা হল। কারণ, ওর জান বাঁচাতে হলে এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। সে শিশুটির ছবি বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছবি তো শুধু খানিকের ঘটনা বুঝায়। কিন্তু সেই শিশুটির কথা যা আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম, ওর চোখের ব্যাকুলতা, ওর ক্রন্দন, চিৎকার, ওর অস্থিরতা, যে কেউ দেখবে সে না কেঁদে স্থির থাকতে পারবে না।

মানবতার কলংক

মন যতই পাষাণ হোক, তার উপরও যখন দুঃখ-বেদনার বারি বিন্দু বিন্দু করে ধারাবাহিকভাবে পড়তে থাকে তখন তা গলে যায়। কিন্তু বসনিয়াতে আমাদের প্রতিপক্ষ মানুষ ছিল না। স্লোভোদান মেলেসোভিচ

(সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট) ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা সাক্ষাৎ শয়তান। মানবতার কলংক। তাদের লক্ষ্যই মানবতার ধ্বংস সাধন। তারা মুলসমান ও ইসলামকে ইউরোপের মাটি থেকে চিরদিনের জন্য মুছে দিতে চায়।

আমাদের দিন-রাত শত শত লোমহর্ষক, হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলীর মধ্যদিয়ে কেটে যাচ্ছে। যখনই কিছুটা অবসর পেতাম, তখনই চোখের সামনে ছামারার অশ্রুভরা চেহারা ভেসে উঠতো। আমি জানতাম, আমার বোন বসনিয়ার সে সব হাজার হাজার নীরব মুজাহিদ বেটীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে, যাদের জীবন এবং জীবনের সবচেয়ে দামী বস্তু সতীত্ব ইসলাম ও মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গিত হয়ে গেছে। আলী ও সফদরের কথা মনে পড়লেও আমার হৃদয় স্পন্দিত হত। কিন্তু ছামারার কথা যখন মনে পড়তো তখন মনে হত যেন আমার রক্তগুলো আমার শিরায় শিরায় তড়িৎ গতিতে দৌড়াচ্ছে।

রাতের অপারেশন

ইতোমধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন আমাদের হাতে সোপর্দ করা হল। আমাদেরকে সারায়েভো শহর থেকে খানিক বাইরে সার্বসেনাদের একটি বন্দীখানা থেকে মুসলমান যুবকদেরকে মুক্ত করার দায়িত্ব দেয়া হল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেখানে আমাদের কয়েকজন মুজাহিদ যুবক সহ আনুমানিক ছ'শ মুসলমান বন্দী আছে। আমি যদি আপনাকে বলি, এই ছ'শ লোককে মাত্র দু'শ ফুট চওড়া ও তিনশ' ফুট লম্বা জায়গায় কয়েদ করে রাখা হয়েছে তাহলে হয়তঃ আপনি বিশ্বাস করবেন না। তাদের হাত-পা বেঁধে মালপত্রের বস্তার মত গাদাগাদি করে ভরে রাখা হয়েছিল। এমনকি পায়খানা পেশাবেরও আলাদা কোন জায়গা ছিল না, ওখানেই এই প্রয়োজন মেটাতে হতো।

আমরা জানতে পেলাম, পরদিন তাদের সবাইকে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। সার্বদের অভিধানে স্থানান্তরের অর্থ হচ্ছে জবাই করা। এজন্যই হাই কমাণ্ডের পক্ষ থেকে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল যেন আমরা তাদেরকে মুক্ত করার জন্যে সবধরনের প্রচেষ্টা চালাই। আমাদের অপারেশন গ্রুপটি মোট সাতজন মুজাহিদ নিয়ে গঠিত।

আমাদের কাছে সীমিত কিছু গ্রেনেড ও ক্লাসিনকোভ। রাতের আঁধার ছড়িয়ে পড়ার পর আমাদেরকে সেই বন্দী ক্যাম্প থেকে কিছু দূরত্বে সামরিক গাড়ী দিয়ে পৌঁছে দেয়া হল।

বাকী পথটুকু আমাদেরকে হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আমাদের গন্তব্যস্থানটি পাহাড়ের মধ্যখানে অবস্থিত। এ ধরনের পার্বত্যাঞ্চলে হামাগুড়ি দিয়ে চলাটা সহজ কাজ নয়। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি সুস্পষ্ট হয়, সত্য হয়, প্রত্যয় যদি দৃঢ় হয়, ঈমান যদি পরিপক্ক হয়, তাহলে আগুনও ফুলবাগিচায় রূপান্তিরিত হয়। আমি আপনাদেরকে মিথ্যা বলছি না। এটা শুধুমাত্র মৌখিক বচন মাত্রও নয় যে, মুসলমান ভাইদেরকে উদ্ধার করতে হবে ভেবে আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। অনেক দূর পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম কালে ধারালো পাথর–কংকর ও কাটাগুল্মে আঁচড় লেগে সমস্ত শরীর ক্ষত–বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও আমার মাঝে সামান্যতম কষ্ট অনুভূত হচ্ছে না। অথচ অনেক জায়গা থেকে রক্তও গড়িয়ে পড়ছে।

তথ্য অনুযায়ী সে রাতে ক্যাম্পে ত্রিশজন সার্বসেনা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেরকে ইমারতে ঢুকতে তেমন বেগ পেতে হল না। ক্যাম্পের সীমানার চতুর্দিকে মাত্র ছয়জন সার্ব সেনা পাহারা দিচ্ছে। হয়তঃ তারা এ জায়গাটি নিরাপদ বলে দৃঢ় বিশ্বাস করেছিল। কয়েদীদের পক্ষ থেকে তো তাদের কোনই আশংকা ছিল না। দু'দিন ধরে ক্ষুধার্ত কয়েদীরা পালাবেই বা কীভাবে। উপরন্তু, কয়েদীদের অধিকাংশই হচ্ছে বেসামরিক লোক। তাদের মাঝে বারো তেরো বছরের অনেক বালকও রয়েছে।

আমরা ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করলাম। আমি যে দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম সেখানে পাহারারত সৈন্যটিকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। আমি তার উপর গুলি খরচ করাটা অনর্থক মনে করলাম। রাইফেলের বাট দিয়ে চারটি জোরদার আঘাত হানলাম। এতেই রফা দফা হয়ে গেল। পুরো ছয়জন পাহারাদার সৈন্যকে কাবু করে আমরা ইমরাতের ভিতর ঢুকে পড়লাম। ইমারতটিতে বড় বড় কয়েকটি রুম রয়েছে। ভিতরে আরো চারজন সৈনিক ছিল। তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছাতে আমাদের কয়েক মিনিট ব্যয় হল। অতঃপর

বন্দীদেরকে যে রুমে রাখা হয়েছিল, সেখানে আমরা উপস্থিত হলাম। গুদাম ঘরের মত একটা লম্বা রুমে অসংখ্য কয়েদী বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে কয়েকজন মুসলমানকে জবাই করে রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য কয়েদীদেরকে ভীত–সন্ত্রস্ত করা। সীমিত জায়গায় এতগুলো মানুষের শ্বাস–প্রশ্বাসের কারণে পরিবেশটা ভারী ভারী লাগছিল। মৃতদেহ ও অন্যান্য ময়লা আবর্জনা থেকে যে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল তাতেও শ্বাস নেয়াটা খুবই মুশকিল মনে হচ্ছিল। বন্দীদের অবস্থা বর্ণনাতীত। আমাদের আগমনটা তাদের পক্ষে নতুন জীবনের পয়গাম বয়ে আনলো। এখানের বন্দীদের মধ্যে আমাদের রেজিমেন্টের বেশ কয়েকজন মুজাহিদও ছিল। তাদের একজনের নাম খালেদ। সে আমাদেরকে দেখেই কাছে আসার জন্য ইশারা করল।

সার্বদের জাহান্নাম

"খাওলা! আল্লাহ পাকের অশেষ ধন্যবাদ। তোমরা সময় মতই এখানে পৌঁছে গেছো। তোমরা কতজন সার্ব সেনার মুখোমুখী হয়েছো?" রশির বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার পরপরই সে অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ছয়জন বাইরে আর চারজন ভিতরে.... কিন্তু আমাদের তথ্য অনুযায়ী তো এখানে অন্ততপক্ষে ত্রিশজন সার্ব শয়তান থাকা উচিত ছিল।" আমি প্রত্যুত্তরে বললাম।

"হাঁ, তোমাদের তথ্য ঠিকই এবং তারা আছেও, তোমরা খুবই সতর্ক হয়ে যাও।"

"কোথায় তারা....?" শিকারের উপস্থিতির কথা শুনতে পেয়ে আমার হিংস্র প্রকৃতিটি আচানক জেগে উঠলো।

"এই হলের নিচে, বরং এই পুরো ইমারতটির নিচে রয়েছে একটি ভূগর্ভস্থ বড় রুম, যেখানে সার্বরা বিলাসিতা ও কামভোগ করে। সার্বদের ভাষায় তারা এ রুমটিকে 'বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে থাকে' খালেদ বিষাক্ত কণ্ঠে বলল।

"বিশেষ কাজ সম্পাদন" আবার কি জিনিস? তোমার কথা তো আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

"হাঁ, সার্বদের ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সংকল্প যে, যমীনে প্রতিটি শিশু সার্ব হয়েই জন্মগ্রহণ করবে। এজন্য তারা আমাদের মুসলমান মা, বোন, স্ত্রী ও বেটীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। তাদের সতীত্ব, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করে। সবই তাদের কাছে বৈধ।" খালেদের কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। সে আরো বলল—

"এই ইমারতটির মধ্যে ছয়শ' জন বন্দী আছে কিন্তু তার অন্ধকার ও কালো অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে ষাটজন নিষ্পাপ, নির্যাতিতা, মযলুম মুসলমান যুবতী। তারা জীবন্ত লাশে পরিণত হয়ে গেছে। খাওলা! আমাদেরকে জানের বাজি লাগিয়ে হলেও এসব মযলুম মেয়েদেরকে সার্বদের এই জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতেই হবে।"

খালেদের কথা শুনে আমার মস্তিষ্ক জিহাদী জযবায় টগ্‌বগ্‌ করে উঠলো। আমি ভালো করেই বুঝলাম যে, সার্ব হায়েনারা মুসলমান বিদুষী নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। আজ আমি ঠিক এমন এক ধরনের জায়গায় উপস্থিত হয়েছি যেখানে আমার বোন, আমার ছামারার মত হাজার হাজার অসহায় মুসলমান মেয়েকে আটক করে রাখা হয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে তাদের মান-ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। আমার মন ও মস্তিস্কে যেন আগুন ধরে গেল। আমার বোনও তো যুলুমের এই বাজারে হারিয়ে গেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ আল্লাহ্ চাহে তো এখানের একজন সার্ব শয়তানও রক্ষা পাবে না।

আমরা অবশিষ্ট অপারেশনটি খুবই তড়িৎগতিতে, অতি সন্তর্পণে সম্পূর্ণ করতে মনস্থ করলাম। দু'জন মুজাহিদ কয়েদীদেরকে নিজেদের সাথে বাইরে নিয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত আটজন মুজাহিদ, যারা বন্দী অবস্থা থেকে রেহাই পেয়েছে, আর আমরা চারজন অর্থাৎ মোট বারোজন সাথী ভূগর্ভস্থ রুমে যাওয়ার পথ খুঁজতে লাগলাম। খালেদ্ সহ আরো কয়েকজন এখানকার ভূগর্ভস্থ কক্ষের কথা জানতে পেরেছিল। তা এভাবে যে, সার্ব সেনারা খুবই গর্বভরে নিজেরাই এ ব্যাপারে তাদেরকে বলেছে। এমনিতেই তো রাতের নিরব প্রহরে মুসলমান মেয়ের আর্তচিৎকার ধ্বনি দেয়ালকে বিদীর্ণ করে তাদের উপস্থিতির কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। খালেদের ধারণা অনুযায়ী রাতের পাহারায় নিয়োজিত সৈন্যরা

প্রতি আধা ঘন্টা পরপর একটা বিশেষ ঘন্টা বাজাতো। এতে ভূগর্ভে উপস্থিত সৈন্যরা বুঝে নিতো যে, 'সব ঠিক-ঠাক' আছে। পাহারারত সার্ব সৈন্যদের ডিউটি চার ঘন্টা পরপর পরিবর্তন হতো। খালেদও তার সঙ্গীরা কোন্ পথ দিয়ে ভূগর্ভে ঢুকতে হয় তা কিছুই জানতো না। সে জন্যই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা ইমারতটির চতুর্দিকে ছড়িয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পাহারার জন্য বের হওয়া সেনাদের অপেক্ষা করবো।

আমাদেরকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হয়তঃ ঘন্টার আওয়াজ না পৌঁছার কারণে তারা সতর্ক হয়ে পড়েছিল। আমি যে কামরায় খালিদ ও তালহার সাথে লুকিয়েছিলাম, ভূগর্ভস্থ কক্ষের পথটি সেই কামরায় বানানো একটি আলমারীর ভিতর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। সেই আলমারী দেখে আদৌ কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে, এই পুরাতন দরজাটির পিছনে জুলুম ও পাশবিক নির্যাতনের একটা মারাত্মক গরম বাজার রয়েছে।

আলমারীর ভিতর দিয়ে পাঁচজন সৈন্য বের হল।

"বুঝে আসছে না ইয়ার! এই মাস্লোভিক কোথায় মরে গেছে, ঘন্টা বাজানোর পালা তো ওর।" একজন সৈনিক মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল।

"হাঁ, হয়তঃ কোথাও শুয়ে পড়েছে, ওর ঘুমতো বেশী। কিন্তু মার্কস, টোনী ও শীতা নিরব কেন? সত্যিই ওদের নিরবতা আমাকে বিচলিত করে তুলছে। ওদের নজর তো সব সময় ঘড়ির উপর লেগে থাকে।" অন্য একজন চিন্তিত হয়ে বলল।

"চলো, প্রথমে একনজর এসব অপদার্থ কয়েদীদেরকে দেখে নেই।" তারা দরজার কাছে এসে বলল।

কিন্তু তাদের সেই আশা মনের মাঝেই রয়ে গেল, পূর্ণ করার সুযোগ পেলো না। আমরা তিনজন একই সাথে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ফায়ার করাটা বিপদজনক। কারণ, এর ফলে তাদের অন্যান্য সাথীরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এজন্যই আমাদের চেষ্টা ছিল, কীভাবে কোন প্রকার গুলি চালানো ছাড়াই তাদেরকে খতম করে দেয়া যায়। প্রথমতঃ তাদের উপর আক্রমণটা ছিল অকস্মাৎ, দ্বিতীয়তঃ আমরা তিনজনই

প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ছিলাম ব্যাকুল। ক্রোধে ক্রোধে আমাদের মাথায় খুন টগবগ করছিল। আমরা তাদেরকে খতম করে দেয়ার জন্য মেতে উঠেছিলাম, হয়তঃ এসব কারণেই ওরা সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারল না। আমি ওদের মধ্য হতে দু'জনকে স্বীয় রাইফেলের বাট মেরে খতম করে দিলাম। একটা আজব ধরনের উন্মাদনায় আমি মেতে উঠেছিলাম। খালেদ যদি সময় মত আমাকে না থামাতো, তাহলে হয়তঃ ওদের শরীরকে আমি কীমা বানিয়ে ফেলতাম। সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও এসব নরাধমকে খতম করার সময় আঘাতের শব্দ আমাদের অন্যান্য কৌতূহলী সাথীদেরকে এখানে একত্রিত করে দিল।

অবশেষে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করার পথটি পেয়েই গেলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার বাকী ছিল যে, অবশিষ্ট শয়তানদেরকে সেখানেই গিয়ে পাকড়াও করা হবে? না, এখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করা হবে! যদিও আশঙ্কা ছিল যে, ভিতরে অকস্মাৎ ফায়ারিং, কিংবা অন্য কোন পন্থায় লড়াই করলে হয়তঃ বন্দীদেরও প্রাণ যেতে পারে। কিন্তু তবুও আমরা শত্রুদেরকে সতর্ক হয়ে পড়ার সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ, এতে আমাদের বেশী ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিলো। দ্বিতীয়তঃ এ ভয়টিও ছিলো যে, বিলম্ব করলে হয়তঃ শত্রুদের নতুন ব্যাটালিয়ন এখানে পৌঁছে যেতে পারে। এসব কারণেই আমরা ভিতরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আলমারীর দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পর আমরা আনুমানিক বারোটা সিঁড়ি নিচে নেমে এলাম। এরপর সিঁড়িগুলো একদিকে মোড় নিয়েছে। যখন সার্ব পিশাচদের অট্টহাসি ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পেলাম, তখন আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হল, মনযিল অতি নিকটে। ভিতরে মিউজিকের শব্দ ভেসে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে অসহায় নারীর ক্রন্দনের আওয়াজও আসছিল। সেখানে যেন মানবতা উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করছে। এ যেন পাশব শক্তির একচ্ছত্র রাজত্ব। শুধু আমি একাই নই, বরং আমাদের প্রতিটি সাথীর বক্ষ প্রতিশোধ স্পৃহায় দাউ দাউ করে জ্বলছিল। প্রত্যেকের চোখগুলো ছিলো রক্তপিপাসু।

"ওহ্, দেখো তো... সিঁড়ির উপর কে?" একটা স্বর ভেসে এলো।

তারপরেই হঠাৎ গুলির গুরুম.... গুরুম শব্দে, আতঙ্ক, ভয়-ভীতি ও আর্তচিৎকারে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। খানিকের মাঝে জীবন মৃত্যুর ফায়সালা হয়ে গেল। কিছুপূর্বে যাদের চেহারাগুলো ছিল বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় উজ্জ্বল, এখন সেসব পিশাচদের উলঙ্গ দেহ মাটি ও রক্তের মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এসব নরাধম প্যান্ট পরারও অবকাশ পায়নি।

মানুষ ও তার জীবনের মর্যাদা পানির বুদ বুদের চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষণিকের শক্তির দাপটে মানুষ নিজেকে কতই না বড় মনে করে। এই অহমিকা, এ প্রবঞ্চনার কারণেই আল্লাহ পাক তাদের অন্তঃকরণকে মোহরাংকিত করে দেন। পাথরের ন্যায় পাষাণ বানিয়ে দেন।

এই অপারেশনে আমাদের দু'জন সঙ্গী শাহাদাত বরণ করেন। কয়েকজন আহত হন। আমি নিজেও আহত ছিলাম। আমার কনুই থেকে সামান্য উপরে আগুনের মত জ্বলন্ত যখম থেকে লাল টকটকে খুন ঝরছিলো। কিন্তু আমার অন্তরটা যেন তার চেয়েও বেশী অগ্নিদাহে প্রজ্জ্বলিত।

আমার ছামারা

এমন অবস্থার মাঝেও আমি জাতির এক একটি কন্যার কাছে গিয়ে তাদের চেহারা দেখতে ও সান্ত্বনা দিতে ভুলিনি। প্রতিটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছিলাম। তাদের সকলেরই চোখ বেয়ে অশ্রু বের হচ্ছিল। কিন্তু আমি আমার মাঝে আশ্চর্য ধরনের চঞ্চলতা লক্ষ্য করলাম। আমি দু'আ করলাম, আহা! যদি আমার ছামারা এখানে থাকতো, কিন্তু পরক্ষণেই এ দু'আর বিপরীত আরেকটি দু'আ মন থেকে বেরিয়ে এলো। আল্লাহ করুক! আমার ছামারা এ জায়গায়, এমন ধরনের স্থানে না হোক।

এক এক করে ষাটটি মেয়েকে দেখলাম। ছামারাকেও তাদের মাঝে খুঁজছিলাম। আমার সৌভাগ্য বলুন, কিংবা দুর্ভাগ্য! আমার বোন এ

ষাটজন মুসলমান বোনদের মাঝে ছিল না। আমাদের মিশন সফল হল। এ অপারেশনের পর সার্ব সেনাদের মাঝে আমি 'খাওলা যমদূত, খাওলা রক্তপিপাসু' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলাম। বাস্তবেও আমি আমার জাতি ও ধর্মের শত্রু এসব সার্ব খৃষ্টান মৌলবাদীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলাম। বেশ কয়েকটি বিদেশী ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো। তারা আমার জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলো কিন্তু আমি তাদের সবাইকে একই জবাব দিলাম—"আমি বসনিয়ার একটি মেয়ে। নিজের দ্বীন ও মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাফন বেঁধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি..... আর এ পথে আমি একা নই।"

হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

একদিন সেই ঘটনাটি ঘটেই গেল যা আমাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিল। সারায়েভোর উত্তরাঞ্চলে আমাদেরকে মোতায়েন করা হয়েছিল। আমরা ইউনিটের ইমারজেন্সী রুমে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে খরব এলো, বড় সড়কের উপর একটি সার্ব ফৌজী ট্রাক বেশ কিছু মেয়েকে নিক্ষেপ করে চলে গেছে।

আমাদের কাছে এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলনা। সার্ব ফৌজদের অভ্যাস, তারা আসন্নপ্রসবা মুসলমান কন্যাদের নিক্ষেপ করে চলে যায়।

সংবাদ পেয়ে আমরা দ্রুত সেখানে পৌছে গেলাম। মেয়েরা তখনো অজ্ঞান। দূর থেকে তাদেরকে ফুটপাতে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমার বুকটা একেবারে ফেটে যাচ্ছিল। কত লজ্জার কথা! মুসলিম জাতির মেয়েদের এই করুণ পরিণতি! অথচ এই আকাশের নীচে বহু সম্পদশালী মুসলমান স্বর্ণের তশতরীতে খানা খাচ্ছে। বৃটেনের রানী বা লেডী ডায়নাকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য লাখ লাখ ডলারের অলংকারাদি ক্রয়ে তারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না। অথচ বসনিয়ার সার্ব হায়েনাদের বর্বর নির্যাতনের শিকার ভুখা নাঙ্গা মুসলমান ভাই ও বোনদের জন্য শুধু মৌখিক কথা, বিবৃতি ও বক্তৃতা ছাড়া তারা আর কিছুই করছে না।

হৃদয়ের এই রক্তক্ষরণ কি কখনো থামবে?

এসব মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদেরকে দেখে আমি কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস নিতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। যে দৃশ্যটি আমার ঘুমকে হারাম করে দিয়েছিল, যার থেকে মুখ লুকানোর জন্য আমি ঘুম পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলাম, সে দৃশ্য সূর্যের ন্যায় বাস্তব হয়ে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সড়কের উপর অসহায়ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা মেয়েদের মাঝে আমার প্রাণাধিক প্রিয় বোন ছামারাও বিদ্যমান।

আমি দৌড়ে ওকে নিজের কোলে উঠিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু আমার পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে। আমি কিছুই বলতে পারছি না। কীভাবে আমি ও আমার সঙ্গীরা ছামারাসহ এসব মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। আমার পা চলছিল, কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুনতে পাচ্ছিলাম না। হ্যাঁ, কল্পনার চোখ দিয়ে অনেকগুলো দৃশ্যের অস্পষ্ট ছবি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। ছামারা ছোট হওয়ার কারণে অনেকটা জেদী ছিল। ওর ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হওয়ার। বাবা সব সময় বলতেন, ওকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাবেন। কিন্তু ওর বর্তমান অবস্থা যেন আমার চোখের জ্যোতিই ছিনিয়ে নিলো।

অনেক রাতে ছামারার জ্ঞান ফিরল। আমাকে দেখে ও প্রথমে তো হতবাক হয়ে গেল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো যে, সেখানে দণ্ডায়মান সকলের চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

"আপা! আপনি কোথায় ছিলেন.... আমি তো ভাবছিলাম, আপনিও..... আপা! এসব কি ঘটে গেল। আমি জীবিত থাকতে চাই না, আপা! আমি জীবিত থাকতে চাই না। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তো, আপনি তো আমার বোন, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তো!!" ও কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল।

আমি ওকে কি জবাব দেব! আমার গোটা অস্তিত্ব একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওতো এই হিসেবে আমার চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবতী। ও অন্ততঃপক্ষে ক্রন্দন করতে পারছে। কিন্তু আমার চোখ তো একেবারেই শুকিয়ে গেছে। খানিক পরে ও কিছুটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে

পড়ল। আমি ওর চুলগুলো নিজের আঙ্গুল দিয়ে আঁচড়াচ্ছিলাম এবং গভীরভাবে ওকে দেখছিলাম।

আমার ছোট্ট মুন্নী বোনটি একেবারেই বদলে গেছে। অবস্থা ওকে ওর বয়সের চেয়ে বড় বানিয়ে দিয়েছো। ওর ভরা ভরা চেহারাটি শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। লাল ও সাদা রংটি শ্যামল বর্ণ ধারণ করেছে। ওকে খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ওর অবস্থা দেখে আমার অন্তরটা তো অবশ্যই কাঁদছিল কিন্তু আমার চোখ ছিল অশ্রুহীন নিষ্প্রাণ।

অশ্রু যদি অন্তরে আটকে যায়, তাহলে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়। আর এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল।

"আপা!"

"হাঁ, বলো।" আমি স্নেহভরে বললাম।

"আমি কি ঠিক হতে পারি?" ও চোখ দুটি বন্ধ করে বলল।

"হাঁ, আমার ছামু! তুমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে পাগলী!" আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম।

"আমি ওকে...." ও থেমে থেমে বলছিল "ওকে জন্ম দিতে চাই না।"

"কিন্তু ছামু..... এখন এটা সম্ভব নয়, এতে তোমার প্রাণ চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কোন ডাক্তারই এটার অনুমতি দেবে না, মাত্র দু'তিন মাসের ব্যাপার, তারপর তো সব ঠিক হয়ে যাবে।" আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম।

"না....।" ও দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "আমি ওকে মোটেও জন্ম দিতে চাই না....., আপা! অন্য কোন পথ নেই?"

"না ছামারা.... অনেক দেরী হয়ে গেছে।" আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, পরে ও একদম চুপ হয়ে গেল।

হায়.... যদি আমি বুঝতে পারতাম, ও এসব কেন জিজ্ঞেস করছে, তাহলে কতই না ভাল হত, যদি সে মুহূর্তে ওর মনোভাবটা বুঝতে সক্ষম হতাম....! কিন্তু মানুষ যা চায়, অনেক সময়ই তা পায় না, এটাই হচ্ছে তাকদীরের অমোঘ নিয়ম।

আমি ছামারাকে ঘুম পাড়িয়ে ইউনিটে চলে এলাম। আমি

হাসপাতাল থেকে এসেছি মাত্র কয়েক ঘন্টাই হবে। ইতিমধ্যে হঠাৎ কমাণ্ডার তাহের বেগোভিচ্ আমার কাছে গিয়ে উপস্থিত। আমি তার চেহারা দেখে বিচলিত হয়ে পড়লাম। তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেক দিন পর তার সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ হল। তাকে আমি সালাম করলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ

"খাওলা, ... আমার সাথে চলো।"

"কোথায়.... ?" আমার ঠোঁটটি কাঁপছিল।

"কি ব্যাপার তাহের চাচা! প্লীজ আমাকে খুলে বলুন। কি ব্যাপার?"

আমার কথা শুনে তিনি আমাকে গভীরভাবে দেখলেন।

"হাঁ, চাচা, আমি সব কথাই শুনতে পারবো। এখন আমার দিলটা এত দুর্বল ও ছোট নেই। ....বলুন, কি ব্যাপার?"

"আমি তোমাকে নিয়ে সত্যিই গর্বিত বেটী।"

তিনি অবশেষে আমাকে বললেন, "তোমাকে নিয়ে গর্বিত কেন হবো না, তুমি তো একজন মুজাহিদা, ইসলাম ও মুসলমান জাতিকে বলকানের মাটিতে রক্ষা করার জন্যে তুমি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছো।

খাওলা বেটী! আল্লাহ তা'আলা নিজের একটি আমানত আমাদের থেকে ফেরত নিয়ে নিয়েছেন, বেটী ছামারা এখন আর ইহজগতে নেই।"

এটা তাহের চাচার কণ্ঠস্বর ছিল, না বোমা বিস্ফোরণ! আমার পুরো অস্তিত্বটা যেন এ শব্দে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ল। আমি যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেলাম। দাবী করা সহজ কাজ কিন্তু সে দাবী বাস্তবায়িত করা সহজ নয়। আমি সবকিছু শ্রবণ করার শক্তি রাখি এ দাবী তো সহজেই করেছিলাম। কিন্তু আমি এ দুঃসংবাদ শ্রবণ করার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমি তো কিছুক্ষণ আগেও ছামারাকে হাসপাতালে মোটামুটি সুস্থ রেখে এসেছিলাম।

"এটা .... এটা কীভাবে হল.... ওকে তো আমি ঠিকঠাক রেখে এসেছিলাম?"

"বেটী! ছামারা.... ছামারা... আত্মহত্যা করেছে।" তিনি মাথা নত করে বললেন।

তার কথাগুলো আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। হয়তঃ সে নিশ্চিত হয়েছে যে, এখন আর কিছু সম্ভব নয়, তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ও সার্ব বাচ্চাকে জন্ম দিতে চাচ্ছিল না, সেজন্য ও জীবন থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

"এই.... এই পত্রটি তোমার জন্য রেখে গেছে।" কমাণ্ডার তাহের চাচা একটি চিঠির খাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আল্লাহ জানেন, আমি কীভাবে খামটি ছিঁড়ে ভিতর থেকে চিঠি বের করলাম। হলুদ রঙের একটি কাগজে ছামারার পত্রটা ছড়িয়ে আছে।

"আপা, নিঃসন্দেহে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন যে, আমি এটা আবার কি করলাম, তাই না? কিন্তু আমি নিরুপায়। আমাকে ক্ষমা করবেন।

আপা! আমি এসব সার্ব শয়তানদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, তারা যা কিছুই করুক না কেন, আমাদের সাহস ও হিম্মতকে কখনো পর্যুদস্ত করতে পারবে না। সার্ব হায়েনারা আমাদেরকে বলতো, তারা নিজেদের মর্জিকে আমাদের তকদীর বানিয়ে দিয়েছে এবং এটাও বলতো, আমাদের অস্তিত্বটা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য চপেটাঘাত ও কলংক স্বরূপ। কিন্তু আমি ..... আমি নরাধম পিশাচদের সমস্ত আশাকে, সমস্ত পরিকল্পনাকে নিঃশেষ করে দিতে চাই। খতম করে দিতে চাই।

আপা, আল্লাহ করুন, আপনারা আপনাদের লক্ষ্যে, উদ্দেশ্যে সফল হোন। যখন সত্যিকারভাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন হবে, তখন আমার কবরে স্বাধীন বসনিয়ার মাটিতে প্রস্ফুটিত ফুলের তোড়া অবশ্যই নিয়ে আসবেন, আমার কবরের উপর ফাতেহা পাঠ করে আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করবেন....।

—আপনার হতভাগা বোন ছামারা।।"

আমার অন্তরটা শোকে, বেদনায় ফেটে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু আমার শিরটা গৌরবে সমুন্নত। আমার ছোট্ট বোনটি জানের বাজি লাগিয়ে অন্ততঃপক্ষে নিজের সাধ্যানুযায়ী শত্রুদের অভিপ্রায় ও দূরভিসন্ধিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

আমি ছামারার শেষ স্মৃতিটুকু মুষ্টিতে চেপে ধরে তাহের চাচার সাথে বেরিয়ে পড়লাম। ছামারার কাফন দাফন ফজরের নামাযের পরপরই সম্পন্ন হয়ে যায়। আপনি কি বিশ্বাস করবেন, আমার জানের চেয়ে অধিক প্রিয় বোনটির জানাযার সময় আমার চোখ দিয়ে এক ফোটা অশ্রুও বের হয়নি। তবে মনের মাঝে অবশ্যই অগ্নি বর্ষিত হচ্ছিল। আমার মনে আছে, ছামারা সবসময় নরম বিছানায় শোয়ায় অভ্যস্ত ছিল। আম্মা বিশেষ করে ওর জন্য পাখীর পালক দিয়ে তোষক বানিয়েছিলেন। সফদর সবসময় বলতো, ও এই 'বৈষম্য আচরণের' বিরুদ্ধে হরতাল করবে। পালকের তোষকে বিশ্রামকারী আমার পরীর মত বোনটি শক্ত মাটির আবরণে চিরদিনের জন্য লুকিয়ে গেলো। দুনিয়াটা ওর কাছে এতই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে, ও শান্তির তালাশে পরজগতের পানে পাড়ি জমালো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও এখন যেখানেই থাকুক না কেন, এ দুনিয়ার জীবন থেকে অবশ্যই বেশী সুখে ও শান্তিতে আছে। হাঁ, আমার অন্তরে বিদ্যমান দগদগে ক্ষত রয়েছে, আরেকটি ক্ষত ওর নামে সৃষ্টি হয়ে গেল। যেদিন ছামারা পরলোকগমন করল, তার পরের দিনই আমি একটি অপারেশনে দশজন সার্বসেনাকে ব্রাশ ফায়ার করে ঝাঁঝরা করে দেই। জীবনের সড়কটি সমতল হোক, কিংবা উঁচু নিচু হোক, তার উপর দুঃখ বেদনার যত কাঁটাই বিছানো থাকুক না কেন, সময়ের চাকা ঘুরতেই থাকবে।

আজ আম্মা, বাবা, সকলেই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এক বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই এক বছরে আমাদের জীবনের রঙই পাল্টে গেছে। জীবন-পুস্তক থেকে কত প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা ছিঁড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথচ আজও নির্যাতন ও জুলুমের বাজার গরম আছে। আমাদের প্রতিরোধ, আমাদের জিহাদও অব্যাহত রয়েছে। বসনিয়া হার্জেগোভিনার সুন্দর উপত্যকাটি ধ্বংস, বিধ্বস্ত, বিরান ও কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে। ঘর থেকেও বেশী কবর আবাদ হয়ে গেছে। প্রতিটি বক্ষ রক্তরঞ্জিত। প্রতিটি অন্তর শোকাহত।

আজও বসনিয়ার অলিগলিতে মৃত্যুর বিভীষিকা গ্রেনেড, গুলি ও বোমার আকৃতি ধারণ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। আজও হাজার

হাজার ছামারা জীবনের আযাব ভোগ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য ছটফট করছে। লাখ লাখ লোককে তাদের ভিটে–মাটি থেকে, তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে কেউ গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নয়।

সফদর ও আলী, আল্লাহ জানেন, জীবিত আছে কিনা! যদি জীবিতও থাকে তাহলে কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে, আমি কিছুই জানি না।

এমনিতেও আমার এখন বিশেষভাবে ওদের অনুসন্ধানের তাগাদা নেই। যেখানে হাজার হাজার সফদর ও আলী জীবনের ষ্টেজ থেকে গায়েব হয়ে গেছে, সেখানে নিজের আপনজনের শোকে অশ্রুবরণ করা কি শোভা পায়!

এ উপন্যাস নয় জীবন কাহিনী

হয়তঃ আমার কথাগুলো আপনার কাছে উপন্যাসের কাহিনীর মতই মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি এক সময় বসনিয়ার মাটিতে পা রাখেন, আপনি যদি সে সব বৃদ্ধা, ভুখা নাঙ্গা মাদেরকে নিজেদের যুবক সন্তানদের কবরে অশ্রু বর্ষণ করতে, উন্মাদের মত বাচ্চাদেরকে ডাকতে এবং তাদের কবরের মাটিতে মুখ ও মাথা ঘষতে ঘষতে রোদন করতে দেখেন, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আপনিও নিজেকে ভুলে যাবেন।

এখানে সব ধরনের নির্যাতন হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম ও স্বাধীনতা প্রেমিকদের সম্মুখযাত্রা থামেনি। আমাদের হিম্মত ও উদ্যম আজও বলিষ্ঠ। বরং এখন তো মজলুম মুসলমানের রক্তের সমুদ্র স্বাধীনতার প্রদীপে এমন জীবন সঞ্চারক তেল ঢেলে দিয়েছে যা নির্বাপিত করার সাধ্য কারোর নেই।

এই যুদ্ধ চলছে। নিঃসন্দেহে তা মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত করে তবেই ক্ষান্ত হবে। এ বিজয়ের আমরা শুধু অপেক্ষাই করছি না, বরং এ বিজয়ে আমাদের অটল বিশ্বাসও রয়েছে।

ভবিষ্যত আমাদের জন্য কি বয়ে আনে, সেদিকে আমি যাচ্ছি না,

বরং বর্তমান অবস্থা দেখে আমার পরিতাপের সীমা নেই। মুসলিম জাতির তো একক জাতিতে রূপান্তরিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা বিভিন্ন জাতে, বিভিন্ন বংশে ও বিভিন্ন ভাষায় বিভক্ত হয়ে আজ নিজেদের সেই ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে হারাতে বসেছে। তাদের অনৈক্যের দরুন সর্বক্ষেত্রে তারা তাদের শত্রুদের হাতে মার খাচ্ছে। তাদের মানবতাবোধ, তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ কোথায়? ইসলাম কি এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেনি? ইসলাম কি ভাষা, ভৌগোলিক, বর্ণ, গোত্র বৈষম্যকে মূলোৎপাটন করার ঘোষণা দেয়নি? ইসলাম কি মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে জিহাদের ডাক দেয়নি? ইসলাম কি মজলুম মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেয়নি? ইসলাম তো আমাদেরকে এটাও নির্দেশ দিয়েছে যে, কাফেররা যদি মাত্র একটি মুসলমান মেয়েকে আটক করে রাখে, তখন তাকে উদ্ধার করার জন্য বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়।

কোথায় সেই আদর্শ?

কিন্তু, কোথায় সেই অনুভূতি, কোথায় ইসলামের সেই আদর্শ? আমাদের এক ভাই ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় মাটিতে পা ঘঁষাঘঁষি করে ছটফট করছে, পক্ষান্তরে আরেক ভাই বিশ্বের সবচেয়ে দামী গাড়ীতে স্বর্ণখচিত দামী পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বিশ্ববাসীর বাহবা কুড়াচ্ছে। এত পার্থক্য, এত ব্যবধান যেখানে, সেখানে একটি বসনিয়া কেন, শত শত বসনিয়ার উদ্ভব হতে পারে। সার্ব বলাৎকারের শিকার হাজার হাজার মুসলিম বিদূষী মেয়েরা আর্তনাদ করে মুসলমানদের কাছে আবেদন করছে, "হে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা! আমরা আপনাদের কাছে খাদ্য চাই না, আমরা পানি চাই না, আমাদের জন্য সেই বড়ি ও ঔষধ পাঠিয়ে দিন যা দিয়ে আমরা আমাদের পেট থেকে সার্ব নরপশুদের এই জঞ্জাল মুক্ত করতে পারি। আমরা সার্ব বাচ্চা জন্ম দিতে চাই না। আমরা কাফের বাচ্চা জন্ম দিতে চাই না। বাঁচান। আমাদেরকে রক্ষা করুন।"

মুসলমান যুবকদের অন্তরাত্মাকে বসনিয়ার বোনদের এই সকরুণ

আর্তনাদ কি নাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবে? এটা আজ তাদের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা।

আমি আজও নিজের ইউনিটের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমার জীবন এখন আমার ধর্ম ও আমার দেশের আমানত। সার্ব ফৌজরা আমার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে রেখেছে। হতে পারে, যখন আমার এই 'সংক্ষিপ্ত জীবন ডায়রীখানা' আপনাদের কাছে পৌঁছবে, তখন হয়তঃ আমার জীবনের বই বন্ধ হয়ে যাবে। সমাপ্তি ঘটবে আমার জিহাদী জীবনের। তবে, হাঁ, আমি অবশ্যই চাই যে, মৃত্যুর পূর্বে যেন একবার আমার বোন আমার ছামারার কবরের উপর স্বাধীন বসনিয়ার মাটিতে প্রস্ফুটিত ফুলের একটি তোড়া, একটি গুচ্ছ রাখতে পারি। আপনারা দু'আ করবেন যেন আমার এ আশাটি পূর্ণ হয়।

আপনাদের মুসলমান বোন—
খাওলা বেগোভিচ্
সারায়েভো (উত্তর সেক্টর)
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ইং

খৃষ্টবাদী সার্বীয় নরপশুদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার বসনিয়ার একজন মুসলিম সাংবাদিকের বন্দী জীবনের হৃদয়বিদারক কাহিনী ও নির্ভীক মহিলা মুজাহিদ খাওলা বেগোভিচের দুঃসাহসী জেহাদী জীবনের ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আগুনের কারাগার

আব্দুর রাজ্জাক হেকেনোভিক

আগুনের কারাগার

মূলতঃ একই সাথে দু'টি বই।

প্রথম বইটি

খৃষ্টবাদী সার্বীয় নরপশুদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার বসনিয়ার একজন মুসলিম সাংবাদিকের অসহায় বন্দী জীবনের হৃদয়বিদারক কাহিনী।

অপর বইটি

বসনিয়ার মুফতীয়ে আযম ইসমত বেগোভিচ (রহঃ)-এর বংশধর নির্ভীক মহিলা মুজাহিদ খাওলা বেগোভিচের দুঃসাহসী জিহাদী জীবনের ঈমানদীপ্ত দাস্তান। যা পাঠক মাত্রেরই হৃদয়কে আন্দোলিত করে, চক্ষুকে করে অশ্রুসিক্ত, শিরায় শিরায় প্রবাহিত করে চেতনার আগুন।

প্রত্যেক সচেতন মুসলিম নাগরিকের জন্য বিশেষ করে সাহাবা আদর্শের অনুসারী জান্নাত প্রত্যাশী তরুণদের জন্য এটি একটি অবশ্য পাঠ্য আদর্শ গ্রন্থ।

পাঠক বন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১১৮৩৭৩০৮, ৮৯১৬৩৫৯